প্ল্যাটফরম

ছোটগল্প সংকলন ২০১০

সম্পাদনা ঃ চুনী দাশ

প্ল্যাটফরম

ছোটগল্প সংকলন-২০১০
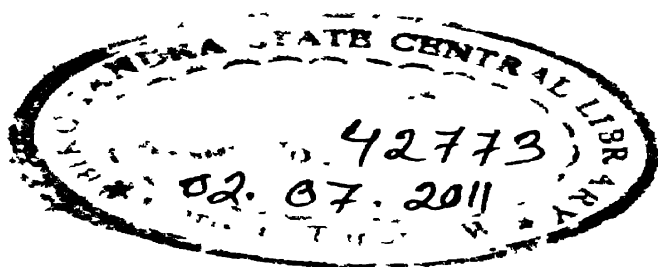
সম্পাদনা ঃ চুনী দাশ

কাকলি প্রকাশনী
আগরতলা, ত্রিপুরা

প্ল্যাটফরম

PLATFORM

a Collection of Bengali Short Stories

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ কাকলি প্রকাশনীর পক্ষে পারুল দাশ কর্তৃক
ধলেশ্বর নতুনপল্লী রোড নং ৭,
আগরতলা-৭৯৯০০৭
পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত ।
ফোন (০৩৮১) ২২২১৮৪৭

মুদ্রক ঃ আবডি প্রিন্টার্স
১৮০, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা - ১২

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফান্দাউক পণ্ডিতরাম হাইস্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক

এবং

সেখানকার (বাংলাদেশ) জনপ্রিয় ডাক্তার

স্বর্গীয় উপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীর

পুণ্যস্মৃতিতে

সূচি

বিদেশী গল্পের অনুবাদ
বিকাশ ভট্টাচার্য

সবকিছু সত্ত্বেও

মূল গল্প ঃ Inspite of Everything

লেখক ঃ Sigfrid Siwertz (Sweden)

সেদিন বিকেলে এবিক গিয়েছিল ছোট্ট নির্জন পার্কটাতে তার প্রেমিকা আগদার সাথে দেখা করতে। মেয়েটি সেখানেই প্রথম এরিককে খবরটা দিল— সে মা হতে চলেছে। খবরটা শুনে প্রথমে চমকে উঠল ছেলেটি। একটু বাদে অবশ্য সে নিজেকে সামলে নিল। ক্রমে এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল সে। ভাবী সন্তানের কথা ভেবে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল ছেলেটির মন।

স্টকহোমের আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই একটি ঘর নিয়ে থাকত এরিক। পার্ক থেকে ওরা দু'জনে ফিরে এল সেই ঘরে। আগদাকে আদর করে বসাল, অনেকক্ষণ ওকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিল এরিক। ঘরের জানালা দিয়ে দূরের দীর্ঘ ঋজু চিনার গাছগুলির দিকে আনমনে চেয়ে আছে মেয়েটি। এক গভীর নীরবতায় ডুবে গেল ওরা দু'জন। ছেলেটি এক সময় মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ও কি কাঁদছে? আগদার মুখটা যেন চেনা যাচ্ছে না। এই একটি ঘটনা যেন তার চেহারাটা কেমন পাল্টে দিয়েছে। এরিকের মনে হল যেন সম্পূর্ণ অচেনা একটি মেয়ে ওর পাশে বসে আছে।

এরিক ঘরের পর্দাগুলি টেনে দিল, আলোটা জ্বালাল। আগদার উজ্জ্বল চুলের মোটা গোছা, ওর উন্নত গ্রীবা, ওর দেহের লাবণ্য অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল ছেলেটি।

'আমার কারণে তোমাকে কি খুব কষ্ট পেতে হচ্ছে? আমি তোমার চোখের ভাষা বুঝে উঠতে পারছি না....। কিছু তো বলো !'

মেয়েটি সামান্য হেসে উত্তর দিল, 'এরিক, তুমি এখনও এতো ছোট, এতো সুন্দর....। তোমার অনেক কিছুই আমার চাইতে একেবারেই আলাদা। তবু তোমার এই ছোট্ট ঘরটাতে এতো আন্তরিক উষ্ণতা, ... সবকিছুই বড় আপন মনে হচ্ছে আমার।'

তারপর এক সময় আগদা দাঁড়িয়ে উঠে আস্তে তার জামা-জুতো খুলতে লাগল। এরিক তার কাছে এগিয়ে গেল, দু'হাতের বন্ধনে তাকে কাছে টেনে নিল। মেয়েটিও সোহাগে, আদরে ওকে ভরিয়ে দিতে লাগল।

এরিক ঘরের চুল্লির আগুনটা অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। মেয়েটি তার শরীরের শেষ আবরণটিও খুলে ফেলে দিয়ে একেবারে মুক্ত হল। চুল্লির লাল আলো আরও মোহময় করে তুলেছে ওর অনাবৃত রূপকে। এরিক মেয়েটির এই রূপ আগে কখনও দেখেনি, ওর দম যেন

বন্ধ হয়ে আসছে। আগদা নিজের চুলগুলি মুঠিতে পুরে হাত দু'টি ওপর দিকে তুলে ধরল। ওর স্পর্ধিত দেহে সামান্য লজ্জা বা অনুতাপের লেশ নেই।

এই মুহূর্তে কেউ বিশ্বাস করবে না, এই মেয়েটি মা হতে চলেছে।

'ধরো, এখন আমি যদি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাই, তবে কি তুমি খুব আঘাত পাবে?' কেমন একটু উদ্ধতভাবে অপ্রত্যাশিত এই কথাগুলি উচ্চারণ করল আগদা।

নিরুত্তর এরিক মেয়েটির সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হল। আগদাও ওকে কাছে টেনে নিল দু'বাহুর ব্যগ্র আলিঙ্গনে।

এরিক এরপর ক'দিন ধরে আগদার মধ্যে অনেক পরিবর্তন খেয়াল করতে পেল। কেমন যেন অসতর্ক ও অমনোযোগী, আবার মাঝে মাঝে যেন কিছুটা উৎফুল্লও মনে হত মেয়েটিকে। মেয়েটির মধ্যে লুকিয়ে আছে আরও একটি জীবন। হয়ত সেই কারণেই দেখা যাচ্ছে এমন সব পরিবর্তন, ছেলেটি মনে মনে ভাবত।

এরিক বড্ড নিঃসঙ্গ বোধ করত। কিছুতেই নিজের ঘরটায় একা থাকতে মন চাইত না ওর। মেয়েটি একটি অফিসে কাজ করত। একদিন বিকেলে এরিক সেখানে গিয়ে হাজির হল, কিন্তু আগদার দেখা পেল না।

পরদিন সকালেই আগদা এসে হাজির হল এরিকের ঘরে। ওকে কেমন উত্তেজিত ও ব্যস্ত দেখাচ্ছে।

'আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি।'

এরিক মেয়েটির কথার মানে বুঝতে পারল না। ও জিজ্ঞেস করল, 'আমেরিকা? কিন্তু সন্তানটি, তুমি তার ব্যাপারে....?'

' যেদিন আমি বুঝতে পারলাম আমার পেটে সন্তান এসেছে সেদিনই আমি শিকাগো শহরে আমার এক আত্মীয়কে খবরটা জানালাম। ওদের প্রচুর ধনসম্পদ, কিন্তু কোনও সন্তান নেই। আমি ওদের জানালাম, ওরা চাইলে আমি আমেরিকায় ওদের কাছে চলে গিয়ে আমার সন্তানটিকে যথা সময়ে ওদের হাতে তুলে দিতে পারব। ওরা একটি সন্তানের জন্য পাগল। তাই আমার প্রস্তাব ওরা আনন্দের সাথে মেনে নিল। ওদের শুধু একটাই শর্ত—শিশুটি যেন কোনওদিন তার আসল পিতামাতার পরিচয় জানতে না পারে।'

এরিক উত্তরে মেয়েটিকে বলল, 'না তুমি কোনওমতেই যাবে না। আমরা এখানেই সব কিছু সামলে নেব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বিয়ে করে ফেলব।'

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কথাগুলি ওর কানে গেল বলেই মনে হল না।

এরিক বলে চলল, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না এই সন্তানটির ওপর আমারও অধিকার আছে? পূর্ণ অধিকার!'

মেয়েটি নির্বিকার ভাবে জিগ্যেস করল, 'তুমি কি এতই নিশ্চিত যে এটি তোমারই সন্তান?'

ছেলেটি মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর গলায় ও ঠোঁটে চুমু খেল। তারপর আবেগভরা গলায় মেয়েটিকে বলল, 'তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না!'

'আমার সব গোছগাছ হয়ে গেছে। আমি পরশুদিন চলে যাচ্ছি।'

এরিক বুঝতে পারল, আর বাঁধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আগদাকে ছেড়ে দিল ও।

মেয়েটি দরজা দিয়ে নির্বিকার বেরিয়ে চলে গেল। আমেরিকা চলে যাবার আগে কোথায় ওদের শেষ দেখা হবে তাও জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না আগদা।

এরিক অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে ওর সন্তানটিকে নিয়ে মেয়েটি চলে যাচ্ছে। তাকে থামাবার কোনও ক্ষমতা ওর নেই।

ওইদিন বিকেলেই মেয়েটি এরিকের কাছে আবার এল। ওর মধ্যে দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনার কোনও লেশ নেই। ও নিজের ঠোঁট ...ট ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিল। এরিক তা প্রত্যাখ্যান করল।

মেয়েটি বলল, 'সব ঝামেলা মিটিয়ে আমি আবার একদিন ফিরে আসব। তখন তো নিশ্চয়ই দারুণ লাগবে!'

এরিক বুঝতে পারে, সবই মেয়েটির মিথ্যে আশ্বাস।

আগদা বলে চলল, 'বিশাল সমুদ্র আর ওই দেশের মস্ত সব শহর—আমার অনেক দিনের স্বপ্ন একবার সেসব দেখার।'

'কিন্তু একবার আমার কথা, সন্তানটির কথা ভাবো...। তুমি চলে যাচ্ছ সম্পূর্ণ অচেনা এক দেশে, অচেনা সব মানুষজনদের কাছে।'

'আমি তো ঠিক সেটাই চাই। এখানে এই পরিচিত জায়গায় একটি শিশুকে কোলে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াব কীভাবে। এই শহরটাকে আমি ঘৃণা করি।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে আর তোমার এই ছোট্ট ঘরটাকে ভালবাসি, সন্দেহ নেই।'

'এরপরও তুমি চলে যাচ্ছ কী করে?'

'যেতে আমাকে হবেই!' মেয়েটির চোখেমুখে এক প্রত্যয়ের ছাপ।

মেয়েটি বেরিয়ে চলে গেল।

দু'দিন বাদে এরিক স্টকহোম রেলস্টেশনে গেল আগদাকে বিদেয় জানাতে। ট্রেন যথা সময়ে ছেড়ে দিল। জানালায় বসে আগদা রুমাল নেড়ে ওকে বিদেয় জানাল। ক্রমে মেয়েটি এরিকের দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল।

এক গভীর হতাশা ও একাকিত্বে ডুবে গেল এরিক। আগদার মায়া, ওর কোমল দেহের নীরব ও দুর্নিবার আকর্ষণ, ওর মোহময় হাসি, ওর ভেতর বেড়ে ওঠা সন্তান— সব কিছুর ভাবনা প্রতিনিয়ত এরিককে তাড়া করে বেড়াত। ফুল ও ফল দুটিকেই ভাগ্য ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওর কাছে থেকে। বিশাল এক শূন্যতার মধ্যে ওর বেঁচে থাকাটাই দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়াল।

বেশ কিছুদিন বাদে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এরিক হঠাৎ অনুভব করল যেন ওর মনের সব অন্ধকার কেটে গেছে, ও আবার যেন নিজের হারানো অতীতকে ফিরে পেয়েছে। দিনের আলো আর ওর প্রিয় সব বই যেন আবার নতুন করে আগের মতোই ওকে আকর্ষণ করছে। অন্তরে এক নতুন অনুভব ও প্রত্যয় খুঁজে পেল সে। সাধারণ সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে

ও যেন আবার নতুন করে জীবনকে দেখতে পাচ্ছে। এক শীতল বাতাস যেন ওর সব জ্বালা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে।

জীবনের এক নতুন অর্থ ও লক্ষ্য যেন খুঁজে পেল এরিক। এক নতুন বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে শুরু করল ও।

আগদা একটি বিশাল জাহাজে চেপে রওনা দিল আমেরিকার উদ্দেশ্যে। জাহাজটাতে থিক্‌থিক্‌ করছে গরিব ভাগ্যান্বেষী দেশত্যাগী মানুষের দল। অর্থের জোর না থাকায় আগদারও স্থান হল এই হতভাগাদের মাঝখানে। খুব কষ্ট করে বেচারা নিজেকে সামলে রাখলে জাহাজের নারকীয় পরিবেশের মধ্যে। বহু যন্ত্রণা সহ্য করে মেয়েটি তার স্বপ্নের দেশ আমেরিকাব মাটিতে পৌঁছল।

ওর সেই পরিচিত আত্মীয়রা থাকে শিকাগো শহরে। সেখানে ওরা মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করল। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরের বাইরে ওদেব একটা মস্ত খামার বাড়িতে। সেখানে নিঃসঙ্গ মেয়েটি দিন গুণতে লাগল ওর সন্তানের অপেক্ষায়। অবশেযে একদিন ওর সন্তানের জন্ম হল। সাথে সাথেই মা'র কাছ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল শিশুটিকে। কোনওদিন মেয়েটি আর কাছে পেল না নিজের সন্তানকে। ওর আত্মীয়েরা আগদাকে নিউইয়র্কে ওদেব একটা অফিসে টাইপের কাজে লাগিয়ে দিল। দিনে দশ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হত ওকে।

এরই মধ্যে মেয়েটি যতটুকু সম্ভব অর্থ জমাতে লাগল, একদিন আবার নিজের দেশে ফিরে যাবে বলে। ওখানে কাজ করতে করতে ওর পরিচয় হল টম আরেন নামে একটি লোকেব সাথে। লোকটা ব্যবসায়ী, বেশ পয়সা-কড়ির মালিক। কিছুদিন বাদে লোকটির সাথে বিয়ে হয়ে গেল আগদার। মেয়েটির জীবন কেটে যেতে লাগল অলস স্বাচ্ছন্দ্যে।

দু'বছর কেটে গেল ওভাবে। তারপর একদিন আগদা তার দেশ থেকে খবর পেল, ওব বাবা মারা গেছে। ও অস্থির হয়ে উঠল দেশে ফিরে আসার জন্য। আমেরিকার সহজ ও স্বচ্ছল জীবন, ওর উদাসীন স্বামী—সবকিছুই যেন ক্রমে অসহ্য ঠেকছিল মেয়েটির কাছে।

তারপর একদিন আগদা নিজের দেশে ফিরে এল তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। লোকটি এখানে এসেও ঘরবাড়ি বেচা-কেনার ব্যবসাতে লেগে গেল। ব্যবসার বাইরে অন্য কিছুতেই ওর কোনও মনোযোগ ছিল না। আগদা ক্রমেই ওর স্বামীর প্রতি সব আকর্ষণ হারাতে শুরু করল। ওদের দু'জনের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা হত না। মেয়েটি ওর স্বামীর কাছ থেকে ক্রমেই অনেক দূরে সরে যেতে লাগল।

একদিন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে নিঃসঙ্গ আগদা এসে পৌঁছল দক্ষিণ স্টকহোমের সরু রাস্তাটার কোণে—যেখানে একসময় থাকত ওর প্রেমিক এরিক ভালেনিয়াস্। ওর কথা প্রতিনিয়তই মেয়েটির মনে পড়ত—কিন্তু কোনওদিন মনের জোর পায়নি ওর সাথে এসে দেখা করার। এর আগেও ক'বার এখানে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে আগদা। আজও অনেকটা নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ওখান থেকে ফিরে গেল সে!

নিজের বাড়িতে পৌঁছে হতাশায় ডুবে গেল মেয়েটি। এখানে কোথাও প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। সব দরজা-জানালা বন্ধ। নিষ্প্রাণ ঘরগুলির অন্ধকার নীরবতা ওকে অস্থির করে তুলে।

ও একটি প্রদীপ আর দুটি মোমবাতি জ্বালাল। সামনের আয়নায় নিজেকে প্রত্যক্ষ করল। এ কার মুখ? নিজেকেই যেন চিনতে পারছে না আগদা। মুখ নয়, এ যেন এক মুখোশ, যার সাথে ওর পরিচিত অন্তরের কোন সংশ্রব নেই।

মেয়েটি বিবস্ত্র হল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ওর মন কেমন ঘৃণায় ভরে গেল, কারণ ওর সমস্ত শরীরের উপর যার অধিকার সেই মানুষটাকেই তো ও মনেপ্রাণে শুধু ঘৃণাই করে এখন।

পরদিন আগদা আবার রওনা দিল এরিক ভালেজিয়াসের ঠিকানার উদ্দেশ্যে। সেই পরিচিত পুরনো বাড়িটায় পৌঁছে দু'তলায় উঠে গিয়ে এরিকের দরজাটার সামনে দাঁড়াল ও।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে মেয়েটি দরজায় ক'বার আস্তে টোকা দিল।

' দেখা করাটা যদি জরুরি ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে নিচের তলায় নেমে যাও।'

এরিকের গলার ক্ষীণ ও দুর্বল আওয়াজ চিনতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটি নিজের পরিচয় দেওয়ার সাহস পেল না। ও নিচের তলায় নেমে গেল। সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে ওর সামনে দাঁড়াল।

'তুমি কে?'

'আমি আমেরিকা থেকে এসেছি ... মিস্টার এরিক ডালেনিয়াসের আমি এক পুরনো বন্ধু।'

'তুমি কি জানো না, বেচারা খুবই অসুস্থ?'

'অসুস্থ? আমি একবার ওর সাথে একটু দেখা করতে পারব না?'

বৃদ্ধা মহিলা আর কোনও কথা না বলে ওপরে উঠে চলে গেলেন এরিকের ঘরের ভেতর। একটু বাদে বেরিয়ে এসে আগদাকে ইঙ্গিত করলেন ভেতরে যেতে।

ভেতরে গিয়ে এক নজরে আগদা দেখে নিল পুরনো ছন্নছাড়া ঘরটার ভেতরটা। তারপর চোখ নামিয়ে ও সোজা এগিয়ে গেল এরিকের খাটের পাশে।

'তুমি অসুস্থ খবর পেয়ে আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।' মিথ্যে কথাগুলি বলতে একটুও বাঁধল না মেয়েটির।

সাদা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে এরিক। ওর শুকনো বসে যাওয়া চেহারায় চোখ দু'টি সেই আগের মতোই জ্বলজ্বল করছে। ওর মুখে কোনও চমক বা আনন্দের অভিব্যক্তি নেই। বাইরে সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসল ও।

'সেই বিশাল সমুদ্র আর মস্ত শহরগুলি সব দেখা হয়ে গেছে তোমার?' আস্তে জিগ্যেস করল এরিক।

আগদা মনে করতে পারল না নিজেরই বলা সেই কথাগুলি। ছেলেটির শান্ত চাহনির সামনে কেমন লজ্জা আর অস্বস্তিতে পড়ে গেল মেয়েটি।

'তুমি এত রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছ! তুমি কি অনেকদিন ধরে ভুগছ?'

'কিছুটা তোমার জন্যই হয়ত আমার আজকের এই পরিণতি। তুমি ছিলে বসন্ত ঋতুর মতো, কখনও মৃদুমন্দ আবার কখনও কেমন দুঃসহ। তোমার মধ্যে তেমন দয়ামায়া কোনওদিন

ছিল বলে মনে পড়ে না। আমার রোগ আমার হৃদয়কে ঘিরে, যদিও এর আসল কারণ মূলত বাইরের। সময়ের সাথে আমি সব কিছুকে মেনে নিতে শিখেছি, এমনকি মৃত্যুর ভাবনাকেও। আমি এক আধ্যাত্মিক ভাবধারায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছি।'

আগদা একটি চেয়ারে বসে বলল, 'আমার জীবনের দুঃখের শেষ নেই!'

ছেলেটি তার ক্লান্ত দু'টি চোখ বুজে উত্তর দিল, 'সুখ ব্যাপারটা ঠিক কী, আমি জানি না।'

মেয়েটি ছেলেটির দিকে একটু হেলে বসল, ওর খাটের মাথায় হাত রেখে। বলল, 'তোমায় এই অবস্থায় দেখতে না হলে আমি অনেক সুখী হতাম।'

'সুখ..., আমি এই শব্দটাকেই ঘৃণা করি। সুখের পেছনে আমি আর ছুটতে চাই না। কিন্তু আনন্দ, এটাতো এক ভিন্ন ধরনের সাময়িক অনুভূতি, হয়ত আমাদের গভীরতম অনুভূতি, ...' বাইরের সূর্যালোকের দিকে চোখ রেখে কথা বলে চলেছে এরিক।

তারপর এক সময় আগদার দিকে চোখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে ও বলল,' যৌবনে আমি যখন অসংযমী ছিলাম তখন তোমায় দুঃখের কথা বলতাম। তুমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতে না। এখন আমি তোমায় আনন্দের কথা বলছি, কিন্তু সেটাও তুমি ঠিক বুঝতে পারছ বলে মনে হয় না। তবে আগের চাইতে তোমাকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দব ও অভিজাত লাগছে এখন।'

আগদা অসুস্থ এরিককে দেখে মনে মনে খুব ব্যথা পেল। ও ব্যাকুল হয়ে উঠল এই দুর্বল মানুষটিকে একটু সেবা-যত্ন করতে কিন্তু ভেবে পাচ্ছে না প্রস্তাবটা ঠিক কীভাবে দেওয়া যায়।

'তুমি কি অনেকদিন ধরেই এমন গুরুতর ভাবে অসুস্থ?'

' অযথা ভেবো না, আমি আবার ঠিক সুস্থ হয়ে যাব।'

এরপর বালিশে মাথা ফেলে এরিক বলল, 'আমি বড্ড ক্লান্ত, তুমি বরং এবার চলে যাও।'

আগদা ওর হাত ধরে জিগ্যেস করল, 'আমি কি আর তোমার কাছে আসতে পারব না? তুমি তো বাচ্চাটির ব্যাপার কিছুই জানতে চাইলে না?'

এরিক কোনও উত্তর দিল না। মেয়েটি নীরবে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি পেছন থেকে ডেকে ওকে বলল, 'আমি খুব খুশি হব, তোমার আর তোমার স্বামীর ব্যাপারে সবকিছু যদি আমায় লিখে জানাও। এখানে তোমায় না এলেও চলবে।'

'আমি এখানে এসে যদি তোমায় একটু সাহায্য করি?' মেয়েটি মিনতি করে বলল।

'না, তার প্রয়োজন হবে না।'

অপমানিত ও বিধ্বস্ত হয়ে মেয়েটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওর বাড়ির রাস্তা ধরল।..

বেশ ক'দিন বাদের ঘটনা।

এরিককে একবার দেখতে ব্যাকুল হয়ে উঠল মেয়েটি। ও এসে হাজির হল ছেলেটির বাড়িতে। দরজাটা খোলাই ছিল, ও চুপিচুপি ঘরের ভেতরে এল। এরিক খোলা জানালার পাশে বসে একটি বই পড়ছিল। আগদাকে দেখে ও বইটা বন্ধ করে দিল।

কোনও ভণিতা ছাড়াই আগদা ওর সেই আমেরিকার গল্প বলতে শুরু করল। সমুদ্র যাত্রার কষ্ট, শিকাগোতে তার সন্তানের জন্ম, আত্মীয়দের হাতে বাচ্চাটিকে তুলে দেওয়ার কথা ইত্যাদি

ও সবকিছু বলতে শুরু করল মেয়েটি। আমেরিকায় ওর চাকুরির কথা, টম-এর সাথে ওর পরিচয় এবং বিয়ের গল্প। এবং সবশেষে বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দেশে ফিরে আসার কথা— সমস্ত কিছুই একনাগাড়ে মেয়েটি বর্ণনা করল এরিকের কাছে। খুব তাড়াতাড়ি এবং উত্তেজিত গলায় ওর সব কথা বলে ফেলল আগদা। সবশেষে বলল স্বামী টম-এর কথা। স্বার্থপর লোকটির আচার ব্যবহারে ও একেবারেই হতাশ দিশেহারা। ও এখন কোনওমতে লোকটির কাছ থেকে মুক্তি পেতে ব্যাকুল।

নির্লিপ্তভাবে এরিক শুধু বলল, 'আমায় এখন এসব কথা বলে কী লাভ?'

'আমি জানি না, আমার অবস্থা তোমায় ঠিক কীভাবে বোঝাব। আমার জীবনের কথা, একমাত্র তোমার কাছে বলেই শান্তি পাই আমি।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওই লোকটিকে তুমি এখন ঘৃণা করো। সত্যি কি তাই?'

'অবশ্যই !'

'কিন্তু তোমরা তো স্বামী -স্ত্রী হিসেবেই একসাথে বসবাস করছ?'

' মোটেও না!'

এরিক উপলব্ধি করতে পারছে, মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে। ও চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল।

আগদা অনুভব করছে কীভাবে এরিকের জীবন থেকেও ও অনেক দূরে সরে গেছে । ওর চোখ বেয়ে জল নামছে। চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে ও ছেলেটির হাত জোরে চেপে ধরল।

' দোহাই, তুমি আমায় ঘৃণা করো না!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগদার দিকে চেয়ে এরিক জিগ্যেস করল, 'তুমি কেন এখানে এসেছ? আমার কাছ থেকে কী চাও?'

'আমার জীবনে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এক অস্থিরতা আমায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি আমাকে বাঁচাও, আমার সাথে কথা বলো। আমার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তার চাইতে অনেক বেশি জানো তুমি,' ...আমার সামনে বাঁচার রাস্তা নেই, . আমায় তুমি বাঁচাও!'

'আমি তোমায় কীভাবে বাঁচাবো? তুমি তো কোনওদিন আমায় বুঝতে পারবে না।'

'তুমি আগে আমায় তোমার কথা বলো। একা একা তুমি ক'টা বছর কাটালে কীভাবে? নিশ্চয়ই অনেক দুঃখ পেয়েছ এই একাকিত্বে।'

এরিক আস্তে আস্তে বলল, ' যে মানুষ জীবনকে সামগ্রিকভাবে ভালবাসে তার কাছে একাকিত্ব খুব বড় বোঝা হয় না। জীবনের সব কিছু—মানুষ, আলো, আকাশ, বাতাস, মেঘ, গাছ—সবকিছুর সাথে কেমন এক আত্মীয়তা হয়ে যায় তার। এই সমস্ত কিছুর রহস্যময় ফিস-ফিসানি প্রতিনিয়ত কানে ভেসে আসে তার। তখন অনুভব করবে, তুমিও এদের সাথেই আছ ঘনিষ্ঠ হয়ে, একা নও। জীবনে যা কিছু আছে, যা কিছু ছিল আর যা থাকবে, সবকিছুর সাথেই আমার অন্তর জুড়ে আছে। কোনও কিছু থেকেই আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে, একা হয়ে যাইনি।'

এরিক চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। আগদা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছেলেটির অনুভবগুলির সাথে একাত্ম হতে, পেরে উঠছে না।

মেয়েটি একটি চুম্বন দিয়ে এরিকের কাছ থেকে নীরবে বিদেয় নিল।

একমাস বাদে আপসালাতে এরিক আর আগদার আবার দেখা হল।

ওরা দু'জন পাশাপাশি নীরবে অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়ালো আবাসন এলাকার ছোট রাস্তাগুলি দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে দাঁড়াল একটা ছোট্ট হলুদ বাড়ির সামনে যেখানে এরিক একসময় থাকত।

'একবার ভেতরে গিয়ে তোমার সেই পুরনো ঘরটা দেখে আসবে না?' মেয়েটি জিগ্যেস করল।

এরিক ভেতরে বাড়িওলার অনুমতি নিতে গেল।

ঘরটাতে এখন কোনও ছাত্র থাকে না, তাই ভেতরে যেতে ওদের কোনও অসুবিধে নেই।

ঘরের ভেতর গিয়ে ওরা দেখল, চারপাশে সব পুরনো আসবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ধুলোর পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে সব। দেয়ালে ঝুলছে ক'টা ছবি।

একমাত্র জানালাটা খোলা। এরিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে সেই আগের মতোই দীর্ঘ, ঋজু চিনার গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। ওর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঘরটার সাথে।

আগদা একটু বসল। ওর বড় ইচ্ছে, এরিকও একটু ওর পাশে বসে।

'না, চলে এসো! আমি অ'ব এখানে থাকতে পারছি না,' ধরা গলায় বলল এরিক।

আসন্ন সূর্যাস্তকে সামনে রেখে ওরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সামনেই দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর পড়ে আছে কেমন এক বিষণ্ণতা গায়ে মেখে। দূরে কালো পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেপ্‌লগাছের সারি।

চুপচাপ এরিক দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় নীরবে ওর হাত ধরে আগদাকে টেনে নিল কাছে।

'জীবনে অন্য কারও ওপর নির্ভর না করে বেঁচে থাকা নিয়ে আমি এক ধরনের গর্ব অনুভব করতাম। আমার নিজের সামর্থ্যের ওপর আমার অগাধ আস্থা ছিল। আজ তুমি আমার এ কোথায় এনে দাঁড় করালে? কী হবে আমার জীবনের আগামী দিনগুলির। আমি তোমার সব কিছুই জানি, তোমার দুর্বলতা, তোমার শঠতা, তোমার অসহায় রিক্ততা, তোমার একাকীত্ব — সব, সব কিছুই আমি জানি। আমি অনুভব করি। এসব কিছু সত্ত্বেও আমি তোমার মধ্যেই একমাত্র বেঁচে আছি, আমার সব স্বপ্ন তোমাতে লীন হয়ে আছে, ... আমি তোমায় ঘৃণা করি।'

কম্পিত ঠোঁটে সে আগদাকে চুম্বন করে।

নির্বাক মেয়েটি আস্তে এরিকের হাত দুটিকে নিজের বুকে টেনে নেয়।

(স্বল্প সংক্ষেপিত অনুবাদ)

অতো ও তার ছেলে

মূলগল্প : Hautot and His son

লেখক : Guy de Maupassant (France)

অতোর মস্ত গ্রামের বাড়িটার অর্ধেকটা ছিল খামার আর বাকি অর্ধেকটা কাছারি। সম্পন্ন কৃষকদের বাড়িগুলি আজকাল এমনই হয়। বাড়ির বাইরে আপেল গাছে সব সময় বাঁধা থাকত ক'টা শিকারি কুকুর। অতোর দেহটি যেমন ছিল বিশাল, ওর জমিজমার পরিমাণও ছিল তেমনই। এনিয়ে লোকটির গর্বের শেষ ছিল না। যথেষ্ট ধনসম্পত্তির মালিক হওয়ায় অঞ্চলের সবাই ওকে সম্মান ও সমীহ করত খুব।

ওর একমাত্র ছেলে সেজারকে সে স্কুলে পাঠিয়ে দশম শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করিয়েছে। পাছে জমিজমার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে যায় সেই ভয়ে ছেলেকে আর বেশি পড়তে দেয়নি লোকটা। সেজার তার বাপের মতোই লম্বা ছিল, কিন্তু অনেকটা রোগাটে। খুবই ভাল আর নিরীহ একটি ছেলে, বাপের প্রতি ওর শ্রদ্ধাভক্তি আনুগত্যও ছিল যথেষ্ট।

শিকারের খুব নেশা ছিল অতো ও তার ছেলে সেজারের। ওদের মস্ত খামারে আর তার আশপাশেই দেখা মিলত নানা ধরনের শিকারের ছোটখাট প্রাণী আর পাখির। এখন শিকারের মৌসুমের শুরু। অতো তার দুই বন্ধু ও ছেলেকে নিয়ে একদিন শিকারে গেল কাছেই একটা জঙ্গলে। ওদের সাথে নিয়ে গেল আরও ক'জন সাহায্যকারী লোককে। জঙ্গলে পৌঁছে ওরা চারজন ছড়িয়ে গেল চারদিকে। অতো গেল ডানদিকে, ওর ছেলে গেল বাঁয়ে আর মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল অতোর দুই বন্ধু। নিঃশব্দে ও খুব সতর্কভাবে ওরা এগিয়ে যেতে লাগল জঙ্গলের ভেতর দিকে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে চারপাশের নীরবতা ভেঙে গেল। আওয়াজটা এসেছে অতোর বন্দুক থেকে । সাথে সাথেই দেখা গেল এক ঝাঁক তিতির পাখি উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর এদের মধ্য থেকে একটি পাখি ডানা ভেঙে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। উত্তেজিত অতো দৌড়ে ছুটে গেল সেই ঘন জঙ্গলের ভেতর গুলিবিদ্ধ পাখিটার খোঁজে।

একটু বাদেই আরও একটি গুলির আওয়াজ বেরিয়ে এল অতোর বন্দুক থেকেই।

বাকিরা ভাবল, এবার নিশ্চয়ই একটা খরগোশ শিকার করেছে অতো। ওরা সবাই চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ওরা চিৎকার করে অতোকে ডাকল। তারপর অনেকক্ষণ কোনও উত্তর নেই দেখে ওরা সবাই বেশ একটু ঘাবড়ে গেল।

সেজার, সঙ্গের ক'টি লোককে নিয়ে, জঙ্গলের যেখান থেকে ওর বাবার গুলির আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে ছুটে গেল।

হঠাৎ ওরা দেখতে পেল অতো অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, তার হাত দু'টি পেটের ওপর চেপে ধরে। ওর জামা চুইয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

দৌড়ে গিয়ে সেই গুলিবিদ্ধ তিতির পাখিটাকে নিচু হয়ে তুলতে গিয়ে অতোর হাত থেকে

ওর বন্দুকটা ছিটকে নিচে পড়ে যায় ঝটকা লেগে। বন্দুকটি থেকে একটা গুলি বেরিয়ে ওর পেটের ভেতর দিয়ে চলে যায় খাদ্যনালী ফুটো করে দিয়ে। ওরা সবাই মিলে অতোকে টেনে তুলল। জামাকাপড় খুলে ওর ক্ষত স্থানটিকে চেপে বেঁধে দিল। তারপর সবাই মিলে কাঁধে চাপিয়ে আহত মানুষটিকে ওর বাড়ি নিয়ে এল এবং ডাক্তার ও যাজককে জরুরি খবর পাঠাল।

ডাক্তার এসে অতোকে ভালভাবে পরীক্ষা করে ওর ছেলেকে বললেন, ' দেখো খুব দুঃখের সাথে তোমায় জানাতে হচ্ছে, তোমার বাবার অবস্থা কিন্তু খুবই গুরুতর।'

ডাক্তার ঔষধপত্র লাগিয়ে ক্ষত স্থানটি ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই রোগী তার আঙুলগুলো একটু নাড়াচাড়া করতে শুরু করল, চোখ দু'টি আর মুখও একটু খুলল। ওর দৃষ্টিতে অবশ্য এক বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তার ছাপ —যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ঠিক কী ঘটে গেছে তা আন্দাজ করতে।

একটু বাদে বিড়-বিড় করে আহত মানুষটি বলল, 'হায় ঈশ্বর, এই কি আমার শেষ!'

ওর হাত চেপে ডাক্তার বললেন, 'আরে না, না—দু'তিনদিনের বিশ্রামের পরই আবার আপনি একদম সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

উত্তরে অতো ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমি জানি, আমার শেষ সময় এসে গেছে। আমার পেটটা একদম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি সব।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার ছেলেটির সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই। জানি না সেই সময় আর পাব কিনা!'

'বাবা, বাবা, ও বাবা!'

'এসো, আমার কাছে এসো,' আহত মুমূর্ষু বাপটি আস্তে ছেলেকে ডেকে বলল। ' কান্নার সময় এটা নয়। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। কাছে এসে দাঁড়াও। বেশি সময় আমি নেব না। বাকি আপনারা যদি ... দয়া করে একটু ...।'

ছেলেকে বাবার কাছে একা ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা ছেলেকে বলল, 'দেখো খোকা, তোমার বয়স তো এখন চব্বিশ। আমি তোমাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে গণ্য করি এখন। আজ থেকে সাত বছর আগে তোমার মা দেহ রেখেছিলেন, তাই তো? আমার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, আর আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তো আমার বয়স ছিল মাত্রই উনিশ। ঠিক তো?'

তোতলাতে তোতলাতে ছেলে বলল, 'হ্যাঁ, বাবা, একদম ঠিক।'

কষ্ট করে দম নিতে নিতে ফ্যাকাসে মুখে আহত পিতাটি বলল, 'আঃ, বড্ড লাগছে! তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু বুঝতে পারছ। পৃথিবীতে একা একা বেঁচে থাকাটা মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন। কিন্তু তোমার মার জায়গাটায় অন্য কাউকে বসাতে আমার মন চাইল না— কারণ আমি তোমার মাকে সেভাবেই কথা দিয়েছিলাম। আশা করি, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না। তাই তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

' শেষপর্যন্ত আমি একটি মেয়েকে সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিলাম। ও থাকে রুয়েনে। 'রু দ্য

লেপেরলাঁ'-তে, আঠেরো নম্বরে, চারতলার দ্বিতীয় দরজা। এত কথা বলছি যাতে তুমি ব্যাপারটা কোন মতেই ভুলে না যাও। মেয়েটি সত্যি আমায় খুব ভালবাসে। একজন সত্যিকারের স্ত্রীর মতোই, আমার প্রতি ওর ভক্তি আর অনুরাগের কোনও অভাব নেই। ঠিক? বুঝলে তো তুমি?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'ও সত্যি একটি ভালমেয়ে। আমি তোমায় হলপ করে বলছি। তোমার মার সমস্ত স্মৃতির সম্মানে, তোমার জন্য আর আমাদের এই বাড়িটার কথা বিবেচনা করে আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করে এখানে নিয়ে আসিনি। ব্যাপারটাতে কোনও সন্দেহ নেই। শোনো খোকা, আমি ইচ্ছে করলেই একটা উইল করে যেতে পারতাম, কিন্তু তা আমি করিনি। আসলে উইল করতে আমি একেবারেই চাইনি, ... কারণ এ সমস্ত ব্যাপার কাগজ কলমে না থাকাই ভাল।... সত্যিকারের উত্তরাধিকারীদের জন্য এই ধরনের লিখিত দলিল সব সময়ই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ... অযথা নানা বিভ্রান্তি ঘটায়, ... সবারই ক্ষতি হয়। তুমিও কোনওদিন কোনও লিখিত বা সরকারি দলিল করতে যেও না, যেমন আমি কোনওদিন করিনি। আমি যে আজ এত ধনদৌলতের মালিক হয়েছি তার জন্য আমাকে কখন কোনও দলিলের সাহায্য নিতে হয়নি। আশা করি ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে, খোকা।'

'হ্যাঁ, বাবা।'

এবার আরও কিছু কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি কোনও উইল করিনি, ... আমি করতে চাইওনি, ... তা ছাড়া আমি তোমায় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমি জানি, তোমার মন খুবই উদার, তোমার মধ্যে কোনও নীচতা নেই, তুমি কঞ্জুসও নও। আমি আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, যেদিন আমার যাবার সময় আসবে আমি তোমায় সবকিছু খুলে বলে যাব, যাতে তুমি কোনওমতেই ওই মেয়েটিকে ভুলে না যাও। মেয়েটির নাম হল, ক্যারোলিন দোনে, থাকে সেই রু দ্য লেপেরলাঁতে, আঠেরো নম্বরে, চারতলার দ্বিতীয় দরজা ...।'

' ... আরও একটা জরুরি কথা। আমার সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরই সোজা তুমি ওই ঠিকানায় গিয়ে ওর সাথে দেখা করবে। ঠাণ্ডামাথায় ঠিক-ঠাকভাবে সব হিসেবপত্র এবং বোঝাপড়া করে নিও ওর সাথে, যাতে ওর মনে কখনও আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকে। তুমি নিশ্চয়ই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে, সেই ক্ষমতা তোমার আছে, আর আমি তো তোমার জন্য অনেক কিছুই রেখে যাচ্ছি।'

অতো বলে যেতে লাগল, '... শোনো, আরও একটা জরুরি কথা। মেয়েটি কাজ করে 'মাদাম মরো'র ওইখানে। সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই তাকে তুমি তার নিজের আস্তানায় পাবে না। তুমি যাবে একমাত্র বৃহস্পতিবার দিন। ঐ দিনটাতে মেয়েটি আমার অপেক্ষায় ওর ঘরে বসে থাকে। গত দশ বছর ধরে ওই ঠিকানায় একমাত্র বৃহস্পতিবার দিনই আমি নিয়ম করে ওর সাথে দেখা করতে যেতাম, ওই দিনটাতে ও আমার অপেক্ষায় বসে থাকে।'

'... খোকা, আমি তোমায় বিশ্বাস করি আর তাই সমস্ত কিছু তোমায় বলে যাচ্ছি। চারপাশে সবার কাছে তো আর এসব কথা বলা যায় না, এমনকি যাজকের কাছেও না। এই ধরনের

ব্যাপার মানুষের জীবনে ঘটেই থাকে এবং অন্যরা তা ঠিকই আন্দাজ করতে পারে। তবু খুব প্রয়োজন না পড়লে এসব নিয়ে কেউই আলোচনা করে না। তাই তুমিও এই গোপন ব্যাপারটা নিয়ে বাইরের লোকজনের কাছে একদম মুখ খুলবে না, একমাত্র পরিবারের মধ্যে ছাড়া। কারণ পরিবার হল একটা মানুষের মতো। বুঝলে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছ?'

'হ্যাঁ' বাবা।'

'তুমি আমায় তোমার কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'তোমার কাছে আমার একটা মিনতি, প্রার্থনাও বলতে পারো। আমার কাছে ওই ব্যাপারটার গুরুত্ব অপরিসীম। আশা করি, তুমি কোনওভাবেই ভুলে যাবে না।'

'না, বাবা।'

' তুমি নিজে ওর কাছে গিয়ে সবকিছু ঠিক-ঠাক করে আসবে। কোনও ভুলচুক বা ভুল বোঝাবুঝি যেন না থাকে।'

হ্যাঁ, বাবা।'

'ও কী বলছে খেয়াল করলেই তুমি ওর মনের সব কথা আন্দাজ করতে পারবে। এর বেশি আর কিছু তোমায় আমি বলতে পারছি না। তুমি আমায় কথা দিচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ, বাবা'।

' বেশ ভাল! খোকা, এবার আমার বিদায় নেওয়ার পালা। আমায় তোমার শেষ চুম্বন দাও। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, আমার যাওয়ার মুহূর্ত এসে গেছে। ওদের সবাইকে ভেতরে আসতে বলো।'

সেজার তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। একটু বাদে বাবার আদেশ মতো সে ঘরের দরজা খুলে দিল। প্রথমেই সাদা পোষাকে আবৃত যাজক ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর পবিত্র তেলের পাত্র।

অতো তার চোখ দু'টি চেপে বন্ধ করে রেখেছে। সামান্য আকার ইঙ্গিত করেও মৃত্যুপথযাত্রী লোকটি তার মনের কোনও ইচ্ছা বা আবেগ কোনওভাবেই প্রকাশ করতে আর রাজি নয়।

জীবন ভর অনেক কথা বলতে বলতে আজ একেবারে শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে লোকটি। ওর ক্লান্ত বিবেক এখন বিশ্রাম চাইছে, আর ও নিজেও চাইছে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে।

ভগবানের প্রতিনিধির কাছে নতুন করে আর কোনও স্বীকারোক্তি করবার ইচ্ছে ওর নেই। নিজের সন্তানের কাছেই তো সব কিছু স্বীকার করা হয়ে গেছে, আর ছেলে হল গিয়ে পরিবারেরই একজন।

সমবেত বন্ধু-বান্ধব ও চাকর-বাকরেরা সবাই নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসল। পাদ্রি তাঁর শেষ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে অতোর দেহটিকে পবিত্র করলেন। তখনও মৃত্যু লোকটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়নি। তবুও তার মুখে জীবনের সামান্যতম অভিব্যক্তিও দেখা গেল না।

চারঘণ্টার মৃত্যু যন্ত্রণার পর মধ্যরাতের দিকে অতো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

পরের মঙ্গলবার অতোকে সমাধি দেওয়া হল। সব কাজ সেরে ছেলে সেজার বাড়ি ফিরে এল। সারাটা দিন কান্নাকাটি করেই ওর কাটল।

বেচারা ভেবে পাচ্ছিল না, একা একা কীভাবে সে বাকি জীবনটা কাটাবে।

সবকিছু সত্ত্বেও সেজার একবারের জন্যও ভুলল না যে তার বাবার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে পরের দিনই রুয়েন যেতে হবে সেই ক্যারোলিন দোনের সাথে দেখা করতে, সেই 'রু দ্য লেপেরলাঁ'-তে, আঠেরো নম্বরে, চারতলার দ্বিতীয় দরজায়। নিচু গলায় বিড় বিড় করে সেজার ঐ নাম আর ঠিকানাটা বার বার উচ্চারণ করে যেতে লাগল।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ নিজের দু'চাকাওলা ঘোড়ার গাড়ি চেপে সেজার রওনা দিল রুয়েন-এর উদ্দেশ্যে। দশটা নাগাদ সে পৌঁছে গেল 'ওতেল দ্য বোঁজ আফন্ত'-এ—যে হোটেলটিতে নিয়মিত ওর বাবা উঠত। সেই হোটেলের লোকজন সেজারকেও খুব ভাল করে চেনে। সেখানে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে এবং বাবার মৃত্যুর সব বিবরণ জানিয়ে সে রওনা দিল 'রু দ্য লেপেরলাঁ'-এর দিকে।

হোটেল থেকে ওই জায়গাটা খুব দূরে নয়। সেজার তার বাবার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে আজ এখানে ছুটে এসেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ঠিকানাটার কাছে পৌঁছেই সে কেমন এক দ্বিধায় পড়ে গেল। বাবার রক্ষিতা একটি মেয়েছেলের সাথে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে, এই ভাবনাটা যেন সেজারকে হঠাৎ কেমন বিব্রত, লজ্জিত ও বিভ্রান্ত করে তুলল। একটি নষ্টচরিত্রের মেয়ের ব্যাপারে সাধারণভাবে সবার মনেই এক বিরূপ ভাবনা কাজ করে। সেই ভাবনা থেকেই সেজার মনে মনে বেশ লজ্জিত বোধ করতে লাগল।

পরমুহূর্তেই সে নিজেকে বলল, 'আমি তো আমার বাবার কাছে কথা দিয়েছিলাম। এখন আমি প্রতিজ্ঞা থেকে ফিরে যেতে পারি না।'

কিছুক্ষণ বাদেই সেজার আঠেরো নম্বর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। সদর দরজাটা খোলাই রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে সেজার উঠে গেল চারতলায় দ্বিতীয় দরজাটির সামনে। দরজার বেলটি টিপে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। দরজাটা খুলে গেল আস্তে। সেজারের সামনে এসে দাঁড়াল সুন্দর পোশাকে এক যুবতী মহিলা।

বাদামি চুল, লালচে মুখ নিয়ে অবাক চোখে, স্থিরদৃষ্টিতে, ওই যুবতীটি চেয়ে রইল তার দরজায় দাঁড়ানো অপরিচিত যুবকটির দিকে। সে বুঝে উঠতে পারছে না কিছুই। আজ বৃহস্পতিবার দিন এ সময় তো একমাত্র সেই প্রৌঢ় অতোরই এখানে আসার কথা ছিল। কিছুটা বিস্মিত হয়ে সেজারও ভেবে পাচ্ছে না, ঠিক কী বলে এই নীরবতা ভাঙা যায়।

একটু বাদে যুবতীটি জিগ্যেস করল, 'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি, মঁসিয়ে?'

'আমি অতোর ছেলে,' সেজার উত্তরে জানাল।

যুবতী মহিলা চমকে ওঠে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'মঁসিয়ে সেজার!', কাঁপা কাঁপা গলায় ও বলে উঠল, যেন অনেকদিনের চেনা এই যুবকটি।

'হ্যাঁ, আমিই সেজার।'

'ঠিক কী কারণে ... ?'

'আমি আমার বাবার নির্দেশে এখানে এসেছি তোমার সাথে দেখা করতে, কিছু কথা বলতে।'

'হায় ঈশ্বর!' বলে মহিলাটি একটু পিছিয়ে গিয়ে সেজারকে ঘরে ঢোকার রাস্তা করে দিল। সেজার মহিলার পিছু পিছু ভেতরে চলে গেল।

সেজার দেখল ঘরের মেঝেতে বসে একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলে একটা বেড়ালকে নিয়ে খেলা করছে। পেছনে একটা জ্বলন্ত স্টোভে কিছু খাবার গরম হচ্ছে।

' বসো,' মহিলাটি সেজারকে বলল।

ও বসল।

'হ্যাঁ... ?' মহিলাটি জিগ্যাসু দৃষ্টিতে সেজারের দিকে তাকাল।

সেজারের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছিল না। ও খেয়াল করে দেখল ঘরের মাঝখানটায় একটি খাবারের টেবিল, আর তার পাশে তিনটি বসার জায়গা। একটি বাচ্চাটির জন্য। অন্য একটি চেয়ার ঘরের চুল্লিটার পাশেই এবং এই চেয়ারটার সামনে টেবিলে রাখা আছে সাদা মদের একটা আস্তবোতল। সাথেই অর্ধেকখালি একটি লাল মদের বোতল ও ক'টা খালি গ্লাস। সব কিছু দেখে সেজার আন্দাজ করল, এই চেয়ারটি পাতা আছে তার বাবার জন্য। প্রতি বৃহস্পতিবারেব মতোই আজও মহিলাটি প্রৌঢ় লোকটির অপেক্ষায় বসে আছে। সেজার দেয়ালের দিকে মুখ তুলে দেখল, তার বাবার একটি ছবি ঝুলছে। ঠিক এমনই একটি ছবি আছে তাদের নিজেদের বাড়িতেও।

'বলো, মঁসিয়ে সেজার!' মহিলাটি আবার বললে।

সেজার মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখল তার মুখে কেমন দুশ্চিন্তা ও ভয়েব ছাপ, হাত দুটি যেন কাঁপছে।

একটু বাদে, সাহস সঞ্চয় করে, সেজার বলল, ' দেখো মাদ্‌মোয়াজেল, তোমাকে জানাতেই হচ্ছে, গত রোববার আমার বাবা মারা গেছেন। মৌসুমের শুরুতেই শিকারে গিয়ে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।'

খবরটি শুনে মহিলা একেবারে স্তম্ভিত ও নিশ্চল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে একেবারে নিচু গলায় বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'নাঃ! এ কখনও হতে পারে না।'

এরপরই দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল তরুণী মহিলাটি। ওর এমন কান্না দেখে অভিভূত সেজারের চোখেও জল এসে গেল। তার মার এই কান্না দেখে সেই বাচ্চা ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে সেজারের ওপর গিয়ে চড়াও হল।

পরিবেশটা একটু হাল্কা করতে কিছুক্ষণ বাদে আবার বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, গত রোববারেই ব্যাপারটা ঘটেছে, সকাল আটটা নাগাদ...।' তার বাবা অতো-র মৃত্যুর খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে সমস্ত কিছু বর্ণনা করল সেজার। মহিলা বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল ঘটনার মর্মান্তিক বিবরণ শুনতে শুনতে, তাই সেজারকে দ্বিতীয়বার নতুন করে ঘটনার বিবরণ দিতে হল।

বাবার মৃত্যুর আদ্যোপান্ত বর্ণনা শেষ করে অতোর ছেলে সেজার মহিলাকে বলল, 'আমার

বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল, আমরা দু'জন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যেন সমস্ত কিছু ভাগ বাটোয়ারা করে নিই। দেখো, আমার কোনও অভাব নেই। বাবা আমার জন্য অঢেল সম্পত্তি রেখে গেছেন। আমি চাই না তুমি কোনওভাবে বঞ্চিত হও বা তোমার মনে কোনও ক্ষোভ থাকুক।'

হঠাৎ একটু রূঢ়ভাবেই সেজারকে থামিয়ে দিয়ে ক্যারোলিন দোনে বলে উঠল, 'নাঃ মঁসিয়ে সেজার, আজ এসব কথা থাক। আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে, এখন এসব প্রসঙ্গ থাক, অন্য কোনওদিন হবে না হয়। সম্পত্তির কোনও ভাগ যদি দিতেও হয়, তবে সেটা আমাকে নয়— কখনও নয়। একমাত্র এই ছোট্ট ছেলেটার ভবিষ্যতের জন্য, ওর নামে কিছু সম্পত্তি রাখা যেতে পারে।'

সেজার যেন বেশ একটু চমকে উঠল মহিলার কথাগুলি শোনে। তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, 'তবে কি বাচ্চাটি ... মানে এই বাচ্চাটিও আমার বাবার ছেলে!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' ক্যারোলিন দোনে উত্তরে বলল।

বিঃ দ্রঃ ফরাসি ভাষায় পুরুষদের 'মঁসিয়ে' এবং অবিবাহিত মেয়েদের মাদ্‌মোয়াজেল' বলে সম্বোধন করা হয়।

অতোর ছেলে তার ছোট্ট ভাইটির দিকে তাকিয়ে রইল বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে।

মহিলার কান্না তখনও থামে নি। অস্বস্তিভরা গলায় সেজার বলল, 'আমি তবে এবার আসছি, মাদ্‌মোয়াজেল দোনে। তুমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে আবার কবে আলাপ করতে চাও?'

'না, না!' কাঁদতে কাঁদতে মহিলা বললেন। 'এভাবে তুমি চলে যেও না, দুঃখে আমি হয়তো আর বাঁচব না। এই বাচ্চাটা ছাড়া সংসারে আমার তো আর কেউ রইল না। একটু বসো, মঁসিয়ে সেজার। আমায় তার কথা আরও বিস্তারিতভাবে বলো।'

সেজার বসল এবং তার বাবার শিকারে গিয়ে সেই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার ব্যাপারটা আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করল। ক্যারোলিন দোনে আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেজারও চোখের জল সামলাতে পারল না। সে তার ছোট্ট ভাইটিকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করল।

ওরা তিনজন চপ মেরে রইল কিছুক্ষণ। মহিলা নীরবতা ভেঙে বললেন, 'মঁসিয়ে সেজার, তোমার তো সারা সকাল কিছুই খাওয়া হয়নি?'

'না, তা অবশ্য হয়নি মাদ্‌মোয়াজেল।'

'এখন একটু কিছু খেয়ে যাও এখানে।'

'না, আমার তেমন খিদে নেই। আসলে খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও তো নেই।'

'দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তো মানুষকে বেঁচে থাকতেই হবে। তাছাড়া খেতে খেতে আরও কিছুটা সময়ও আমাদের সাথে কাটাতে পারবে। আমি জানি না, তুমি চলে যাওয়ার পর আমি যে কী করব।'

এরপর সেজার মহিলার অনুরোধ মেনে খেতে বসল। তার বাবার প্রিয় সেই লাল মদ এক গ্লাস আর কিছু গরম গরম খাবার খেয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়ল সে।

'এবার তবে আমি আসছি। মাদ্‌মোয়াজেল দোনে, এরপর আবার কবে আমাকে আসতে হবে এখানে সেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে?'

'সামনের বৃহস্পতিবার হলে কোনও অসুবিধে আছে কি, মঁসিয়ে সেজার? সপ্তাহের এই দিনটা আমার ছুটির দিন।'

'বৃহস্পতিবার আমার আসতে কোনও অসুবিধা নেই।'

'সেদিন দুপুরে এখানে খেয়ে যাবে তো?'

'না, তা বোধ হয় সম্ভব না ও হতে পারে।'

'আসলে, খেতে খেতে কথা বলার অনেক সুবিধে। সময়ও পাওয়া যায় বেশি।'

'ঠিক আছে, তবে তাই হবে।'

ছোট ছেলেটির কপালে চুমু খেয়ে এবং মাদমোয়াজেল দোনে'র সাথে করমর্দন করে সেজার অতো বিদেয় নিল।

এক সপ্তাহ বড়ই দীর্ঘ সময় মনে হল সেজারের কাছে। জীবনের এই একাকিত্ব বড়ই অসহ্য লাগছিল ওর। এতদিন সব সময় সে তার বাবার ছায়ায় থেকেছে, কাজ করেছে, আনন্দ ফূর্তিতে সময় কাটিয়েছে। এখন বচারা হঠাৎ করে একদম একা হয়ে গেছে বিশ্বসংসারে। কতদিন যে তাকে এই একাকিত্বের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে সে নিজেও ভেবে পাচ্ছিল না।

সেই মাদমোয়াজেল দোনে'র কথা এখন সবসময় মনে পড়ে সেজারের। বয়সে তরুণ ওই মহিলাটিকে যথেষ্ট ভদ্র, শোভন এবং ভালমানুষ মনে হয়েছে তার। সত্যি চমৎকার লেগেছে সেজারের ওই মহিলাটিকে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, বেশ ভাল পরিমাণ টাকা সে দিয়ে আসবে মহিলাকে তার বাচ্চাটির জন্য।

পরের বৃহস্পতিবার সেজার যথাসময়ে মাদমোয়াজেল দোনে'র বাসস্থানে গিয়ে হাজির হল।

তরুণ মহিলাটির সাথে করমর্দন এবং ছোট ছেলে এমিলের গালে চুম্বন করল সেজার। আজ এখানে এসে যেন আগের দিনের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছে সে।

মাদমোয়াজেল দোনেকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে আজ, বেচারা নিশ্চয়ই অনেক কান্নাকাটি করেছে এই ক'দিন। মহিলাটি গভীর ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রায় সর্বক্ষণ চেয়ে রইল সেজারের দিকে।

খেতে খেতে ওরা দু'জনে ওদের কাজের সব কথা সেরে নিল। সেজার অনেক টাকা দিতে চাইল মহিলাকে। ক্যারোলিন দোনে নিজের জন্য কিছুই নিতে চায় না, শুধু ওর ছেলে এমিলের ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ পেলেই যথেষ্ট। সেজার কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রইল, বরং উল্টে আরও এক হাজার ফ্রাঁ সে আলাদাভাবে মহিলার হাতে দিল। তার জীবনের এই শোকাবহ ঘটনার কথা ভেবে।

কফি খাওয়ার পর মাদমোয়াজেল দোনে সেজারকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ধূমপান করো?'

'হ্যাঁ, আমার সাথে পাইপ আছে, মাদমোয়াজেল', পকেট হাতড়ে সেজার দেখল, সে পাইপটা ভুলে বাড়ি ফেলে এসেছে। মহিলা চট করে একটা পাইপ ওকে এনে দিল, যেটা ওর বাবা ব্যবহার করতো। পাইপটা দেখেই ঠিক চিনতে পারল সেজার। বাবার রেখে যাওয়া পাইপটাতে তামাক পুরে মনের সুখে গভীর তৃপ্তিতে ধূমপান উপভোগ করল সেজার। তারপর সেই ছোট্ট এমিলের সাথে খেলে কিছুটা সময় কাটাল সে।

নিতান্ত অস্থিরতা সত্ত্বেও তিনটে নাগাদ ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল সেজার। ফিরে যেতে একদমই চাইছিল না ওর মন।

'আচ্ছা মাদ্‌মোয়াজেল দোনে, এবার তবে আসছি। আজ আবার তোমার সাথে দেখা হওয়াতে বড়ই ভাল লাগল।'

যুবতী মহিলাটি সলজ্জ দৃষ্টিতে সেজারের দিকে মুখ তুলে তাকাল,খুব মনে পড়ছিল ওর বাবা অতোর কথা।

'আমাদের কি আর দেখা হবে না, মঁসিয়ে সেজার?'

'হ্যাঁ, মাদ্‌মোয়াজেল, তুমি চাইলেই হবে।'

'অবশ্যই মঁসিয়ে। সামনের বৃহস্পতিবার হলে কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'ঠিক আছে, মাদ্‌মোয়াজেল দোনে।'

'দুপুরের খাবারও তবে এখানেই খেয়ে যাবে।'

'কিন্তু? ... আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি চাও তবে তাই হবে।'

'এই কথাই রইল তবে মঁসিয়ে সেজার, পরের বৃহস্পতিবার দুপুরে, ঠিক আজকের মতোই।'

'হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার দুপুরে, মাদ্‌মোয়াজেল দোনে।'

(সামান্য সংক্ষেপিত অনুবাদ)

একটি ফাঁসি

মূলগল্প ঃ **A Hanging :**

লেখক ঃ **George Orwell (Europe)**

[ইংরেজ মা-বাবার সন্তান, জর্জ ওরওয়েল জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালে, অবিভক্ত বাংলার মতিহারিতে। পড়াশোনা করেন বিলেতের বিখ্যাত ইটন স্কুলে। পরবর্তীকালে তিনি ব্রহ্মদেশে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি করেন ক'বছর। তারপর আবার ইউরোপে ফিরে যান। Burmese Days, Homage to Catalonia, Animal Farm ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় রচনা।

গত শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ শাসনকালে, প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে অসংখ্য ভারতীয়ের বসবাস ছিল। সরকারি চাকুরিতে কর্মরত ছিল বহু বঙ্গসন্তান এবং দক্ষিণ ভারতীয়। সেই তখনকার ব্রহ্মদেশের জেলখানাগুলিতে চালান দেওয়া হত বহু দণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় আসামীকে। প্রায় এক শতাব্দী আগেকার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই গল্পটি ইতিহাসের ছোট্ট একটি প্রামাণ্য দলিল।

অনুবাদক]

স্থানটি ব্রহ্মদেশ। এক বৃষ্টিভেজা সকালের ঘটনা। উঁচু দেওয়ালের ওপর দিয়ে একফালি হাল্কা রোদ এসে পড়েছে জেলখানার ফাঁকা উঠোনে। আমাদের সামনে পরপর পশুর খাঁচার মতো কতগুলি ছোট ছোট কুঠরি। সেগুলির ভেতর, লোহার গরাদের পেছনে বন্দি হয়ে আছে মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত এক একজন কয়েদি। দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই এদের সবার ফাঁসি হয়ে যাবে।

আজ একজনের পালা। ওকে তার কুঠরি থেকে বের করে আনা হয়েছে। দুর্বল ও ক্ষীণদেহ এই লোকটি একজন হিন্দু। ঘোলাটে আর ভাসা- ভাসা তার চোখের দৃষ্টি। তার গোঁফ জোড়া অবশ্য বেশ মোটা। ছ'জন তাগড়াই ভারতীয় কারারক্ষী লোকটিকে ঘিরে রেখেছে। ওকে নিয়মমাফিক প্রস্তুত করা হচ্ছে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দু'জন রক্ষী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটার দু'পাশে। বাকিরা ওকে হাতকড়া পরিয়ে তার ভেতর দিয়ে শেকল ঢুকিয়ে নিজেদের কোমরের বেল্টের সাথে শক্ত করে বেঁধে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি অবশ্য একেবারেই ভাবলেশহীন, কোনও কিছুতেই সামান্য প্রতিক্রিয়াও নেই তার।

সকাল আটটার ঘন্টা বাজল, দূরের সেনা-ছাউনি থেকে ভেসে এল বিউগ্‌ল-এর ক্ষীণ আওয়াজ। আমাদের থেকে সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। ভদ্রলোক মাথা নিচু করে আনমনাভাবে মাটিতে হাতের লাঠিটা ঠুকছিলেন। ঘণ্টার শব্দ শোনার সাথে সাথে তিনি মাথা তুললেন। আদতে ভদ্রলোক সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার। ওঁর গলার আওয়াজ বেশ কর্কশ। বিরক্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, ফ্রান্সিস্ আর সময় নষ্ট করো না। চটপট সব শেষ করে নাও। এতক্ষণে তো লোকটার মরে লাশ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এত

সময় লাগছে কেন?

ফ্রান্সিস এই জেলখানার হেড জেলার। লোকটা দক্ষিণ ভারতীয়। কালো রঙ, দশাসই চেহারা। সাদা ধবধবে ওর পোশাক, চোখে সোনালি চশমা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোকটা উত্তর দিল, হ্যাঁ স্-স্যার, হ্যাঁ স্-স্যার! সব কিছু একদম প্রস্তুত। জল্লাদও তৈরি। আমরা এক্ষুনি কাজ শুরু করে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, এক্ষুনি যাও। অযথা আর সময় নষ্ট করো না। এই কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকি কয়েদিদের সকালের জলখাবারও তো জুটবে না।

আমরা সবাই ফাঁসি কাঠের দিকে রওনা দিলাম। দু'জন বন্দুকধারী রক্ষী কয়েদির দু'পাশে হেঁটে যাচ্ছে। অন্য দু'জন তার হাত চেপে ধরে এগিয়ে চলেছে। পেছন পেছন চলেছি ম্যাজিস্ট্রেট সহ আমরা বাকিরা সবাই। কয়েক পা এগোবার পরই হঠাৎ সবাই দাঁড়িয়ে গেল। একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। একটা কুকুর, ঈশ্বর জানেন, কোথা থেকে আচমকা জেলখানার উঠোনে দেখা দিল! চিৎকার করতে করতে এবং লাফাতে লাফাতে জন্তুটা আমাদের দিকে ছুটে এল। এতগুলি মানুষকে একসাথে এভাবে দেখে ওর যেন আর আনন্দ ধরে না। আমাদের চারপাশে এলোপাথাড়ি লাফালাফি শুরু করে দিল শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে। পেল্লায় আকারের লোমশ কুকুরটা হঠাৎ ফাঁসির আসামিটির ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং লোকটার মুখ চেটে দেবার চেষ্টা শুরু করল। পশুটার কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষিপ্ত হয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট চেঁচিয়ে উঠলেন, কী হচ্ছে এসব? কে ছেড়ে দিয়েছে জংলি জন্তুটাকে এখানে? যাও, একজন গিয়ে ধরো ওটাকে!

একজন রক্ষী ছুটে গেল কুকুরটার দিকে। তিড়িং তিড়িং করে এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াতে লাগল কুকুরটা। যেন বেশ মজা পেয়েছে। আর শেকলে বাঁধা আসামীটি অবাক হয়ে ব্যাপারটা খেয়াল করছে, ভাবছে, এই ঘটনাটাও বোধ হয় ফাঁসির প্রস্তুতিরই একটা অঙ্গ। অবশেষে একজন জন্তুটাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হল।

আমরা সবাই আবার ফাঁসিকাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আমার সামনেই চলেছে আসামীটি রক্ষীবেষ্টিত হয়ে। হাত দু'টি বাঁধা, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পা ফেলে চলেছে লোকটি। যেতে যেতে সামনে একটি ছোট্ট জলের গর্ত দেখে চট করে সে তার শরীরটা একপাশে সরিয়ে নিল। আমি অবাক হয়ে গেলাম ব্যাপারটা দেখে। মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি এসেও মানুষটা এখনও এমন সজাগ! কী নিদারুণ অন্যায় এমন একটি জীবনকে শেষ করে দেওয়া! ওর দেহের ভেতর ও বাইরের প্রতিটি অঙ্গ এখনও পুরোমাত্রায় জীবিত। আমাদের মতোই। লোকটার দেহ ও মন এখনও আমাদের মতোই সংবেদনশীল। সে এখনও স্বচ্ছন্দে চলতে পারে, ভাবতে পারে। ফাঁসির পাটাতনে শেষবারের মতো লোকটা যখন দাঁড়াবে তখনও তার প্রতিটি অঙ্গ সজাগ ও সক্রিয় থাকবে। তার খাদ্যযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র সবই কাজ করতে থাকবে। তার চামড়া, তার নখ, তার দেহের কোষকলায় তখনও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে চলবে।

এই ফাঁসির আসামি আর আমরা মিলে একসাথে একদল লোক হেঁটে চলেছি এখন।

অল্পক্ষণ বাদেই এক-হেঁচকায় আমাদের দলটি থেকে হারিয়ে যাবে একজন—হারিয়ে যাবে একটি মন ও তার জগৎ।

ফাঁসিকাঠটি তৈরি করা আছে একফালি ফাঁকা জায়গায়, কারাগারের মূল উঠোন থেকে সামান্য দূরে। তিনদিকে ইটের দেয়াল, সামনের দিকটা খোলা। দেখতে অনেকটা কোনও গুদামঘরের মতো। দু'পাশের দেয়াল দু'টির মাথায় পাতা আছে সমান্তরাল দু'টি শক্ত কড়িকাঠ। সেই দু'টির ওপর আড়াআড়িভাবে পাতা আছে আরও একটি মোটা কড়িকাঠ। আর শেষেরটি থেকে ঝুলছে একটি মোটা দড়ি।

জেলখানার সাদা পোশাক পরে পাকাচুল জল্লাদটি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মেশিনটির পাশে। লোকটা নিজেও একজন কয়েদি। আমাদের দেখা মাত্র অনুগত ক্রীতদাসের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল সে।

ফ্রান্সিস্ আদেশ দেওয়ামাত্র দু'জন কারারক্ষী আসামিকে ফাঁসিকাঠের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। ছোট্ট একটা মই বেয়ে উঠে লোকটাকে ওরা টেনে হেঁচড়ে ওপরে তুলে আনল। এবং সঠিকভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। এবার জল্লাদ মই বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে আসামির গলায় ফাঁসির দড়িটি যত্ন করে পরিয়ে দিল। রক্ষীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ফাঁসিকাঠের চারপাশে। আমরা বাকিরা দাঁড়িয়ে আছি পনেরো-বিশ ফুট দূরত্বে।

গলায় দড়িটি জড়িয়ে দেওয়ামাত্র আসামি জোরে জোরে তার ঈশ্বরের নাম নিতে শুরু করল, হে রাম! হে রাম! হে রাম! হে রাম ...! তার এই নাম নেওয়ার পেছনে কোনও স্বার্থসিদ্ধির বা সাহায্যের প্রার্থনা ছিল না, ছিল না কোনও ভয়ভীতির আভাসও। দীর্ঘদিনের অভ্যাসমতো লোকটি সুর করে নিয়ে চলেছে তার পরমেশ্বরের নাম, অনেকটা কোনও মন্দিরের ক্রমাগত সুরেলা ঘন্টাধ্বনির মতো। এরই মধ্যে দূর থেকে ভেসে এল সেই কুকুরটির প্রলম্বিত এক আর্তচিৎকার।

তার কাজের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে জল্লাদ একটি কাপড়ের থলির ভেতরে গলিয়ে দিল আসামির মাথাও মুখ। লোকটি তখনও একইভাবে উচ্চারণ করে চলেছে, হে রাম! হে রাম! হে রাম...!

সব প্রস্তুতি সেরে জল্লাদ নিচে নেমে এল। ফাঁসির হাতলটি ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অভিশপ্ত লোকটির রাম-নাম তখনও অবিরাম চলছে, এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাথা একদম নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, অভ্যেসবশে লাঠিটি মাটিতে ঠুকে চলেছেন। হয়ত ভদ্রলোক আসামিকে তার শেষ প্রার্থনার জন্য আরও একটু সময় দিচ্ছেন। আমাদের প্রত্যেকের চেহারায় এক চাপা উত্তেজনার ছাপ। আমরা চেয়ে আছি পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো লোকটার আচ্ছাদিত মাথাটার দিকে। একইভাবে ভেসে আসছে ওর 'হে রাম' উচ্চারণ। অতিক্রান্ত হচ্ছে এক একটি সেকেণ্ড। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না এই মুহূর্তগুলি, শেষ করো লোকটাকে এক্ষুনি থামিয়ে দাও ওর ক্রমাগত উচ্চারিত অসহনীয় শব্দগুলিকে!

আচমকা সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাথা তুলে তাকালেন, হাতের লাঠিটি দ্রুত নেড়ে একটা ইশারা

করলেন। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, চলো !

সাথে সাথে ঝনঝনিয়ে একটি শব্দ হল। তারপরই নেমে এল এক মৃত্যুর নীরবতা। সেই অভিশপ্ত মানুষটির দেহটা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে তলিয়ে গেছে। টান-টান দড়িটি আস্তে পাক খেয়ে চলেছে। ছাড়া পেয়ে সেই কুকুরটা দৌড়ে চলে গেল ফাঁসিকাঠের একদম পাশে। সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। একটি চাপা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল জন্তুটির মুখ থেকে। তারপর এক দৌড়ে পালিয়ে গেল উঠোনের এক কোণে। সেখান থেকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

একটু বাদেই আমরা এগিয়ে গেলাম ফাঁসিকাঠের নিচের দিকে, একেবারে পাশ থেকে কয়েদির মৃতদেহটি দেখতে। লোকটা দড়িতে ঝুলছে, এখনও হাল্কা দোল খাচ্ছে। ওর পায়ের আঙুলগুলি সোজা মাটির দিকে তাক করা।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হাতের লাঠিটা দিয়ে একটু খোঁচা মারলেন দেহটাতে। সামান্য দোল খেল ঝুলন্ত লাশটা। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, ও একদম ঠিক আছে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ফাঁসিকাঠের আড়াল থেকে। লম্বা শ্বাস নিলেন একবার। তাঁর মুখ থেকে উদ্বেগের সব ছাপ মুছে গিয়েছে। হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠলেন, আটটা বেজে আঠার মিনিট। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।

কারারক্ষীরা তাদের বন্দুকের বেয়নেট খুলে নিল এবং মার্চ করে বেরিয়ে গেল। সেই কুকরটিও লেজ নামিয়ে ওদের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। আমরাও সবাই ফাঁসিকাঠের পাশ থেকে বেরিয়ে জেলের উঠোনে চলে এলাম। ফাঁকা জায়গায় সব কয়েদি[illegible] সা[illegible]য়ে মাটিতে বসে পড়েছে সকালের জলখাবার খেতে। একদল কারারক্ষী সব [illegible] তদারক করছে। ফাঁসির কাজটা সময় মতো নির্ঝঞ্ঝাটে মিটে যাওয়ায় সবাই বেশ হাসিখুশি। সবাই কেমন বকবক করতে শুরু করল। অনেকেই অকারণ ঠাট্টা মস্করায় মেতে উঠল।

যে যুবকটি আমার পাশে পাশে হাঁটছি সে হঠাৎ আমায় হেসে বলল, একটা কথা জানেন কি স্যার, আমাদের বন্ধুটি (মৃত কয়েদিটিকে বোঝাতে চাইল ও) যখন প্রথম শুনতে পেল যে তার আপিল আদালতে খারিজ হয়ে গেছে, তখন সে পেচ্ছাব করে দিয়েছিল নিজের কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ভয়ের চোটে। নিন স্যার, একটা সিগারেট ধরান। আমার নতুন সিগারেট কেস্‌টা কেমন দেখছেন ? আড়াই টাকায় কেনা, খাঁটি ইউ[illegible] স্টাইলের জিনিস।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ফ্রান্সিস বলতে লাগল, শেষপর্যন্ত সব কিছু নির্বিঘ্নে ও ভালভাবে মিটে গেল, স্যার। এক ঝটকায় সব ঝামেলা চুকে গেল। সব সময় কিন্তু এত সহজে সব কিছু মিটে যায় না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ডাক্তারবাবু ফাঁসিকাঠের নিচে গিয়ে কয়েদির পা ধরে টেনে রেখেছেন জোরে, যাতে মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত হয়। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও বাজে ব্যাপার, জেল সুপার মন্তব্য করলেন।

কোনও সন্দেহ নেই, স্যার। মাঝে মাঝে তো আরও বাজে ব্যাপার ঘটে। কোনও কোনও

কয়েদিকে তার কুঠরি থেকে বের করতে গিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। গরাদের শিক ধরে প্রাণপণ আটকে রাখবে নিজেকে। ছাড়িয়ে বের করে আনতে পাঁচ -সাতজন বন্দিকে একসাথে হাত লাগাতে হয়। একবার একজনকে তো তাতেও কাবু করা যায়নি। আমরা প্রায় প্রার্থনার সুরে ওকে বললাম, দেখো বাবাজি, একবার ভেবে দেখো, তুমি আমাদের কী পরিমাণ ঝামেলা আর কষ্টে ফেলেছ ! অনেক হয়েছে, এবার বেরিয়ে এসো। না, কোনও কিছুতেই লোকটাকে টলানো যাচ্ছিল না। কী পরিমাণ সংগ্রাম যে আমাদেব সবাইকে সেদিন করতে হয়েছে!

ফ্রান্সিসের কথাগুলি শুনে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। আমিও বাদ যাইনি। ওই গুরুগম্ভীব সুপার পর্যন্ত একুট মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, এসো, সবাই বাইরে গিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নিই। আমার গাড়িতে এক বোতল হুইস্কি আছে, তাতেই আমাদের হয়ে যাবে।

জেলখানাব দু'টি ফটক পেবিয়ে আমবা বাইবে এসে দাঁডালাম। ফ্রান্সিসেব সেই মজাব কথাগুলো নিয়ে আবার একপ্রস্থ হাসি ঠাট্টা হল। তাবপর আমরা সবাই মিলে হুইস্কি খেলাম মনের সুখে। ইউরোপীয আর দেশীয লোকদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে। সবাই আনন্দে মেতে উঠলাম একসাথে।

বিভাস পালচৌধুরী

রাজযোটক

অপর্ণার মনটা খুব খারাপ। এত কম বয়সে কী করে তার এই মারাত্মক রোগ হলো? কোনদিন তো সে শরীরের ওপর কোন অত্যাচার করেনি। নিয়ম মেনে চলাফেরা করেছে। ব্যতিক্রম হয়নি কখনও।

প্রায় দেড় মাস আগে স্নানের সময় অপর্ণার ডানদিকের স্তনে একটা চাকার মত কী যেন হাতে লাগে।

কালবিলম্ব না করে পরদিনই সে তার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলো। ডাক্তারবাবু অপর্ণাকে পরীক্ষা করে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অপর্ণাকে একজন সার্জনের কাছে যেতে পরামর্শ দিলেন। অপর্ণা ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে, আমার কী হয়েছে ডাক্তারবাবু? কোন খারাপ রোগ হয়নি তো? আমাকে দেখে আপনি কেন এত চিন্তিত হয়ে পড়লেন? আমার খুব ভয় হচ্ছে কোন জটিল রোগ হয়ে গেলো না তো?

অপারেশনের পর Biopsy রিপোর্টনা দেখে এখন কিছু বলা যাবে না। দেরি করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি একজন সার্জনকে দেখাতে হবে। একজন ভাল সার্জনের নামও বলে দিলেন ডাক্তারবাবু।

অপর্ণা পরদিনই সার্জনকে দেখাতে গেলো। সার্জন চৌধুরী অপর্ণাকে পরীক্ষা করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে অপারেশন করার কথা বললেন।

অপর্ণার মনটা একদম ভেঙে গেলো। এমন রোগ হলো সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করতে হবে। ডাক্তারবাবুদের কথাবার্তা এবং মনের অবস্থা দেখে সে ভেবে নিয়েছে তার কোন মারাত্মক রোগ হয়েছে।

অপর্ণার বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। বিয়ে থা এখনও হয়নি। একটা সরকারি অফিসে চাকরি হয়েছে মাত্র এক বছর। এরই মধ্যে কী মারাত্মক অসুখ হলো? না হলে ডাক্তারবাবুরা এত চিন্তিত কেন?

দু'দিন পরই অপর্ণার অপারেশন হয়ে গেলো। ডান স্তনটা পুরোই অপারেশন করে বাদ দিতে হলো। সার্জন চৌধুরী খুব যত্ন করে অপর্ণার অপারেশন করলেন। অপারেশনের পর অপর্ণার কোন অসুবিধে হয়নি। সেলাইগুলো খুব সুন্দর জোড়া লেগেছে। সাতদিন পর অপর্ণার ছুটি হয়ে গেলো। বাড়ি ফিরে এলো অপর্ণা, কিন্তু মনটাতে একদম শান্তি নেই। Biopsy রিপোর্টে কি আসে সেই চিন্তায় সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো।

দশ দিন পর সার্জন চৌধুরী অপর্ণাকে খবর দিলেন। অপর্ণা সার্জন চৌধুরীর সাথে দেখা করতে গেলো। ডাক্তারবাবু অপর্ণাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

রিপোর্টটা অপর্ণাকে পড়ে শুনালেন। রিপোর্টটা দেখে ডাক্তারবাবুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। ক্যান্সার বলেই রিপোর্ট এসেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডাক্তারবাবু।

অপর্ণার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেলো। বুক ভরা অশান্তি আর চেপে রাখতে পারলো না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। মুহূর্তের মধ্যে সে সমস্ত জীবনের অঙ্ক কষে ফেলেছে। আর তো সে বেশি দিন বাঁচবে না! সব যেন তার কাছে অন্ধকার লাগলো।

ডাক্তারবাবু অপর্ণাকে বোঝালেন, আপনি মন খারাপ করবেন না। দুটো ভাল দিক আছে এই রিপোর্টের। একটা হলো রোগটা খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়েছে। আরেকটা হলো Biopsy রিপোর্টে যে ক্যান্সারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা খুব ধীরগতিতে বাড়ে। সুতরাং ক্যান্সার হলেও অপর্ণা অনেকদিন বাঁচবে। ডাক্তারবাবু আরও বললেন, অপর্ণাকে মুম্বাই টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে যেতে হবে। চেকআপের জন্যে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তিনি আরও বললেন, আপনার মত রোগী আমার আরও কয়েকজন আছেন। চিকিৎসার পর তারা সম্পূর্ণ সুস্থ। দশ পনের বৎসর পরও তারা ভাল আছেন। কোন অসুবিধে নেই। দায়িত্ব নিয়ে সংসারের কাজকর্ম করছেন। আপনিও অনেকদিন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবেন। এবার মুম্বাই যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। বেশি দেরি করবেন না।

অপর্ণার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এতবড় মারাত্মক রোগ তার হয়ে গেলো! ঈশ্বর তাকে এত বড় শাস্তি দিলেন। এখন সে কী করবে। এক ঝাপটায় তার সব চিন্তাধারা উল্টো পাল্টা হয়ে গেলো। আর তো সে বেশিদিন বাঁচবে না! ডাক্তারবাবু বলেছেন মুম্বাই যাওয়ার জন্যে। যাবে কি? গিয়ে কী হবে? এসব চিন্তা তার মনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

অপর্ণার বাবার মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েটার কী বা বয়স। এই বয়সে এত বড় রোগ হয়ে গেলো। বিয়ে-থাও দেয়া হলো না। মাত্র চাকুরি হয়েছে। বিয়ের দু-একটা ভাল আলাপও এসেছিল। এখন তো এসব ভুলে যেতে হবে। আগে মেয়েটাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে মুম্বাই যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। অপর্ণাকে বোঝালেন, তোমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। ডাক্তারবাবু তো তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলেছেন। এ ধরনের রোগ তো খুব আস্তে আস্তে বাড়ে। তবে কেন তুমি এত চিন্তা করছ। মনটাও শক্ত কর। তুমি তো শিক্ষিতা মেয়ে। কোন বিপদে তোমাকে তো ভেঙে পড়তে দেখিনি!

সাতদিন পরই মুম্বাই যাওয়ার দিন স্থির হলো। অপর্ণার বাবাই অপর্ণাকে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে অপর্ণার মাও যাবেন। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে নিলেন অপর্ণার বাবা। ডাক্তারবাবু একটি ব্যক্তিগত চিঠিও দিলেন। মুম্বাই ক্যান্সার হাসপাতালের ডাক্তার সার্জন চৌধুরীর খুব পরিচিত। তিনি আরও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন। সবাই ওখানে খুব সাহায্য পেয়েছেন। অপর্ণার জন্যে সার্জন চৌধুরীর মনটা খুব খারাপ। এত কম বয়সে এই রোগটা হয়ে গেলো! সাধ আহ্লাদ কিছুই মিটলো না মেয়েটার।

অপর্ণার বাবা ও মা অপর্ণাকে নিয়ে মুম্বাই পৌঁছলেন। মঙ্গলমত। রাস্তায় কোন অসুবিধে হয়নি। পরদিনই টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ করলেন অপর্ণার বাবা।

যথাসময়ে হাসপাতালে পৌঁছলো অপর্ণা। হাসপাতালে গিয়ে দেখলো অনেক ক্যান্সাররোগী, যেন ক্যান্সাররোগীর বাজার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও অনেক ক্যান্সাররোগী এসেছেন। তারা অনেকদিন ধরে এই রোগে ভুগছেন। নিয়মিত আসেন চেক-আপের জন্য। এখন ভাল আছেন। এসব দেখে অপর্ণার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এলো।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারের সামনেই অপর্ণা বসেছিল। ডাক পড়তেই কাগজপত্রও চিঠিটা নিয়ে সে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকলো। ডাক্তারবাবু সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। কাগজপত্রগুলো অপর্ণা ডাক্তারবাবুর কাছে এগিয়ে দিল। ডাক্তারবাবু কাগজপত্রগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। অপর্ণাকে পরীক্ষা করেও দেখলেন। ডাক্তারবাবু আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বললেন এবং রিপোর্ট নিয়ে পরের দিন আসতে বললেন।

অপর্ণা পরের দিনই ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা করলো। রিপোর্টগুলো দেখে ডাক্তারবাবু অপর্ণাকে chemotherapy দেবেন বলে স্থির করলেন। পাঁচটা sitting এ প্রায় একমাস লাগবে বলেও জানালেন। প্রথম chemotherapy-র জন্যে অপর্ণাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন।

পাঁচটা chemotherapy-র কোর্স শেষ হয়ে গেছে মঙ্গলমতই। অপর্ণার শরীরটা খুব দুর্বল। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী পাঁচদিন বিশ্রামের পর ট্রেনের টিকিট কাটলেন অপর্ণার বাবা।

অপর্ণার শরীরটা আগের চেয়ে এখন একটু ভালো। রিজার্ভেশনে টিকিট পাওয়া গেছে, তাই রাস্তায় খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। হাওড়া-মুম্বাই মেলেই এসেছিলেন তাঁরা। ঘন্টা দু-এক চলার পর অপর্ণা লক্ষ করলো তার বুকের অপারেশনের জায়গাটা একটু ভেজা লাগছে। তাকিয়ে দেখে জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেল অপর্ণা। বাবাকে ব্যাপারটা জানালো। এ অবস্থায় বাবা কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। এখানে ডাক্তার কোথায় পাবেন। এসব চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন। পাশের সিটের একজন মহিলা সব লক্ষ করছিলেন। অপর্ণার বাবাকে মহিলা বললেন, আপনি ট্রেনের টিকিট চেকার বা অন্য কাউকে অপর্ণার অসুস্থতার কথা জানান। ট্রেনে অনেক সময় ডাক্তার থাকেন, না হলে ওরা ঘোষণা করবে কোন ডাক্তার প্যাসেঞ্জার হিসেবে যাচ্ছেন কিনা? পেলে সাহায্য নেবেন।

মহিলার কথা শুনে অপর্ণার বাবা একটু শান্তি পেলেন। দেরি না করে টিকিট চেকারের কাছে গিয়ে অপর্ণার অসুখের কথা বললেন। টিকিটচেকার অপর্ণার বাবাকে বললেন, আমাদের তো কোন ডাক্তার এই ট্রেনে নেই। তবে, আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি, ট্রেনে যদি কোন ডাক্তার যাত্রী হিসেবে থাকেন, এসে ওকে দেখার জন্যে।

তিনবার ঘোষণা করার পরও ডাক্তারবাবু কেউ এলেন না। কিছুক্ষণ পর একজন ভদ্রলোক এসে তাদের সিটের সামনে দাঁড়ালেন। অপর্ণার বাবাকে বললেন, আপনাদের কার অসুখ? অপর্ণার বাবা অপর্ণাকে দেখিয়ে ওর অসুখের কথা বললেন।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। তার নাম অভিজিৎ দে। তিনি ত্রিপুরায় থাকেন। মাঝে মাঝে মুম্বাই যান চেকআপের জন্য। তার বৃহদান্ত্র (colon-এ) ক্যান্সার হয়েছিল পাঁচ বৎসর

আগে। অপারেশনের পর প্রতিবছরই একবার চেকআপের জন্য টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে যান। এবারও এসেছিলেন চেকআপের জন্যে। ওর কাছে কিছু ওষুধপত্র আছে। যদি অপর্ণার বাবা অনুমিত দেন তাহলে তিনি তা প্রয়োগ করে দেখতে পারেন।

অভিজিৎবাবু অপর্ণার কী হয়েছে জানতে চান। অপর্ণার বাবা কাগজপত্রগুলো এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিছুক্ষণ হলো অপারেশনের জায়গা থেকে একটু একটু করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অভিজিৎবাবু কাগজপত্রগুলো চট করে দেখে নিলেন। অপর্ণার বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। অভিজিৎবাবুর কথায় রাজি হয়ে ওষুধ ব্যবহার করতে অনুরোধ করলেন।

অভিজিৎবাবু অপর্ণাকে বললেন, আমি ডাক্তার নই, তবে অনেক দিন অসুখে ভুগে ভুগে ওষুধ সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। জরুরি কিছু ওষুধ সব সময় সঙ্গে রাখি যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। আপনি ভয় পাবেন না, একটা ইঞ্জেকশন দেবো আর রক্তপাতের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দেব, তাতে আশা করি রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।

অভিজিৎবাবু অপর্ণাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেন এবং ব্যাগ থেকে একটা ওষুধ বের করে রক্তপাতের জায়গায় লাগিয়ে একটু তুলো দিয়ে চাপ দিয়ে ধরলেন।

অপর্ণা অভিজিৎবাবুকে দেখছিল, বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর হবে। সুন্দর স্বাস্থ্য, দেখলে মনেই হয় না ওরও ক্যান্সার হয়েছিল। ওকে দেখে অপর্ণা ভরসা পায়। তাহলে তো অপর্ণাও অভিজিৎবাবুর মত সুস্থ হয়ে যাবে।

আধা ঘন্টার মধ্যে অপর্ণার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো। অভিজিৎবাবু অপর্ণার অপারেশনের জায়গাটাতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন ওর সিটটা পাশের কামরাতেই। সিট নাম্বারটাও দিয়ে গেলেন এবং কোন অসুবিধে হলে খবর দিতে বলে গেলেন। তিনি মাঝে মাঝে এসে খবর নেবেন বলেও আশ্বস্ত করে গেলেন অপর্ণাকে।

ঘন্টা দু-এক পর অভিজিৎবাবু অপর্ণাকে আবার দেখতে এলেন। অপর্ণা ভাল আছে। এখন আর কোন অসুবিধে নেই। মনটাও ভাল হয়ে গেছে। অভিজিৎবাবুর সাহায্য এবং তার শরীরের সুস্থতা অবস্থা দেখে মনের জোর অপর্ণার অনেক বেড়ে গেল।

অপর্ণা অভিজিৎবাবুকে তার বাবার সিটে বসার জন্যে অনুরোধ করলো। মনে হলো একজন ভরসা করার লোক পাওয়া গেলো। অপর্ণা ত্রিপুরার মেয়ে, অভিজিৎবাবুও ত্রিপুরার, রোগও একই ধরনের হয়েছে, তাই মনের মিলও আকর্ষণটা একটু বেশি অনুভব হলো। আলাপ সালাপের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতাও বেড়ে গেলো।

অভিজিৎবাবু তিনবার এসে অপর্ণাকে দেখে গেছেন। অপর্ণা ভাল আছে। হাওড়াতে ট্রেন পৌঁছার আগে অভিজিৎবাবু অপর্ণার আগরতলার ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন এবং নিজের ঠিকানাও অপর্ণাকে দিলেন। কোন কাজে লাগলে খুব ভাল লাগবেও বলে গেলেন।

অভিজিৎবাবু হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের বিষয় শিক্ষক। বিয়ে-থা করেননি। এই রোগ হয়ে যাবার পর আর ওসব চিন্তাও করেননি। যে ক'দিন বেঁচে থাকবেন এ ভাবেই কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। খুব নিয়ম মেনে চলেন তাই ভাল আছেন।

অপর্ণা আগরতলায় ফিরে এসেছে। তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে অনেক সুস্থ। ক্যান্সার হাসপাতালে তার মত অনেক রোগী দেখেছে। সবাই মোটামুটি ভাল আছে। তারপর অভিজিৎবাবুর সাথে দেখা হওয়ার পর মনের জোর আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

সাতদিন বিশ্রামের পর অপর্ণা কাজে যোগ দিয়েছে। সহকর্মীরা এসে অনেক উপদেশ দিলেন, সহানুভূতি দেখালেন, কেউ কেউ আবার ভয়ও দেখালেন। অপর্ণা এতে ঘাবড়ায়নি। সে বুঝেছে নিয়মমাফিক চললে অনেক দিন সে সুস্থ থাকতে পারবে।

এক সপ্তাহ পর অভিজিৎবাবু অপর্ণাকে দেখতে এলেন। ভাল আছে শুনে আশ্বস্ত হলেন। এভাবে অভিজিৎবাবু মাঝে মাঝে আসেন। দু'জনে কথা হয়, গল্প হয়। অভিজিৎবাবু আস্তে আস্তে অনুভব করেন অপর্ণার প্রতি তার একটা দুর্বলতা ও একটা অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মে গেছে। সপ্তাহে একবার না আসতে পারলে মনটা কেমন হয়ে যায়।

অপর্ণাও অভিজিৎবাবুর দুর্বলতার কথা অনুভব করতে পারে। তার মনের গভীরেও একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে অনুভব করে। সেও অভিজিৎবাবুকে ভালবাসতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে একদিন ভালবাসার গভীরতা আরও বেড়ে যায়। অভিজিৎবাবু একদিন কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন এবং এও বললেন অপর্ণা যদি রাজি হয় তাহলে তারা সংসার করার কথাও চিন্তা করতে পারেন। প্রস্তাবটি শুনে অপর্ণার বুকটা কেমন করে উঠলো। মুখটা লাল হয়ে গেলো। অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আমায় একটু চিন্তা করার সময় দিন, একটু সময় চেয়ে নিল।

অভিজিৎবাবু অপর্ণার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে অনেক কিছু ভাবলেন। কথাটা বলে ঠিক করলেন কিনা। অপর্ণা এখন কী ভাবছে? তাকে ভুল বুঝে ফেললো কিনা ইত্যাদি। অভিজিৎবাবুর একটাই সান্ত্বনা যে মনের কথা তিনি অপর্ণাকে বলতে পেরেছেন। এখন অপর্ণা যা ভাল মনে করে তাই করবে।

অপর্ণা অনেক চিন্তা করলো। এভাবে সংসার জীবনে পা দেবে কিনা। তার তো ক্যান্সার হয়েছে, এখন আর এসব সাধ আহ্লাদের কথা ভাবার দরকার আছে কিনা। কতদিনই বা বাঁচবে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অভিজিৎ বাবুরও তো ক্যান্সার। উনি যদি সাহস করেন, তাহলে তার তো এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কোন কারণ নেই। একজন তো আরেকজনের পরিপূরক হিসেবে আজীবন বেঁচে থাকতে পারে। আর তারা তো একজন অপরজনকে পছন্দও করে। রোগ হয়েছে, চিকিৎসাও তো তারা করেছে নিয়মমাফিক। এখন তো তারা ভাল আছে। তাই অভিজিৎবাবুর প্রস্তাবে তো কোন অযৌক্তিকতা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। বরং তার প্রস্তাবে অনেক গভীরতা আছে। রাজি হয়ে গেলে একজন তো অপরজনকে দেখে শুনে রাখতে পারবে। আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবলো অপর্ণা। সাতদিন প্রায় হয়ে গেলো। এখনও তো তার মনের কথা তার সিদ্ধান্তের কথা অভিজিৎবাবুকে জানাতে পারলো না। অপর্ণা কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। দুশ্চিন্তা তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সবশেষে অপর্ণা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তার বাবাকে এবং ডাক্তারবাবুকে জানাবে। তাদের মতামত পাবার পরই সে সিদ্ধান্ত নেবে।

অপর্ণা বাবাকে কথাটা খুলে বললো। অপর্ণার বাবা অনেক চিন্তা করে সবশেষে রাজি হয়ে গেলেন। ভাবলেন, মেয়েটা যতদিন বেঁচে থাকবে, সাথি হিসেবে একজনকে তার পাশে পাবে। এতে তো অমত করার কিছু নেই। তিনি এতে খুশি। অপর্ণা পরদিন ডাক্তার চৌধুরীর চেম্বারে গেলো। সমস্ত বিষয়টা তাঁকে খুলে বললো এবং তার মতামত চাইলো। ডাঃ চৌধুরী অপর্ণার প্রস্তাব শুনে খুব খুশি। ভাবলেন, এটা তো এক অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। এদের বিয়ে হতে তিনি তো কোন অসুবিধে দেখছেন না। বরং একজন অপরজনকে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে পারবে। মনের দিক দিয়ে খুব কাছে আসতে পারবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে একজন ক্যান্সার রোগী আরেকজন ক্যান্সার রোগীকে বিয়ে করতে পারবে না, এমন তো কোন কথা নেই। অপর্ণা আর অভিজিৎবাবু তো তার কাছে রাজযোটক।

ডাঃ চৌধুরী অপর্ণার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন। অপর্ণাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও, তোমরা সুখী হবে।

অপর্ণা ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে এক অপূর্ব মানসিক সান্ত্বনা নিয়ে বেরিয়ে এলো। বাড়িতে পৌঁছেই অভিজিৎবাবুকে ফোন করে তার সাথে তাড়াতাড়ি দেখা করতে বললো। অভিজিৎবাবু টেলিফোন পেয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সন্ধে হতেই ছুটে এলেন অপর্ণার বাড়িতে। মনে তার ভীষণ উৎকণ্ঠা, অপর্ণা না জানি কী খবর দেয়? অপর্ণা সব চিন্তা, সব উৎকণ্ঠার সমাধান করে দিয়ে বললো. আমি আপনার প্রস্তাব পেয়ে অনেক চিন্তা করেছি। বাবাকে ও ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছি। তাঁদের সম্মতি পেয়েছি, সুতরাং আমার আর বলার কিছু নেই। তবে বিয়েটা কোর্টে রেজিস্ট্রি করে হওয়াটাই ভাল। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন।

অভিজিৎবাবুও ব্যাপারটা আগেই চিন্তা করে রেখেছিলেন। রেজিস্ট্রি করেই তিনি বিয়ে করবেন। অপর্ণার সম্মতি পেয়ে তিনি আজ ভীষণ খুশি। তার হতাশ জীবন শেষ হওয়ার এক সুস্পষ্ট হাতছানি এবং অন্ধকার শেষের এক আলোর রোশনাই তার মনটাকে ভরে তুলল। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে খুশি হবে।

অভিজিৎবাবুর বিধবা মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। তিনি এক কথায় এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। ছেলেটার অসুখের কথা, সংসারের প্রতি তার অনীহা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আজ তিনি ভীষণ খুশি, অভিজিৎ সংসার করতে রাজি হয়েছে জেনে। অপর্ণা আর অভিজিৎবাবুর বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ে উপলক্ষ্যে কোন অনুষ্ঠান করার পক্ষে ছিল না অপর্ণা। মিছিমিছি এসব ঝামেলা করার কোন অর্থ নেই। অভিজিৎবাবুর ইচ্ছে একটা ছোট অনুষ্ঠান করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপারটা জানানো দরকার। গুরুজনদের আশীর্বাদ নেয়ারও তো দরকার।

অপর্ণা অভিজিৎবাবুরও এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

অপর্ণা ও অভিজিৎবাবু এখন সংসারী হয়েছে। অপর্ণা আস্তে আস্তে ঘরটাকে সাজিয়ে নিয়েছে। পরিপূর্ণ গৃহিনীর মত সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করে, সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই খুব আনন্দিত।

অপর্ণা একদিন অভিজিৎবাবুকে জিগ্যেস করে, যদি তাদের কোনদিন ছেলেমেয়ে হওয়ার

সম্ভাবনা হয় তখন তারা কী করবে? সুতরাং আগে থেকে বুঝে সুঝে যেন পদক্ষেপ নেয়া হয়। অভিজিৎবাবু অপর্ণাকে বললেন, এ ব্যাপার তো আগেই ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করা দরকার। তিনি যদি সায় দেন তাহলে তো আর চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

অপর্ণার খুঁতখুঁতে মন কোনমতেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। তাই আগে থেকেই সে সাবধান—যাতে কোন সন্তান না আসে। আবার এও চিন্তা করে, কোন সন্তান যদি না আসে তবে তাদের বিয়ের সার্থকতা কোথায়।

অভিজিৎবাবু বুঝতে পারলেন অপর্ণার মনের কথা। তিনিই একদিন অপর্ণাকে বললেন, এখানেও তো ক্যান্সার হাসপাতাল আছে, চলো না, তাদের সাথে এ ব্যাপারে একটু পরামর্শ করি। তারা তো আমাদের সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

অপর্ণা ও অভিজিৎবাবু একদিন ক্যান্সার হাসপাতালে গিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দেববর্মার সাথে আলাপ করলেন এবং তাঁর মতামতও জানতে চাইলেন। ডাক্তারবাবু তাদের সব কথা শুনলেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোও মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। অপর্ণা ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করলো, তাদের কোন সন্তান হলে তার ক্যান্সার হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। ডাক্তার দেববর্মা হেসে উত্তর দিলেন, ক্যান্সার ছোঁয়াচে রোগ নয়, সুতরাং এর কোন সম্ভাবনা নেই।

অপর্ণা ও অভিজিৎবাবু আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলো। এখন আর তাদের দুশ্চিন্তা করার কোন কিছু নেই। সন্তান ধারণ করতে অপর্ণার কোন অসুবিধে নেই।

বিয়ের প্রায় আট মাস হয়েছে। অপর্ণা হঠাৎ তার শরীরের কিছু পরিবর্তন অনুভব করে। বিষয়টা অভিজিৎবাবুকে জানায়। অভিজিৎবাবু দেরি না করে অপর্ণাকে একজন স্ত্রীলোক—বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখান। পরীক্ষায় ধরা পড়ে অপর্ণা সন্তান সম্ভবা।

অপর্ণা আর অভিজিৎবাবু আজ বেজায় খুশি। তাদের হতাশাময় জীবনের অন্ধকার শেষ হয়ে এক নতুন আলোর প্রভাতের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। এই নবজাতকই তো হবে তাদের দু'জনের অবলম্বন।

ডোডোর গল্প

মোমাইর অনেক দিনের সখ একটা ময়না পুষবে। তার বন্ধু গুঞ্জনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানেই প্রথম সে ময়না দেখেছে। এত সুন্দর কথা বলে দেখে মোমাইর খুব ভালো লেগেছে। তার ভীষণ ইচ্ছে সেও একটা ময়না পুষবে। মোমাইর বাবা বিভিন্ন জায়গায় যান সরকারি কাজে। পাহাড়ি অঞ্চলেও যেতে হয় মাঝে মাঝে। এবারও এমন একটা প্রোগ্রাম হয়েছে বাইরে যাওয়ার। মোমাই বায়না ধরেছে তার জন্যে একটা ময়নার বাচ্চা আনতেই হবে। সে শুনেছে পাহাড়ি অঞ্চলে ময়নার বাচ্চা ধরে অনেকেই বিক্রি করেন।

কাজ সেরে ফেরার সময় মোমাইর বাবা দেখেন একটা ছেলে হাতে করে কী যেন নিয়ে যাচ্ছে? গাড়িটা তার পাশাপাশি হতেই দেখেন, ছেলেটার হাতে একটা ময়নার বাচ্চা। মোমাইর বাবার কৌতূহল হলো, জিগ্যেস করলেন, ময়নাটা বিক্রি করবে? ছেলেটা বলল, হ্যাঁ, করব। দুইশত টাকা দিতে হবে। রাজি হয়ে গেলেন মোমাইর বাবা। দুইশত টাকায় কিনে নিলেন ময়নার বাচ্চাটাকে।

মোমাইর বাবার মনটা আজ ভীষণ খুশি। মোমাইর এতদিনের অব্দারটা আজ রাখতে পারলেন বলে। ময়নার বাচ্চাটা কিনে কোথাও থামলেন না। সোজা বাড়ি চলে এলেন। বারবারই মোমাইর কথা-মনে হচ্ছিল। ময়নার বাচ্চাটাকে দেখে মোমাইর কী আনন্দ যে হবে! সেটাই ভাবছিলেন।

বাড়িতে ঢুকেই মোমাইকে ডাকলেন, দেখ তোমার জন্য কী নিয়ে এসেছি? বাবা ফিরে এসেছেন এবং তাকে ডাকছেন শুনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে দৌড়ে এলো বাবার কাছে। হাতে ময়নার বাচ্চা দেখে সে আনন্দে আত্মহারা। বাবার দিকে তাকিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে, বাবা তুমি খুব ভালো।

বাবার হাত থেকে খাঁচাটা নিজের হাতে নিয়ে দৌড়ে গেলো মার কাছে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দেখ মা, বাবা আমার জন্যে কী সুন্দর ময়নার বাচ্চা নিয়ে এসেছে। মোমাই আরও বলতে থাকে, এখন থেকে বাড়িতে আমার একজন বন্ধু হলো। আমি তার সাথে খেলব। আমি তার সাথে গল্প করব, আর সময়টাও আমার ভালো কাটবে। একা একা আর থাকতে হবে না।

তারপর মাকে প্রশ্ন করে, মা, ময়না কী খায়? আজ সমস্ত দিনই তো কিছু খায়নি। তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দাও মা। মা ঘর থেকে একটি কলা ও একটু জল এনে খাঁচার মধ্যে দিলেন। মোমাই খাঁচার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ময়না কিছু খায় কিনা এবং কিভাবে খায় দেখার জন্যে। ময়না কিছু খাচ্ছে না দেখে মোমাই হতাশ হয়ে পড়ে। তাকে বোঝাতে থাকে, ময়নাসোনা খাও, কলা খাও, জল খাও। মা তো তোমাকে এই খাবার দিয়েছে। এখন থেকে এটাই তো তোমার বাড়ি, আর তুমি আমার বন্ধু। অনেক সাধাসাধির পরও কিছু খাচ্ছে না দেখে মোমাইর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো।

মা'র কাছে গিয়ে বলল, মা, ময়না কিছু খাচ্ছে না। চলো না তুমি, একটু বলবে, তাহলে হয়তো খেয়ে ফেলবে। মা মোমাইকে বোঝালেন এইমাত্র তো একটা নতুন পরিবেশে এসেছে, মা-বাবা ছাড়া কোনদিন থাকেনি, তাই মনটা হয়তো ওর খারাপ লাগছে। চিন্তা করো না, আস্তে আস্তে খেতে শুরু করবে।

মোমাই নাছোড়বান্দা মাকে যেতেই হবে, ময়নাকে বলতে হবে খাওয়ার জন্যে। তাহলেই হয়তো ময়না খাবে। মোমাই মাকে হাতে ধরে ময়নার খাঁচার কাছে নিয়ে এলো। মাও বোঝান ময়নাকে। খেয়ে নিতে বললো বারবার না খেলে তো শরীর খারাপ হবে। মোমাইর দৃঢ় বিশ্বাস দু'জনের অনুরোধ ময়না রাখবেই। আরও বিশ্বাস ময়না তো কথা বলতে পারে তাই নিশ্চয়ই তাদের কথাও বুঝতে পেরেছে।

মোমাই ছটফট করছে, কেন ময়না খাচ্ছে না। ঘন্টা খানেক পর হঠাৎ মোমাই'র নজরে পড়লো খাঁচায় রাখা জল ও কলার দিকে। ময়না প্রথম একটু জল খেলো, তারপর ঠুকরে ঠুকরে কলার কিছু আঁশও খেয়ে নিল। অপলক দৃষ্টিতে মোমাই দাঁড়িয়ে সব দেখলো। মোমাই এক দৌড়ে মা'র কাছে গিয়ে খবর দিলো, ময়না খেতে শুরু করেছে মা! মোমাইর কী আনন্দ! ময়না তাহলে তার সাথে থাকবে, তার সাথে কথা বলবে, আর খাওয়া দাওয়াও করবে।

মোমাইর নজরে পড়লো ময়নার খাঁচাটা একদম ছোট্ট। এই খাঁচায় ময়নার ভীষণ কষ্ট হবে। তাই সে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে আজই একটি সুন্দর বড় খাঁচা কিনে আনার জন্য বলল। মোমাইর এত আনন্দ দেখে বাবা তাকে আশ্বস্ত করলো, আজই একটি সুন্দর খাঁচা নিয়ে আসবে ময়নার জন্যে।

নতুন খাঁচা দেখে মোমাই বেজায় খুশি। এই খাঁচাতে তো ময়নার কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। খাঁচাটা ভাল করে ঝেড়ে মুছে জলের বাটিতে একটু জল এবং বাকি বাটিগুলোতে ছোলা, কলা ও মটর দিয়ে পাখিটাকে নতুন খাঁচায় নিয়ে যাওয়া হলো। মোমাই মাকে সাবধান করে দিয়েছিল খাঁচা বদালানোর সময় ময়না যেন ব্যথা না পায়। মাও হেসে বলেছিলো, না ব্যথা—পাবে না। আমি খুব যত্ন করেই ওকে নতুন খাঁচায় নিয়ে যাব।

মোমাই বেজায় খুশি। ময়নাটা লাফালাফি করে খাবার খায়, জলও খায়। মাঝে মাঝে অদ্ভুদ অদ্ভুদ আওয়াজও করে।

এবার মোমাইর মনে হলো ময়নাটার তো একটা নাম দিতে হবে। কী বলে যে ওকে ডাকবে? অনেক নামই তো তার মনে আসছে —ময়না, সোনা, পাখি, আরও কত কী! কোনটাই তো তার পছন্দ হচ্ছে না, মা'র কাছে গেলো মোমাই। বলল, মা আমার ময়নার একটা সুন্দর নাম রাখ না! মাও ছেলে মিলে অনেক নামই পছন্দ করলো , কিন্তু কোনটাই মন মত হল না। এবার মোমাই বাবার শরণাপন্ন হল, আমার ময়নার একটা নাম রাখ বাবা, এই বলে মিনতি করতে লাগল। বাবা অনেক চিন্তা করে ওর নাম রাখলো ' ডোডো'। ময়নাটা এরপর ডোডো নামেই পরিচিত হয়ে গেলো। মোমাই ও ডোডোর মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। ঘুম থেকে উঠেই মোমাই ডোডোর খাঁচার পাশে দাঁড়ায়। বলে, সুপ্রভাত।

ডোডোও বলে, সুপ্রভাত।

ডোডো এরমধ্যেই অনেক কথা শিখেছে, গান শিখে গেছে, শিষ দিতেও শিখেছে। বাড়িতে কেউ আসলে ডাকে, মোমাই, অতিথি এসেছেন, বসতে দাও। মোমাইরও খুব আনন্দ, ডোডো এখন মানুষের মত কথা বলতে পারে। স্কুলে যাওয়ার আগে মোমাই ডোডোকে বলে যায়, আমি স্কুলে যাচ্ছি, তুমি ভালো করে থেকো, খাওয়া দাওয়া করো। মোমাইর মনটা পড়ে থাকে বাড়িতে, ডোডোর কাছে। স্কুল ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি স্কুলবাসে চাপে। অধীর অপেক্ষায় থাকে কখন বাসটা তার বাড়ির সামনের স্টপে এসে থামবে। গাড়ি থেকে নেমেই মোমাই দৌড়ে আসে বাড়িতে। স্কুল ড্রেস নিয়েই ডোডোর সামনে দাঁড়িয়ে ওর সাথে কথা বলে। খাওয়া দাওয়া ভুলে দু'জনেই কথা বলে, গল্প করে।

মোমাই ও ডোডোর বন্ধুত্ব দেখে মা-বাবার খুব আনন্দ। এতদিনে একটা খেলার সাথি হয়েছে। আর সময়টাও তার ভালো কাটছে।

প্রায় ছয় মাস এরকম চললো। একদিন মোমাই দেখে ডোডো খাওয়া দাওয়া কম করেছে। মোমাইর ভীষণ চিন্তা হলো, ডোডো খাচ্ছে না কেন, মাকে গিয়ে ঘটনাটা জানালো। মা এসে দেখলেন ডোডো খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। মা ভাবলেন, শরীরটা হয়তো আজ ঠিক লাগছে না তাই খাওয়া দাওয়া কম করেছে। মোমাইর দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। কী হলো ডোডোর, কেন খাচ্ছে না? তবে কোন মারাত্মক অসুখ হলো নাকি? মা বুঝলেন, মোমাইকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, কালই ডোডো সুস্থ হয়ে যাবে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই মোমাই এসে ডোডোর খাঁচার পাশে দাঁড়ালো। ডোডোকে দেখে মনে হলো রাত্রে ঘুমোয়নি। কেমন যেন অসহায়ের মত খাঁচার কোণে চুপ করে বসে আছে। মোমাইকে দেখে কোন শব্দও করলো না। মোমাইর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেলো। দৌড়ে গেল মায়ের কাছে। মাকে বলল, আমার ডোডোর কী হয়েছে দেখো? তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা কর মা, যাতে ডোডো এক্ষুনি সুস্থ হয়ে ওঠে। মা কী করবেন ভেবে পান না। হঠাৎ মনে পড়লো মোমাইর একজন সম্পর্কিত কাকার কথা। পশুচিকিৎসক এবং তিনি একটি সরকারি হাসপাতালে চাকুরিও করেন। তাকে টেলিফোন করলেন, তাড়াতাড়ি আসার জন্যে।

মোমাইর কাকা এসে ডোডোকে পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন, ডোডোর জ্বর হয়েছে। এরকম ময়নাদের হয়। ওষুধ খেলেই কমে যাবে। মোমাইর কাকা ডোডোর জন্য কিছু ওষুধ দিয়ে গেলেন, বললেন, এই ওষুধ খাওয়ালেই সুস্থ হয়ে যাবে।

মোমাই খুব খুশি, ডোডো ওষুধ খেলেই সুস্থ হয়ে যাবে। মাকে বলল, তাড়াতাড়ি ওষুধ খাওয়াও মা, ডোডো তাহলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। মাও ডোডোকে খুব ভালবাসে। তাই আর কালবিলম্ব না করে ওষুধগুলো ডোডোকে খাওয়াতে গেলো। কোনমতেই ওষুধ খেতে চায় না ডোডো। প্রায় জোর করেই ওষুধগুলি খাওয়ানো হলো।

কিছুক্ষণ পর ওষুধগুলি বমি করে ফেলে দিল ডোডো। খাবারও কিছু খেলো না। আরও যেন কাহিল হয়ে গেলো। মোমাইর মনটা ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কী অসুখ হলো ডোডোর?

কোন কিছুই খাচ্ছে না কেন? ডাক্তারকাকাকে মোমাই টেলিফোন করলো। তার ডোডোর শরীর আরও খারাপ হয়ে গেছে, একবার এসে দেখে যাওয়ার জন্য বললো মোমাই। মাকে বলল, সে আজ স্কুলে যাবে না, সমস্ত দিনই ডোডোর সাথে থাকবে।

বিকেল বেলা ডোডোর শরীর আরও খারাপ হয়ে গেলো। বসে বসে শুধু ঝিমোচ্ছিল। মোমাই মাকে আবার ডাকলো। মা এসে দেখলেন ডোডোর জ্বর আরও বেড়ে গেছে। জ্বরটা কমে যাবে ভেবে গায়ে একটু জল ঝাপটা দিলেন।

কিছুতেই কিছু হল না। আরও কাহিল হয়ে গেলো ডোডো। মা ভাবলো, হাতে ধরে ডোডোকে একটু আদর করবে। গায়ে হাত দিতেই মায়ের আঙ্গুলে ভীষণ জোরে একটা কামড় দিয়ে নিচে পড়ে গেলো ডোডো। মা ব্যথা পেয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে আসল।

নিচে পড়ে ডোডো ছট্‌ফট্ করতে থাকলো। মোমাই পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মোমাই। মা আমার ডোডো আর বাঁচবে না! কেন এমন করছে? মা কিছু বললো না, ছেলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলো আর ডোডোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

ছট্‌ফট্ করতে করতে ডোডো হঠাৎ একদম শান্ত, হয়ে গেল। জোরে জোরে কেঁদে উঠল মোমাই। আমার ডোডো নড়ছে না কেন মা? বোল না, আমার দোডো নড়ছে না কেন? তবে কি আমার ডোডো আর নেই? মা মোমাইকে অনেক বোঝালো, কাঁদিস নে বাবা, তুই তো ওকে অনেক ভালোবাসতি। আমরাও ওকে খুব ভালো বাসতাম। কী করব, ওর তো আয়ু নেই। তাই তো ও বাঁচলো না।

কোনভাবেই মোমাইকে বোঝানো গেল না। সমস্ত রাত মোমাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদল, খেল না ঘুমাল না সমস্ত রাত।

ভোর হতেই মা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। মোমাইকে আবার বোঝালো, ডোডো যতদিন বাঁচার ছিল ততদিন বেঁচেছে। এর চেয়ে বেশিদিন বাঁচার জন্য তো ও পৃথিবীতে আসেনি।

মোমাই প্রশ্ন করে, তবে কি ডোডোকে খাঁচায় ধরে রেখেছি বলে রাগ করে কিছু না খেয়ে এভাবে চলে গেল?

মা বললো, না, ওর যতদিন বাঁচার ছিল ততদিনই বেঁচেছে। তুমি কেন অযথা মন খারাপ করছো। আরও বললো, আমরা কি ডোডোকে ছেড়ে দিতাম। ও উড়তে পারতো না ঠিক মতো। মাটিতে পড়লে বিড়াল অথবা কুকুর খেয়ে নিতো।

গাছে বসে উড়তে না পারলে অন্য পাখিরা খেয়ে নিত। সেটা কি ভালো হত? ডোডো তো কোন খারাপ কাজ করেনি কোনদিন। তাই সে পরজন্মে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

পরজন্মে ডোডো মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে শুনে মোমাইর মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এলো। এক প্রচন্ড প্রশস্তিতে ভরে গেল তার মন। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেলো। মাকে বললো, একটা ছোট বাক্স দাও মা, আমার ডোডোকে কফিনে শুইয়ে দিই যাতে ওর আত্মার শান্তি হয়।

একটা বাক্সের ভেতর বিছানা করে ডোডোকে শুইয়ে দিল। মোমাই কিছু ফুল আর আতর দিয়ে বাক্সটাকে বেঁধে দিল। ওপরে আরও দু'টো গোলাপ দিয়ে সাজিয়ে দিল কফিন। মাকে বললো, পাশের মাঠের উত্তর কোণে গর্ত খুঁড়ে ডোডোকে রেখে আসি মা। ওখানেই ও শান্তিতে শুয়ে থাকুক।

রাধারানি

রাধারানি স্বপ্ন দেখেছে। গতকাল রাতেই সে স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখে তার অনেক দিনের অশান্তি লাঘব হয়েছে। সে শান্তি পেয়েছে।

অসুখে ভুগে ভুগে সে তিক্ত বিরক্ত। প্রায় তিন বছর ধরে ভুগছে বিভিন্ন অসুখে। হাতুড়ে চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে ডাক্তারি-চিকিৎসা, কবচ-তাবিজ থেকে জলপড়া, নুনপাড়া, উপরি লাগার চিকিৎসা, কোন কিছুই বাদ দেয়নি। কিন্তু কিছুতেই তার কিছু হয়নি। সে সুস্থ হয়নি।

মাঝে মাঝে তার মনটা হতাশায় ভয়ে উঠতো। ভাবতো কোন দিনই সে আর ভালো হবে না। এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

রাধারানি খুব ধর্মপ্রাণ মহিলা। সকালে ঠাকুরের ভোগ না দিয়ে জল গ্রহণও করে না। ঠাকুরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। একদিন ঠাকুর সুপ্রসন্ন হবেনই এবং তাকে সুস্থ করে তুলবেনই। তাই কষ্ট হলেও সে তার নিয়মিত ঠাকুর সেবার কোন ত্রুটি করে না।

রাধারানি স্বপ্ন দেখেছে, একজন ফর্সা, লম্বা লোক এসে তাকে বলছেন, রাধারানি, তুই অসুখে ভুগছিস অনেক দিন ধরে। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। তুই ভালো হয়ে যাবি। ভালো চিকিৎসা করা, এই বলে একজন চিকিৎসকের নামও বলে গেলেন তাকে।

ঘুম ভেঙে গেল রাধারানির। স্বপ্ন দেখা লোকটাকে আর পাওয়া গেল না। স্বপ্ন দেখে রাধারানির মনের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। মনের জোর বেড়ে গেল অনেক গুণ। স্থির করল, রাত-প্রভাত হলেই সে যাবে ঐ ডাক্তারবাবুর কাছে, যাকে দিয়ে চিকিৎসার জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছে সে।

ভোর হতেই তার স্বপ্নের কথা বাড়ির সবাইকে জানালো এবং ঐ দিনই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার এবং চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্তও নিল। রাধারানি আর তার স্বামী ডাক্তারবাবুর চেম্বার গিয়ে একটি টোকেন নিয়ে বসলো। প্রায় আধা ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো। তারপরই তার ডাক পড়লো।

রাধারানি আর তার স্বামী ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকলো। ডাক্তারবাবু সামনের চেয়ারটিতে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। রাধারানি চেয়ারটিতে বসে ডাক্তারবাবুকে বললো, স্যার, আপনার

একটু সময় নেবো আমি। অসুখ ছাড়াও আমার একটা কথা বলার আছে। যদি অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি।

ডাক্তারবাবু ভাবলেন, অসুখ ছাড়া কী বলবে? যাই বলুক শোনা যাক না। ডাক্তারবাবু রাধারানিকে বললেন, বলুন আপনার কী বলার?

রাধারানি শুরু করে, আমি অনেকদিন ধরে বিভিন্ন অসুখে ভুগছি। একদম হতাশ হয়ে গেছি। আর বোধ হয় ভালো হবে না। মনটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। জীবনের প্রতি ধিক্কার এসে গেছে। কালরাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে একজন ফর্সা, লম্বা, সুপরুষ দেখতে ঠাকুরের মত আমাকে বললেন, আমি ভালো হয়ে যাবো। আপনার কাছে এসে চিকিৎসা করানোর জন্যও বললেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আমি আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছি। আমার মনের জোর অনেক গুণ বেড়ে গেছে। তাই আর দেরি করিনি। আজই আপনার কাছে চলে এসেছি। এখন আপনি আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিন। আমার বিশ্বাস, আমি আপনার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবো।

রাধারানির কথা শুনে ডাক্তারবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তো কোন স্বপ্ন দেখেন নি তাকে চিকিৎসা করার জন্য, কী ওষুধ দেবেন তারও তো কোন স্বপ্ন দেখেননি তিনি। তবে কী করবেন? রাধারানির চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন কিনা!

ডাক্তারবাবু চিন্তায় পড়ে গেছেন দেখে রাধারানি প্রশ্ন করে, কী চিন্তা করছেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি তো স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চিকিৎসার জন্যে আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু, আমি তো স্বপ্নে কোন ওষুধ পাইনি যা দিয়ে আপনাকে চিকিৎসা করব।

রাধারানিই তার সমাধান করলো, বললো, ডাক্তারবাবু আপনি তো রোগ বুঝে আপনার মতই চিকিৎসা করবেন। আপনার তো স্বপ্নে ওষুধ পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। রাধারানির কথা শুনে ডাক্তারবাবুর ভরসা হলো। রাধারানির কাছ থেকে তার রোগের সমস্ত বিবরণ শুনে নিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন রাধারানিকে। পরীক্ষা শেষে ডাক্তারবাবু রাধারানির স্বামীকে বললেন, ওর রোগটা একটু জটিল। অনেক দিন ধরে ভুগছে। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করেই চিকিৎসা করতে হবে।

এক কথায় রাজি হয়ে গেলো রাধারানি আর তার স্বামী। হাসপাতালে ভর্তি হয়েই তারা চিকিৎসা করবে। ডাক্তারবাবু যেরকম ভালো মনে করে সেরকমই তারা করবে।

রাধারানির শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সাংঘাতিক রক্তশূন্যতায় ভুগছিল। সেই সঙ্গে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গও রোগে জর্জরিত। কিন্তু চিকিৎসায় খুব ভাল সাড়া দিচ্ছিল রাধারানি। বিভিন্ন ওষুধের সাথে দুই বোতল রক্তও দিতে হয়েছে। বার দিন ভর্তি ছিল হাসপাতালে। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। রাধারানি খুব খুশি তার আর কোন অসুস্থতা এখন নেই। মনের জোর বেড়ে গেছে অনেক অনেক গুণ। হাসপাতালের কর্মীদের প্রতি তার এক অগাধ ভালোবাসা জন্মে গেছে। ডাক্তারবাবুর প্রতি তার বিশ্বাস, তার শ্রদ্ধা আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে। তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সে সুস্থ হয়ে আরও অনেকদিন

বাঁচবে বলে তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় রাধারানি ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করে বলল, আপনি তো আমার জন্যে এত করলেন, আমি তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারি। আপনার ঋণ কোনদিনই শোধ করতে পারব না।

এরপর থেকে রাধারানি প্রতিবৎসর নববর্ষের দিন ও বিজয়া-দশমীর দিন ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করতে আসে। বাড়িতে ফল, মূল ও শাকসব্জী প্রথম যাই ফলে ডাক্তারবাবুকে না দিয়ে সে গ্রহণ করে না। এতেই রাধারানির মনের শান্তি আর আনন্দ।

অবিশ্বাস

হকচকিয়ে গেলেন সুবিনয়বাবু। সুনন্দাদেবীর অবস্থা দেখে একদম ঘাবড়ে গেলেন। ঘাবড়ে না যাওয়ার তো কোন কারণ নেই। কোনদিন তো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি তিনি।

সুনন্দা দেবী নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। প্রথম তিনমাস একটু অসুস্থ ছিলেন, তারপর থেকে তো ভালোই ছিলেন।

হঠাৎ করে প্রচণ্ড রক্তস্রাব দেখে সুনন্দাদেবী ভয় পেয়ে গেছেন। সুবিনয়বাবু ও বাড়ির লোক আরও ঘাবড়ে গেছেন।

সুনন্দাদেবীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে জল ঝাপটা দিলেন সুবিনয়বাবু। বাড়ির লোক একজনকে পাশে বসিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন অ্যাম্বুলেন্সের খোঁজে। সুনন্দা দেবীকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতে হবে তাড়াতাড়ি।

একটা ব্যাপার সুবিনয়বাবুর মনটাকে খুব উদ্বিগ্ন করে দিচ্ছিল। তার প্রথম সন্তান জন্মের সাথে সাথেই মারা যায়। ভালো করে শ্বাস নিতে পারেনি বলে। এবারও কি এরকম কিছু হবে! বারবারই তার এই কথা মনে পড়ছিল। এবার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোন রকম ত্রুটি যাতে না হয়। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন সুনন্দাদেবীকে।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারের সামনেই থামালেন অ্যাম্বুলেন্সটা। রোগীকে গাড়িতে রেখে হন হন করে সুবিনয়বাবু ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকলেন। সুনন্দাদেবীর অসুস্থতার কথা তাঁকে জানালেন এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন।

ডাক্তারবাবু রোগীকে গাড়ি থেকে না নামানোর জন্য বললেন। অ্যাম্বুলেন্সেই ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করলেন। জরুরি ভিত্তিক কিছু ওষুধ ও ইঞ্জেকশন গাড়িতেই প্রয়োগ করে বললেন, এক্ষুণি একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করতে হবে।

সুবিনয়বাবু আলট্রাসনোগ্রাফি ইউনিটের ডাক্তারবাবুর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে

সুনন্দা দেবীকে নিয়ে গেলেন আলট্রাসনোগ্রাফি ইউনিটে।

যথাসময়ে সুনন্দাদেবীর আলট্রাসনোগ্রাফি হয়ে গেলো। ডাক্তারবাবু সুবিনয়বাবুর হাতে রিপোর্টটি দিয়ে বললেন, সুনন্দাদেবীর প্লেসেন্টা (ফুল) সঠিক জায়গায় নেই, একটু নিচের দিকে আছে। তাই এই রকম রক্তপাত হচ্ছে।

রিপোর্ট পেয়ে সুবিনয়বাবুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। তবে কি এই বাচ্চাটাকেও বাঁচানো যাবে না? নানা কথা, নানা চিন্তা মনটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। সুনন্দাকে কী বলবেন? কীভাবে তাকে সামলাবেন, কীভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবেন।

আস্তে আস্তে সুবিনয়বাবু মনটাকে শক্ত করে নিলেন, এভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না! তাকে তো আরও কঠিন হতে হবে। না হলে সুনন্দাদেবীকে সামলাবে কে? মুহূর্তের মধ্যে মনটাকে একদম স্বাভাবিক করে নিলেন এবং সুনন্দাদেবীকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর চেম্বারের দিকে রওনা হলেন। রাস্তায় সুনন্দা দেবী রিপোর্টটির কথা জিগ্যেস করলেন, কী পাওয়া গেলো সনোগ্রাফিতে?

সুবিনয়বাবু বললেন, না তেমন কিছু নয়, ওষুধ ব্যবহার করলেই সেরে যাবে।

রিপোর্ট নিয়ে সুবিনয়বাবু ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকলেন। রিপোর্টটা এগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবুর হাতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিপোর্টটা দেখলেন ডাক্তারবাবু। কিছুক্ষণ একটু গম্ভীর হয়ে থাকলেন, কিছু চিন্তা করলেন, তারপর সুবিনয়বাবুকে আলট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্টটার কথা বুঝিয়ে বললেন। আরও বললেন, প্লেসেন্টা (ফুল) বাচ্চার সামনের দিকে আছে, তাই এই রক্তপাত। এতদিন কোন রক্তপাত হয়নি সেটাই ভাগ্য। সুবিনয়বাবুকে বললেন, চিন্তা করবেন না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই রকম জটিলতা পেয়ে থাকি। স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব এই সব ক্ষেত্রে হয় না। সিজারিয়ান সেকশন (Caesarian Section) অপারেশন করেই এইসব সন্তান প্রসব করাতে হয়। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আরও বললেন, আপনি ভেঙে পড়বেন না, রোগীকে তো আপনাকেই সামলাতে হবে, মনটাকে আরও শক্ত করা দরকার।

সুবিনয়বাবু চুপ করে ডাক্তারবাবুর কথা শুনছিলেন। এবার নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করলেন, রোগী বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু।? আমার অতীতটা তো খুব ভালো নয়। প্রথম শিশুটিকে আমি জন্মের পরই হারিয়েছি। এবারও কি একই অবস্থা হবে?

ডাক্তারবাবু সুবিনয়বাবুকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, মা ও বাচ্চা দুজনেই বাঁচবে। তবে স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব হবে না। সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন করেই বাচ্চা প্রসব করাতে হবে। ডাক্তারবাবু আরও বললেন, দুই বোতল রক্ত দিতে হবে। রোগী একটু সুস্থ হলেই অপারেশন করব। রোগীকে এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে বলে একটা ভর্তির কাগজ সুবিনয়বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, এই কাগজটা হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে দিলে উনি চিকিৎসা শুরু করে দেবেন। আমি পরে এসে বাকি ব্যবস্থা করব।

দুই দিন পর সুনন্দা দেবীর শারীরিক অবস্থার কিছু উন্নতি হলো। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। শরীরটাও আগের চেয়ে ভালো।

ডাক্তারবাবু সুনন্দাদেবীকে পরীক্ষা করলেন। সুনন্দাদেবীর শরীরের অবস্থা দেখে সুবিনয়বাবুকে ডেকে বললেন, এখন শরীরটা একটু ভালো, এই সুযোগে অপারেশন করে নিতে হবে।

সুবিনয়বাবু ডাক্তারবাবুকে বললেন, বাচ্চার অবস্থা কেমন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, ভালো আছে। বাচ্চার ওজনও মোটামুটি ভালোই আছে, এখন অপারেশন করলে কোন অসুবিধে হবে না। কোন চিন্তা কববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে, বাচ্চাও সময় মতো কাঁদবে।

সুবিনয়বাবু ডাক্তারবাবুকে বললেন, আমি আপনাব কথা সব বুঝেছি ডাক্তারবাবু, কিন্তু আমি তো সুনন্দাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, বাচ্চাটা বেঁচে আছে। তার মনে একটা বদ্ধধারণা হয়ে গেছে যে, এত রক্তপাতের পর কোন বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে না এবং বারবার একই কথা বলছেন। আপনি দয়া করে সুনন্দাকে বোঝান, ডাক্তারবাবু। ওর চিন্তাধারার পরিবর্তন করাতে হবে, না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু সুবিনযবাবুকে অভয় দিলেন, তিনিই সুনন্দা দেবীকে বোঝাবেন।

ডাক্তারবাবু সুনন্দা দেবীকে দেখতে গেলেন। পরীক্ষা করে বললেন, আপনার তো অপারেশন করতে হবে, আর বেশি দেরি করা যাবে না। আপনি রাজি তো? বলে সুনন্দা দেবীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

সুনন্দাদেবী ডাক্তারবাবুকে বললেন, আপনাবা যা ভালো মনে কবেন তাই করুন। আরও বললেন, কী হবে এই সব করে, বাচ্চা তো আর বেঁচে নেই।

ডাক্তারবাবু সুনন্দা দেবীকে বোঝালেন, বাচ্চা ভালো আছে। সনোগ্রাফির রিপোর্টও আমার পরীক্ষায় বাচ্চা যে খুব ভালো আছে দেখেছি। আপনি চিন্তা করবেন না। সুনন্দা দেবী একটু হাসলেন। বললেন, আপনারা যতই বলেন, আমার কিন্তু একদম বিশ্বাস হচ্ছে না বাচ্চা বেঁচে আছে বলে।

ডাক্তারবাবু আরও বোঝালেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি অপারেশনের পর আপনাকে একটা সুস্থ সুন্দর শিশু উপহার দেবো। সুনন্দাদেবী কিছুই বললেন না, চুপ করে সব শুনলেন।

অপারেশনের সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেছে। সুনন্দা দেবীকে অপারেশনের টেবিলে তুলে ডাক্তারবাবু আবার অভয় দিলেন, একটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা তার হাতে তুলে দেবেন বলে।

অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। সুনন্দাদেবী ভালো আছেন। মেয়ে হয়েছে সুনন্দাদেবীর। ডাক্তারবাবু বাচ্চাটাকে সুনন্দাদেবীর খাটের পাশের একটি বেবীখাটে শুইয়ে রাখতে সিস্টারকে বললেন। যাতে জ্ঞান ফিরতেই সুনন্দা দেবী বাচ্চাটাকে দেখতে পান। তাই করলেন সিস্টার।

সুনন্দাদেবীর জ্ঞান ফিরেছে। ভালোই আছেন। সিস্টার এসে সুনন্দাদেবীকে বললেন, দিদি দেখুন, আপনার মেয়ে হয়েছে। কাছে নিন, একটু বুকের দুধ খাওয়ান।

সুনন্দা দেবী অবাক হয়ে সিস্টারের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, এ বাচ্চা আমার নয়, অন্য কারোর বাচ্চা এনে আমার বিছানায় রেখে দিয়েছেন! আমার সন্তান এত রক্তপাতের

পর বেঁচে থাকতে পারে না। নিয়ে যান, আমার কাছ থেকে একে সরিয়ে নিয়ে যান।

সিস্টার বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে রাখলেন ওর খাটে। সমস্ত বিষয়টা সিস্টার ডাক্তারবাবুকে জানালেন।

ডাক্তারবাবু সুনন্দাদেবীকে দেখতে আসলেন। বললেন, কেমন আছেন?

সুনন্দাদেবী ভাঙা গলায় উত্তর দিলেন, ভালো। ডাক্তারবাবু বললেন, দেখলেন তো, যা বলেছিলাম। কী ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে আপনার। পাশে নিন। বুকের দুধ খাওয়ান, তাহলেই দুধ তাড়াতাড়ি আসবে।

সুনন্দাদেবী ডাক্তারবাবুর দিকে তাকালেন অবাক হয়ে! তার অবিশ্বাস, এই বাচ্চা তার নয়। হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, এই বাচ্চা আমার নয় ডাক্তারবাবু। একে আমার বিছানা থেকে নিয়ে যান। যার বাচ্চা তাকে দিয়ে দিন, বলে রাগ করে তাকালেন ডাক্তারবাবুর দিকে।

ডাক্তারবাবু সুবিনয়বাবুকে ডাকলেন, সুনন্দাদেবীর মনের অবস্থা এবং তার থেকে মুক্তি পেতে গেলে সুবিনয়বাবুরই মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, বাচ্চাটা তারই এবং তিনি যেন তাকে গ্রহণ করেন।

সুবিনয়বাবু সুনন্দাদেবীর পাশে বসে তাকে বোঝালেন— এই বাচ্চা তাঁদেরই। তাকে কোলে নিয়ে বুকের দুধ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সুবিনয়বাবু আরও বললেন, তুমি বিশ্বাস করো, আমি নিজে বাচ্চাটাকে কোলে করে এনে এই বিছানায় শুইয়ে রেখেছি। তুমি অবিশ্বাস করো না। ওকে কোলে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়াও। আদর কর , এতো আমাদেরই মেয়ে।

সুনন্দাদেবী কোন মতেই বুঝতে রাজি নন, তিনি অনড় এই বাচ্চা তার নয়। এই বাচ্চাটাকে যেন তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অদ্ভুত এক অবিশ্বাস জন্মেছে সুনন্দাদেবীর মনে। কারও কথাতেই তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরা সবাই বোঝালেন সুনন্দাদেবীকে। কিন্তু সুনন্দাদেবীর একই কথা, তার বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে না। এই অবিশ্বাসই তাকে পেয়ে বসেছে।

মেয়েটা ভালোই আছে। কিন্তু সুনন্দাদেবীর শরীরের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যেতে থাকলো। কী রকম একটা অস্থিরতা । মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা কথাও বলেন। ঘুম একদম হয় না। সুনন্দাদেবীর শরীরের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে বাইরের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এনে দেখানোর জন্য ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন। কাকে আনবেন তাঁর নামও বলে দিলেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এলেন। রোগিনীকে দেখলেন। ওষুধপত্র আরও কিছু বাড়িয়ে দিলেন। সুনন্দাদেবীর কোন পরিবর্তন হলো না। শরীরের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হতে থাকলো। একদম উন্মাদের মত হয়ে গেলেন। ওষুধ খাওয়া একদম বন্ধ করে দিলেন। সেলাই খুলে ফেলে দিলেন। শরীরটা একদম দুর্বল হয়ে পড়ল।

মেয়েটি ভালই আছে । চতুর্দিকে তাকিয়ে সব দেখছে। তার মার শরীরের, মনের এই অবস্থাও দেখছে। বুঝতে পারছে কিনা জানি না, সেই যে তার মায়ের অবিশ্বাস। সে তো অবুঝ শিশু, নেহাতই অবুঝ, কী করে বুঝবে?

সুনন্দাদেবীর শরীর আরও খারাপ হয়ে গেলো। অপারেশনের সাত দিনের দিন হঠাৎ ভীষণ

শ্বাসকষ্ট হলো। শরীরটা আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। শ্বাসপ্রক্রিয়া ও হার্ট বন্ধ হয়ে গেলো।

সুনন্দাদেবী চলে গেলেন। সাতদিনের অবুঝ শিশুটিকে ফেলেই চলে গেলেন। মাতৃহারা শিশুটি কিছুই বুঝতে পারলো না। সুবিনয়বাবু পাগলের মত হয়ে গেলেন। এ কী হলো? কোনদিনই তো ভাবেননি সুনন্দাদেবী এভাবে চলে যাবেন, মেয়েটাকে অবিশ্বাস করে এভাবে চলে যাবেন!

স্বপ্ন ভঙ্গ

নির্মলবাবু ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ। চলাফেরা, কথা বলা, সবই মেপে মেপে করেন। কলেজে যখন পড়তেন তখনই স্থির করেছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সংসার করবেন না।

পড়াশুনা শেষ করে অনেকদিন অপেক্ষা কবতে হয়েছে চাকুরির জন্যে। চৌত্রিশ বছর বয়সে একটি দ্বাদশমান স্কুলে বিষয় শিক্ষকের চাকুরি পেয়েছেন। তারপরই সংসার করার কথা চিন্তা করেছেন। ছত্রিশ বছব বয়সে সংগীতাদেবীব সাথে তার বিয়ে হয। সংগীতাদেবীও স্কুল শিক্ষিকা। বিয়ের সময় তার বয়স প্রায় তিরিশ বছর। বিয়ের পব ছিমছাম সংসাব সুন্দর ভাবেই চলতে থাকে।

সংগীতাদেবী নির্মলবাবুকে বললেন, আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে। দেরি না করে একটি সন্তানের কথা চিন্তা করা দরকার। নির্মলবাবু ও, সায় দিলেন। প্রথম প্রথম ভাবলেন, এক বৎসরের মধ্যে তো অধিকাংশ দম্পত্তির সন্তান হয়ে যায়, তাদেরও হয়ে যাবে। সেই আশায়ই অপেক্ষা করলেন বছর খানেক। কিছু হচ্ছে না দেখে নির্মলবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন।

নির্মলবাবু হোমিও চিকিৎসায় মোটামুটি দক্ষ আছেন। নিযমিত পড়াশোনাও করেন। মাঝে মাঝে ওষুধ প্রয়োগ করে তার গুণাগুণ পরীক্ষাও করেন। নিজেব ওপর আস্থা আছে নির্মলবাবুর। স্থির করলেন কিছু হোমিও ওষুধই সংগীতাদেবীকে দিয়ে দেখবেন। বছবখানেক চিকিৎসা চলল, কিন্তু কোন ফল হলো না।

সংগীতাদেবী একদিন নির্মলবাবুকে বললেন, ওষুধতো খাচ্ছি কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। অন্য কোন চিন্তা করার তো এখন প্রয়োজন। নির্মলবাবু সংগীতাদেবীকে আশ্বস্ত করে, বললেন, হোমিও মেডিসিনের কাজ তো ধীরে ধীরে হয়, তাই একটু ধৈর্য ধরতে হয়।

এভাবে আরও এক বছর চলে গেলো। সংগীতাদেবী এবার নির্মলবাবুকে বললেন, এভাবে আর তো অপেক্ষা করা যায় না। অন্য কোন চিকিৎসকের সাহায্য নেয়া দরকার। নির্মলবাবু রাজি হয়ে গেলেন। শহরের একজন নামী স্ত্রীলোকবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন সংগীতাদেবীকে।

ডাক্তারবাবু সংগীতাদেবীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন।

আলট্রাসনোগ্রাফি থেকে শুরু করে রক্ত প্রস্রাব সবই পরীক্ষা হলো। সঙ্গে নির্মলবাবুরও কিছু পরীক্ষা হলো। পরীক্ষায় কারও কোন দোষই পাওয়া গেল না।

ডাক্তারবাবু সংগীতাদেবীকে বললেন, সব রিপোর্টই ভালো এসেছে। তিন মাসের ওষুধ দিয়ে বললেন, আশা করি কাজ হবে। তিনমাস পর আবার আসবেন। সংগীতাদেবী চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী খুব যত্ন করে ওষুধগুলো ব্যবহার করলেন। তিনমাস শেষ হলে আবার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সমস্ত বিবরণ দিলেন।

চিকিৎসায় কোন কিছুই হলো না দেখে সংগীতাদেবী একদম মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, আর ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন না। একগাদা ওষুধ খেয়ে কিছুই হলো না বরং মেদ আরও কিছু বেড়ে গেলো। নির্মলবাবু অনেক পীড়াপীড়ি করলেন ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতে। সংগীতাদেবী কোন মতেই রাজি হলেন না।

নির্মলবাবু সংগীতাদেবীকে বললেন, তুমি যখন ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে না তাহলে আমিই তোমাকে আবার কিছু ওষুধ দেই। সংগীতাদেবী রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, দাও। নির্মলবাবু অনেক বই ঘাঁটাঘাঁটি করে কী ওষুধ দেবেন স্থির করেন।

দুই তিন মাস ওষুধ ব্যবহারের পর সংগীতাদেবী শরীরের কিছু পরিবর্তন অনুভব করেন। চারমাস ওষুধ ব্যবহার করার পর দেখেন মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। সংগীতাদেবী খুব খুশি। খুশি নির্মলবাবুও। এবার তাহলে কিছু একটা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। নির্মলবাবু আরও ওষুধ প্রয়োগ করেন যাতে গর্ভাবস্থায় কোন অসুবিধে না হয় এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।

সংগীতাদেবী ভীষণ খুশি। নানা রকম কথা তার মনে আসে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে। ছেলে হলে কী নাম রাখবেন, মেয়ে হলেই বা কী নাম রাখবেন ইত্যাদি। শোয়ার ঘরে বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর ছবি টানালেন। ঠাকুর দেবতার ছবি টানাতেও ভুললেন না।

একদিন নির্মলবাবুকে বললেন, বলতো আমাদের ছেলে হবে, না মেয়ে হবে? রঙ কীরকম হবে? ফর্সা হবে তো? নির্মলবাবু সংগীতাদেবীর সবকথা মনোযোগ দিয়ে শুনে একটু হাসলেন। মনে তার এক ভীষণ শান্তি।

এভাবে চারমাস পার হয়ে গেলো। নির্মলবাবু সংগীতাদেবীকে বললেন, এবার তোমার একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করা দরকার। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা আলট্রা সনোগ্রাফি করলেই বোঝা যাবে। সেই অনুযায়ী আলট্রাসনোগ্রাফি ইউনিটের ডাক্তারবাবুর সাথে আলাপ করে সনোগ্রাফির একটা দিন ধার্য করেন।

আলট্রাসনোগ্রাফির আগে নির্মলবাবুর ডাক্তারবাবুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সব আলাপ করে সমস্ত ব্যাপারেই তাকে খুলে বলেন, ডাক্তারবাবুর মনে ঘটনাটা খুব দাগ কাটে। খুব মনোযোগ দিয়েই তিনি সনোগ্রাফি করেন।

ডাক্তারবাবু আলট্রাসনোগ্রাফি করতে করতে রোগীকে বলেন, আপনার প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট আছে? রোগিনী উত্তর দেন, না ডাক্তারবাবু, প্রস্রাব পরীক্ষা তো করানো হয়নি। তন্নতন্ন করে ডাক্তারবাবু সব দেখলেন, গর্ভসঞ্চারের কোন সম্ভাবনা হয়নি দেখে মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো! ভাবলেন, ওরা তো এত আশা করে এসেছেন, একটা ভালো খবর শুনতে, কী করে তাদের

এই খবরটা দেন। রিপোর্ট পেয়েই তো একটা ভীষণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

রোগী ডাক্তারবাবুকে হঠাৎ প্রশ্ন করেন, সব ঠিক আছে তো, ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু কোন উত্তর দিলেন না। না শোনার ভান করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। রোগিনী আবার প্রশ্ন করেন, সব ঠিক আছে তো. ডাক্তারবাবু?

এবার ডাক্তারবাবু উত্তর দেন, সনোগ্রাফির কাজটা শেষ করে নিই। তারপরই রিপোর্টে সব বলে দেবো এবং আপনাদের সাথে আলাপ করব।

ডাক্তারবাবু উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়ায় রোগীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলেন, তবে কি কোন সমস্যা আছে। ডাক্তারবাবু কেন সোজাসুজি উত্তর দিলেন না। আলট্রাসনোগ্রাফির রুম থেকে বেরিয়ে ডাক্তারবাবুর সাথে যা আলাপ হয়েছে সংগীতাদেবী সবকিছুই নির্মলবাবুকে বললেন। নির্মলবাবুও খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। রিপোর্টে কী আসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

সংগীতাদেবীর প্রস্রাব পরীক্ষাও হলো। তাতেও গর্ভসঞ্চার হয়নি বলে রিপোর্ট এলো। রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবুর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেলো। আলট্রাসনোগ্রাফি আর প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট তো একই কথা বলে।

ডাক্তারবাবু ভাবতে থাকেন, এই চার মাস ধরে এরা যে স্বপ্ন দেখছিলেন সেটা তো মুহূর্তের মধ্যে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেলো।

রিপোর্ট পেয়ে নির্মলবাবু সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখলেন, আলট্রাসনোগ্রাফি এবং প্রস্রাবের রিপোর্টে সন্তান সম্ভাবনার কোন লক্ষণ নেই দেখে চুপ করে রইলেন। ভাবলেন আরও একটু তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর কাছে আসলে এই অলিক স্বপ্ন দেখা আগেই শেষ হয়ে যেতো। সংগীতাদেবীকে সব বুঝিয়ে বললেন।

সব শুনে সংগীতাদেবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অনেক চেষ্টা করে নির্মলবাবু সংগীতাদেবীকে কোনরকম শান্ত করলেন।

দু'জনেই ডাক্তারবাবুর কাছে দেখা করতে এলেন। নির্মলবাবু ডাক্তারবাবুকে বললেন, আমি সব রিপোর্ট দেখেছি, ডাক্তারবাবু। সময়ের কাজ সময়ে না করলে এইসব সমস্যা হয়ে যায়। আমাদের ভাগ্য খারাপ তাই এমন হলো।

রবীন্দ্রনাথ দাস

গর্ভগৃহ

সুহাস দত্ত এম ডি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কামরার দরজায় আটকানো ঝকঝকে তামার ইংরেজি অক্ষরে লেখা নামফলক। বহুতল বাড়ির পাঁচতলার পুরোটা জুড়ে বহুজাতিক সংস্থা জেসিকা। ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশনের অফিস। এম ডি'র কামরার আগে এক চিলতে-ঘরে বসেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীমতী লতিকা সেন। সুহাস দত্ত অফিসে দত্ত-সাহেব নামেই বেশি পরিচিত। দেখতে সুপুরুষ। সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর বেশি সংখ্যক সদস্যের আস্থাভাজন। নিজ কর্মকুশলতায় পৌঁছতে পেরেছেন কোম্পানির সর্বোচ্চ পদে। কঠোরে কোমলে সংমিশ্রিত তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সহকর্মীরা তাকে খুবই সমীহ করেন। ভারতবর্ষের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তার পরিচালিত কোম্পানি ব্যবসার পরিমাণ ও লাভের পবিধি অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে পেরেছে। সারা সপ্তাহ কনফারেন্স ও কাজ নিয়ে রাত ৮ টা থেকে ৯টা অবধি অফিসেই কাটান। কোন নামী ক্লাবের তিনি সদস্য হননি। না হওয়ার কারণ সেগুলিতে আসা নামীদামী লোকজনের চলন-বলন ও মানসিকতার মাঝে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। জীবনের প্রথম দিকের দিনগুলি কেটেছে প্রত্যন্ত আধা-শহরে। পূর্ববঙ্গীয় ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার প্রভাব—তার মাঝে গড়ে তুলেছে এক অন্য ধরনের মানসিকতা। প্রায়ই অফিস ফেরত চলে আসেন এক মাঝারি ব্যবসায়ী সংস্থার অফিসে। সেখানে রোজ আড্ডা বসে। হাজির থাকেন রাজনীতি সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েক জন। জমিয়ে আড্ডা,লাগামহীন বাক্যজাল, গলা খুলে গান সবই আড্ডার অঙ্গ। কখনও বিশেষ মানুষের আগমনে আড্ডায় অন্য মাত্রা যোগ হয়।

নিজ গৃহকোণে দত্তসাহেব একেবারে সুহাসবাবু। তার বাড়ির নাম ফলকটিও অভিনব। গেটের এক পাশে ঘোষিত 'এখানে সুহাস দত্তকে পাবেন।' চাকুরি জীবনের সঞ্চয় ও অফিস থেকে লোন নিয়ে দক্ষিণ কলিকাতাব এক প্রান্তে একটি দ্বিতল বাড়ি করেছেন। খুব বড় নয় তবে হাত পা ছড়িয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। সামনে বাগান করার মত এক ফালি জমিও রয়েছে। দত্তগৃহিণী তার উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োগে নানা জাতের ফল ও ফুলের গাছ দিয়ে একটা বাগানের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ি করার আগে দু'কক্ষ বিশিষ্ট ভাড়া বাড়িতে দুই ছেলে একটু বড় হয়ে গেলে জায়গার খুব টানাটানি হয়। ভাবতে ভাবতেও আর বাড়ি বদল হয়ে ওঠেনি। জায়গার অভাবে গৃহিণীর হর-পাবতীকে আলমিরার ওপর জায়গা নিতে হয়েছিল। নতুন গৃহে তারা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছেন শ্রীমতী দত্তের আগ্রহে। পড়াশুনার কারণে ছেলেরা কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় দত্তগৃহিণীর অনেক সময় কাটে হর-পাবর্তীকে নিয়ে। হর বা পার্বতী তার মনে কতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছেন পরিমাপ করা না গেলেও দত্ত-সাহেবের অফিসের লতিকা সেন, সহকর্মীর স্ত্রী শ্রীমতী খাণ্ডেলওয়ালা, নাট্য জগতের

নবনীতা গুপ্তরা তার মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন ও উদ্বেগাকুল করে রাখে। মহিলাদের কাছে সুহাস দত্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তিনি নিজেও তাদের সম্পর্কে নিঃস্পৃহ নন। কিন্তু এনিয়ে স্ত্রীর দিনের পর দিন অহেতুক গঞ্জনা সুহাসবাবুকে অত্যন্ত বিব্রত করে। বিরক্তিতে আজকাল নৈশ পার্টিতে স্ত্রীকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

আজ সুহাসবাবু অন্যদিনের চেয়ে আগেই বাড়ি ফিরেছেন, বড় ছেলে সায়নের বাড়ি আসা উপলক্ষে। সায়ন কৃষিবিজ্ঞানে ডক্টরেট করে রাজস্থানের গঙ্গানগর এলাকায় কৃষিবীজ নিয়ে ব্যবসা ও গবেষণারত এক কোম্পানিতে বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত। ছেলের বিয়ের কথা ভাবছেন। এ ব্যাপারে ছেলের সাথে খোলাখুলি কথা বলবেন ভেবে প্রস্তুতি নিয়েছেন। আজকের যুগের ছেলে হয়েও সায়ন বিয়ের ব্যাপারে বাবা মায়ের ওপর কেন ভার ছেড়ে দিয়েছে সুহাসবাবু তা বুঝে পান না। ছেলের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল। ওর কর্মস্থলে কাজের পরিধি ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা। কথা প্রসঙ্গে সায়ন জানাল তার এক সহকর্মী রাজতনু চক্রবর্তী নদীয়ার মানুষ। ওনার স্ত্রী শ্রীমতী অনুসূয়া দেবীর কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান থাকার প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল ওর বাপের বাড়ি সুহাসবাবুদের শহরেই। উনি সুহাসবাবুকেও চিনতে পেরেছেন। বাপের বাড়ির অনেক গল্পও করেছেন যার মাঝে সুহাসবাবুদের পরিবারও বাদ যায়নি। সুহাসবাবু হেসে জানালেন যে, অনুসূয়াদের পরিবারকে উনি চেনেন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সুহাসবাবু। তাড়াতাড়িই শোবার ঘরে চলে এলেন। কাজকর্ম গুছিয়ে শ্রীমতী দত্ত ঘরে এসে দেখলেন সুহাসবাবু চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। সাধারণত ঘুমানোর আগে বই পড়া ওর অভ্যাস। কী ব্যাপার? আবার কোন মহিলার মুখ মনে এল? হেসে বললেন দত্তগৃহিণী। হেসেই উত্তর দিলেন সুহাসবাবু, 'ভুলে গেছি কত দুঃখ, ভুলিতে পারিনি কভু রমণীর মুখ।'

একটা মুখ যে জীবনেও ভুলতে পারেননি সুহাস সে কথা আর কেই বা জানে। তৃষিত নয়নে খুঁজে ফিরেছে সর্বত্র। আজ ছেলের মুখে মনের গভীরতম প্রদেশে প্রোথিত অনুসূয়ার নাম শুনে ছবির মত ভেসে উঠেছে জীবনের সেই উত্তাল দিনগুলি ও মনের মাঝে অনুক্ষণ বেজে উঠা কথা ও সুর, 'বন্ধু আমার কোন্‌দেশে ঘুরে গো বাউলের বেশে তারে আমি খুইজা মরি অন্তরে অন্তরে রে, বন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু রে।'

আগরতলার এম বি বি কলেজ থেকে অনার্স সহ ইংরেজিতে বি এ পাশ করে সুহাস বাড়ি ফিরেছে। বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবার ইচ্ছে যা করুক বাড়িতে থেকেই। বিষয় আশয় যা আছে স্বচ্ছন্দে চলার মত। সহজেই জুটে গেল স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি। বাড়ি থেকে পায়ে চলা দূরত্বে। সময় ভালই কেটে যায় চাকুরি ও আড্ডা দিয়ে। তাছাড়া একটু আধটু লেখার অভ্যাস চিরকালই ছিল। ইংরেজির ছাত্র হলেও বাংলার ওর লেখার হাত ছিল চমৎকার।

স্কুলে যাওয়ার পথে একদিন সুহাসের চোখ আটকে গেল স্কুলের পোশাক পরা এক কিশোরীর মুখে। বৃষ্টিস্নাত পুঁইয়ের লতার মত সতেজ সুঠাম দেহ, মুখে জ্যোৎস্নামাখা লাবণ্য। রোজ সুহাসের স্কুলের সামনের রাস্তা ধরে মেয়েদের স্কুলে ওর যাতায়াত। একনজর দেখার জন্য সমস্ত

মনপ্রাণ ব্যাকুল। ঘুম থেকে উঠেই যে কথা প্রথমেই মনে আসে, আজ দেখতে পাব কি? হাতে বেশ সময় নিয়ে সুহাস বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পাছে না দেখতে পাওয়ার মনোকষ্টে ভুগতে হয়। মেয়েটির চলার ভঙ্গী, চলার গতি সবই সুহাসের চেনা হয়ে গেছে। দল বেঁধে স্কুলে যাওয়া মেয়েদের মাঝে আলাদা, যার ছন্দ তার মনকে দোল' দেয়। নির্গমন ও প্রত্যাবর্তনের পথ অনুসরণ করে জেনে নিল—কোন বাড়ির মেয়ে। শহরের বুকে তাদের পরিবারের ওষুধের দোকান। দোকান সংলগ্ন দোতালা বাড়ি। বাড়ির মালিক অপরেশ ভট্টাচার্য। সংযোগের কোন রাস্তা বা তার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। মনের অস্থিরতা নিয়ে সুহাস আকাশ কুসুম কল্পনা করে চলে আর সেই সাথে ভরে ওঠে কবিতার খাতা উচ্ছ্বাসভরা কবিতায়।

এক সন্ধ্যায় সুহাস বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সিগারেট কিনবে বলে। আবছা আলোকিত রাস্তায় তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন একজন গুনগুনিয়ে সুর ভেজে—সাথে হাতের দোলায় তালের সঙ্গত রেখে। ঘাড় অব্দি লম্বা চুল, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত। রঙ বেশ উজ্জ্বল। চেহারাটা চেনা চেনা মনে হল সুহাসের। এ যে তারই স্কুলের সহপাঠি প্রাণবল্লভ সাহা! অষ্টম শ্রেণি অব্দি পড়ে পড়াশুনার পাট গুটিয়ে নেওয়া প্রাণবল্লভ। পড়াশুনায় মন না থাকলেও গান গেয়ে স্কুল মাতিয়ে রেখেছিল ও। আর সেই কারণেই ছিল সবারই প্রিয়। সুহাস কষিয়ে এক থাপ্পড় বসাল পেছন থেকে। চমকে ফিরে সুহাসকে দেখেই জড়িয়ে ধরল প্রাণবল্লভ। অনেকদিন পর দেখা। সুহাসকে মনে হল তার কত কাছের। সুহাস তাকে টেনে নিয়ে গেল চায়ের দোকানে। দু'কাপ চা নিয়ে একটা টেবিল দখল করে অনেকক্ষণ কত কথাই হল। শহর থেকে একটু দূরে প্রাণবল্লভের গ্রামের বাড়ি। জমিজমা নিয়ে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা ভালই হয়ে যায়। বিয়ে করেছে তিন বছর হল। এক সন্তানের জনক। গান বাজনার চর্চা ধরে রেখেছে এখনও এবং এই সূত্রে কিছু রোজগারপাতিও হয়। এখনও যাচ্ছে অপরেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে তার মেয়ে অনুসূয়াকে গান শেখাতে। শনি ও বুধ সপ্তাহে দু'দিন। সুহাসের মনে হল তার সামনে বসে যেন এক দেবদূত। যে দেখিয়ে নিয়ে যাবে নিষিদ্ধ বাগানে। অনুসূয়া দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে, পড়াশুনায় ভাল, গানের গলাও মিষ্টি, এতসব খবর একসাথে জেনে নিল সুহাস। প্রাণবল্লভকে ছাড়তেই ইচ্ছা করছিল না। আবার আসার কথা দিয়ে তবে সে রেহাই পেল সুহাসের হাত থেকে। প্রাণবল্লভও খুব মুগ্ধ বন্ধুর আন্তরিকতায়।

সুহাসের বাবা পরম বৈষ্ণব। পালাগান ও কীর্তনে ওনার খুবই সুনাম। বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় রাধামাধবের মন্দিরে আরতি হয় কীর্তন সহযোগে। উত্তরাধিকার সূত্রে সুহাস পেয়েছে সুরেলা গলা ও তালজ্ঞান। বাঁধাধরা গানের পাঠ বা তালিম না পেলেও সুরেলা গলায় সে ভালই গায় এবং বন্ধু মহলে বাহবা কুড়িয়েছে প্রচুর। প্রাণবল্লভের যাতায়াত বেড়েছে আজকাল ঘনঘন। সেখানে অনেকক্ষণ গানের চর্চাও হয়। প্রাণবল্লভ সুহাসকে উৎসাহ যোগায় গান বাজনার ব্যাপারে। পুজো এসে যাওয়ায় পুজোর গানের রেকর্ড বের হয়েছে। রেকর্ড প্লেয়ারে একসঙ্গে গান শোনা প্রাণবল্লভের কাছে বাড়তি আকর্ষণ।

পুজোর পর বিজয়া সম্মিলনীর এক জলসায় অনুসূয়া গান গাইবে যেখানে প্রাণবল্লভও

গাইবে। সুহাস গেল জলসায়। প্রাণবল্লভ সঙ্গে থাকায় অনুসূয়াকে সুহাস খুব কাছ থেকে দেখল। অনুসূয়া বেশ ভালই গাইল, একটা গান কার যেন গাওয়া সুহাস মনে করতে না পারলেও গানের প্রতিটি কলি 'লাগে দোল পাতায় পাতায় বকুল বনের সাথি' তার মনকে দোলা দিয়ে গেল। প্রাণবল্লভ যখন গাইতে উঠল তখন সে সুহাসকে জোর করে তার সঙ্গে তুলে নিল মঞ্চে। তাকে দিয়ে গাইয়ে দিল পুজোর বের হওয়া দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গান, 'ওরে আমার মন কিসের তরে দেয় না ধরা ভালবাসার ধন।' প্রথমে বুক দুরু দুরু করলেও বেশ আবেগ দিয়েই গাইলো সুহাস এবং হাততালিও পেল। ফলস্বরূপ এক সপ্তাহের মাঝে আমন্ত্রণ এল অনুসূয়াদের বাড়িতে গান গাওয়ার।

শ' দুয়েকবার আয়নার সামনে ডান বাম মোড়ে ধোপদুরস্ত পোশাকে নিজেকে দেখে নিয়ে সুহাস এক সন্ধ্যায় প্রাণবল্লভের পিছে পিছে পৌঁছে গেল তার স্বপ্নরাজ্য অনুসুয়াদেব বাড়ি। অনুসুয়া ও তার মা হাসি দিয়ে স্বাগত জানাল সুহাসকে। অনুসুয়াই প্রথম মুখ খুলল, 'আপনি সেদিন খুব ভাল গেয়েছেন, মা আপনার গান শুনতে চাইল।' স্মিতহাসি ছাড়া সুহাসের মুখ থেকে কিছুই বেরল না। অথচ বলতে চেয়েছিল সেদিনের গান গাওয়া একটা কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু কথা বলবে কি এক দিকে বুকের মাঝে মুগুর ভাজা অন্যদিকে গলা শুকিয়ে কাঠ! ঘরের মেঝেতে চাদর পেতে তাদের বসার জায়গা করা হয়েছে। গান বাজনা হল। প্রাণবল্লভ ও অনুসুয়া গাইল অনেকক্ষণ। এবার সুহাসের পালা। প্রস্তুতি ছিল। সেদিনের গাওয়া গানটির সাথে দুটি লোকগীতি গাইল। সঙ্গে হারমোনিয়ামে অনুসুয়া ও তবলায় প্রাণবল্লভ। চারিদিকে বসা বাড়ির মহিলারা ভালই উপভোগ করলেন ওর গান। মধুর সন্ধ্যার খুব তাড়াতাড়ি অবসান হল বলেই মনে হল সুহাসের। মিষ্টিমুখ করে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুহাস একটি বিষয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত হল যে, অনুসুয়ার চোখে ছিল তার প্রতি ভাল লাগার দ্যুতি।

প্রাণবল্লভের সাথে পরের সাক্ষাতেই সুহাস ওর কাছে আত্মসমর্পণ করল, 'আমার মরণ বাঁচন তোমার হাতে, রাখলে রাখ, না হলে ভাসিয়ে দাও গোমতীর জলে।' কয়েক মুহূর্ত ভাবল প্রাণবল্লভ। 'এই ব্যাপার!' বলে কাঁধে হাত রাখল সুহাসের। বন্ধুর মধুর অভয় তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মন। রাত জেগে সমস্ত আবেগ উজাড় করে মনের আকুতি সুদৃশ্য নীলাভ কাগজে লিখে সমর্পণ করল প্রাণবল্লভের করকমলে। প্রাণবল্লভ বেশি ভনিতা করেনি। 'তোমাকে সুহাস ভালবাসে, তার ভালবাসার কথা লেখা আছে এই চিঠিতে,' এক সুযোগে অনুসূয়ার গানের খাতায় গুঁজে দিল চিঠিখানা। লজ্জায় অবনত রাঙা মুখে একটু খানি বসে উঠে গেল অনুসুয়া। মুখে রাগ বা বিরক্তি ছিল না। বাড়ি যাওয়ার আগে প্রাণবল্লভ সুহাসকে জানিয়ে গেল তার কাজ হয়ে গেছে। পক্ষে বিপক্ষে সবরকম প্রতিক্রিয়া চিন্তা করে সুহাসের মন চঞ্চল হয়ে রইল কয়েক দিন। অবশেষে এল শনিবার। প্রাণবল্লভের অনুসুয়াদের বাড়ি যাবার দিন। অন্যদিনের মত গান বাজনা হল। কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আঁচ পাওয়া গেল না। গান শেখানোর সময় অনেক সময়ই কেউ না কেউ থাকে গান শোনার জন্য। আজ কেউ ছিল না। অনুসুয়া বলল সে চা করতে যাচ্ছে। অনুচ্চ স্বরে বলে গেল গানের খাতায় উত্তর লেখা আছে।

প্রাণবল্লভ সন্তর্পণে পকেটে পুরে নিল চিঠিটি। চা খেয়ে সে বেরিয়ে এল।

এমনি চলছিল। কত কল্পনা, কত উচ্ছ্বাস। এ যদি লিখে 'তুমি আমার অন্তরের ধন', উত্তরে আসে 'তুমি আমার প্রাণের দেবতা।' প্রেম মেয়েদের সাহসী করে। একদিন অনুসুয়াও সাহসী হল। চলে এল সুহাসের নিভৃত আস্তানায়। একবার নয় বারবার। এগিয়ে যাচ্ছিল দেনাপাওনার হিসাব। প্রথমে হাতে হাত, ঠোঁটে ঠোঁট এবং একদিন শরীরের উত্তাপ ভাসিয়ে দিল সমস্ত বাধা। বাড়ির ভিতর যখন খোল করতাল, কাঁসর ঘন্টায় রাধামাধবের চরণে আরতির নিবেদন, তখনই বাইরের ঘরে অনুসুয়া নিবেদন করল সুহাসকে তার সর্বস্ব। তীব্র অনুভূতির মাঝে রক্তারক্তি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি হল কুমার ও কুমারীর কৌমার্য ও কুমারীত্ব। পিছিয়ে দেখার সময় ছিল না। ছিল শুধু নীড় বাঁধার স্বপ্ন।

কথায় বলে প্রেমের ফাঁদ ভুবনে পাতা। প্রেমেব শত্রুও ওত পেতে আছে সর্বত্র। অনুসুয়ারই এক প্রেম প্রত্যাশী বখাটে ছোকবা সজাগ চোখে ছায়ার মত ঘুরছিল পেছনে। সে একদিন তার কমবয়সী বন্ধুদেব নিয়ে চড়াও হল সুহাসের বাড়ি যখন অনুসুয়া সুহাসের বাহুলগ্না। কোনরূপ পালিয়ে অনুসুয়া চলে যায় সুহাসের বাড়ির অন্দরমহলে। হৈ চৈ শুনে বাইরের বাড়িতে বেরিয়ে আসে সুহাসের বাবা, কাকা ও অন্যান্য শরিকবা। লোকবলে তারা বলীয়ান। চিৎকার চেঁচামেচি করে আগন্তুকেরা পালাল। সুহাসের বাবার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। নিজেই অনুসূয়াকে পৌঁছে দিলেন তাব বাড়ির দরজা পর্যন্ত।

মাথা হেঁট কবে একমুঠো খেয়ে সুহাস শুয়ে পড়ল বিছানায়। বিনিদ্র রজনী। পরদিন স্কুলের পথের দিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল। অনুসুয়াকে দেখা গেল না দলের মাঝে। তবে সুহাসের মনে হল অনেকেই তাকে যেন দেখছে। ছোট শহর সবাই সবাইকে চেনে। গত রাতের কথা চাউর হতে বেশি সময় লাগেনি। মোটরস্ট্যাণ্ডে পানের দোকান, যেখান থেকে সুহাস সচরাচর সিগারেট কেনে। দোকানওয়ালা তাকে জানাল অনুসুয়াকে নিয়ে তার বাবা, মা, কাকা সকালের বাসে আগরতলায রওনা হয়ে গেছে। সিগারেট নিয়ে স্কুলের দিকে না গিয়ে বাড়িব দিকে হাঁটা দিল সুহাস। হঠাৎ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সুহাস উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল যেন এভাবে ছুটেই সে ধরে ফেলবে জাতপাতের সংস্কারের যুপকাষ্ঠে বলি চড়ানো তার অনুসুয়াকে। বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বাঁধ ভাঙা স্রোতের ন্যায় এত কান্নাও কি ছিল তার ভেতর। হতভম্ভ বাবা শুধু পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সুহাসের আজও মনে পড়ে বাবার সে হাতের স্নেহের প্রলেপ। তিনি শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিলেন, 'আমি তোকে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করাব।' উদভ্রান্তের মত কাটল কয়েকটা দিন। স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল। কাগজ দেখে দরখাস্ত পাঠাল বোম্বের এক বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কুলে। উত্তরও এল সহসাই। একদিন বোম্বে পাড়ি দিল সুহাস। এক বছর যেতে না যেতেই বাবা বাড়িতে ডেকে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলেন সমস্ত ওজর আপত্তি উপেক্ষা করে। কোন প্রলেপই প্রশমিত করতে পারেনি তার মনের গভীরে প্রোথিত বেদনাকে। পড়াশুনা শেষে চাকুরি জীবন। জীবন থেমে থাকে না। জীবনের ফসলও ফলে কালের নিয়মে। শুধু বড় ছেলের নামকরণ করার

সময় ভুলতে পারেনি অনুসুয়ার সাথে নাম মিলিয়ে প্রথম সন্তানের নামকরণের স্বপ্ন।

আজ ছেলের মুখে অনুসুয়ার নাম শুনে নিভে যাওয়া আগুন ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল। ছেলের কাছ থেকে হয়ত বা টেলিফোন নাম্বার পাওয়া যেতে পারে অনুসুয়ার, কিন্তু সুহাস পারবে কি তাকে বলতে, তুমি কি এখনও আমায় মনে রেখেছ?

দুই সের চাউল

'মস্তানা জাগোরে খবরদার' রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে মাঝে মাঝে ভেসে আসে হাঁক। ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার এহসান আলি রাতভর পাহারা দেয় গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। তেল চকচকে বাঁশের লাঠি হাতে এহসান অশরীরীর মত নিঃশব্দে অন্ধকারে চলাফেরা করে।

চেহারা চরিত্রে চোখে পড়ার মত এহসান। বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় বাবরি চুল, মোটা পুরু ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। রাতের পাহারায় একবার সে এসে দাঁড়ায় মনার বাড়ির উঠোনে। হাঁক দেয়, 'মনা বাড়িতআছস?' কোনদিন মনা নতুবা মনার বুড়ি মা সাড়া দেয়। দুবার উঠোনে লাঠি ঠুকে আবার এহসান মিশে যায় রাতের অন্ধকারে।

মনার ভাল নাম মনোরঞ্জন। মনা চোর বললে সবাই একডাকে চেনে। চোর হিসাবে মনার খ্যাতি। আশপাশের গ্রামও মনার কর্মক্ষেত্রের আওতায়। চুরিতে ধরা পড়ে গণধোলাই (বাজাইরা মার), থানায় পুলিশের লাঠির গুঁতো, জেলের ভিতরের চড় থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে মনার শরীরে মোটামুটি মারসহা হয়ে গেছে। চোরকে মারতে যে লোকের এত উৎসাহ, একজনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠেও একটা কিল বা ঘুষি দিতে না পারলে যেন শান্তি নেই! মনা মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে কী নিষ্ঠুর মারতে থাকা লোকগুলোর চোখ মুখ! মাথা গুঁজে নীরবে হজম করা ছাড়া কিছু করার থাকে না। মারের শুরুতে বেশ গায়ে লাগে, পরে আর বিশেষ কিছু বোধ থাকে না। একটা ব্যাপারে মনা খুব আশ্চর্য হয় হঠাৎ করে মার বন্ধ হয়ে যাওয়া। ও বুঝতে পারে না সবগুলো মানুষ কি একসাথে হয়রাণ হয়ে যায়, নাকি—মরার মত লাশকে পিটিয়ে সুখ পায় না বলে! চুরি করা মনার প্রায় নেশার মত। মায়ের বিলাপ সহ্য করতে না পেরে ও অনেক বার চেষ্টা করেছে চুরি ছেড়ে দেওয়ার। কিন্তু রাত বা দিন সুযোগ এলেই মনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ওকে নিশির ডাকে পেয়ে বসে। ওর চোখ, কান, নাক অতিরিক্ত সজাগ হয়ে যায় চুরি করতে বেরিয়ে। রাতের অন্ধকারেও মনা সহজে চলাফেরা করতে পারে। সামান্য খসখসানি আওয়াজ ওর কানে আসে। কোন্ বাড়িতে নিরাপদ হবে ও মাল পাওয়ার সম্ভাবনা মনা যেন তার গন্ধ পায়। একটা ব্যাপারে পুলিশও মনা চোরের তারিফ করে। শত গুঁতো খেয়েও মনাকে মুখ খোলাতে পারেনি, চুরির মাল সে কার কাছে বেচে।

মায়ের দুঃখ মনা বোঝে, কারণ মা ছাড়া ওর আপন আর কেউ নেই। কিন্তু মনার কোন উপায় নেই চুরি ছাড়া। ওর মাথার আর কিছুই আসে না। মাঝে কিছুদিন মুটেমজুরি করে চেষ্টা করেছিল পেটের ভাত জোগাড় করতে। সেখানেও লোক ওকে বিশ্বাস করে না।

তাছাড়া হাড়ভাঙা পরিশ্রমও ওব সহ্য হয় না। মনার মায়ের খায়েস মনা বিয়ে করে বউ আনুক। মনাকে কে মেয়ে দেবে? সদরের উকিল খাস্তগীরবাবুর মনার প্রতি কী যে দুর্বলতা মনাকে দেখলেই হাসেন আর গালাগাল দেন। সরকারি উকিল বলে সাক্ষীসাবুদ হাজির না করে মনাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে দেয়। উকিলবাবুর পদধুলি নিয়ে, আবার আসব বলে গালি খেতে খেতে মনা বিদায় নেয।

লোকে বলে বিয়ে নাকি নির্ধারিত হয়ে থাকে স্বর্গে। মনারও বিয়ের ফুল ফুটল একদিন। স্বামীর হাতে দৈহিক নির্যাতিতা ও পরিশেষে পরিত্যক্তা মালতি দাসের বাবা একদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল মনার মায়ের কাছে।

মনার মা লুফে নিল প্রস্তাব। মনা হতবাক। কখনও ওর মনের কোণে উঁকি দেয় সিঁদ কেটে এক বাড়িতে ঢুকে আবছা অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকার দৃশ্য ..।

নিজেব জীবনে কোন যুবতীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে শুয়ে থাকার কথা কখনও ওব মনেই আসেনি। দিনক্ষণ দেখে ধুতি পাঞ্জাবি পরে কয়েকজন সঙ্গীসাথি নিয়ে হেঁটে চলে গেল মালতিব বাপের বাড়ি। পরদিন মনার পিছে ধীরপদে হেঁটে মালতি উঠল এসে নতুন স্বামীর ঘরে।

ছিপছিপে গড়নের কালো গায়ের রঙের মালতির মুখে লাবণ্য নেই, কিন্তু তার সুগঠিত দেহের আকর্ষণ দুর্বার। চিরকাল কিল, ঘুষি খাওয়া মনার শরীর মমতার স্পর্শে একেবারে উতলা হয়ে গেল। সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির মাঝে মনার মন উন্মুখ হয়ে থাকে রাতের অপেক্ষায় কখন মালতিকে পাবে একান্তে আপনার করে।

একই ঘরে তক্তাপোশে শুয়ে থাকা মনার মায়ের ও মাটিতে বৌকে নিয়ে শোয়া মনার মাঝে রাতের অন্ধকাবটুকু একমাত্র আড়াল। বুকের ধড়ফড়ানি রোগে ভোগা মনার মা আধো ঘুম আধো জাগরণে শোনে পোলা-বৌয়ের ঘনশ্বাস, বৌয়ের কাচের চুড়ির টুং টাং আওয়াজ।

মালতিকে ফেলে রাতে বেরোতে মনার মন চাইত না। তাছাড়া মালতিও বাধা দিত। পেটেব দায়ে মনাকে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে বেরোতে হতো। সোনাদানা সহ একটা ভাল দাও মারতে পেরে মনার মনে হল নতুন বৌয়ের ভাগ্যের জোরেই হয়েছে ...।

অন্তত কিছুদিনের জন্য মনা ছুটি পেল। মালতি সন্তান সম্ভবা হলো। নতুন বৌকে নিয়ে মনার মায়ের আ।দিখ্যেতার শেষ নেই। পোয়াতি বৌকে খাওয়াতে বুকের ধরফড়ানি নিয়েও বেরিয়ে পড়ে কলমি শাক, কচুর লতি, পেস্তা আলু সংগ্রহে। একদিন মাঠে কলুই শাক তুলতে গিয়ে সেখানেই পড়ে গেল। মনার মায়ের আর নাতির মুখ দেখা হলো না।

মালতি ছেলের জন্ম দিল। ছেলের বয়স যত বাড়ছে সংসারের প্রতি আকর্ষণ মনার ততই বাড়ছে। আজকাল চুরি করতে বেরোতে মনা মানসিক দুর্বলতা বোধ করে। ছেলেকে ঘিরে ওর নানা ভাবনা। মালতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ' বৌ আমাগো পোলা যেন আমার মত চোর না হয়।'

রাতের পাহারায় এহসান আলি মনার উঠোনে এসে হাঁক দিলে মনা দরজা খুলে আজকাল এহসানকে ঘরে এনে বসায়। বিড়ি টানতে টানতে দু'জনে সুখ দুঃখের কথা বলে।

এহসানের মনেও শান্তি নেই। রাতের পর রাত ওর বাইরে থাকার সুযোগ নিয়ে চাচাত ভাই এহসানের বিবির সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়েছে। খুন খারাপি করে হারামি বউকে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা এহসানের নেই। তাদের কথাবার্তায় মালতিও যোগ দেয়। হিন্দুর ঘরে মুসলমানের প্রবেশে যখন জাত যাওয়ার কথা সেখানে নিশুতি রাতের আড্ডায় তাদের মাঝে এক সখ্যতা গড়ে ওঠে। মনার অবর্তমানেও মালতি এহসানকে ঘরে এনে বসায়, আর এহসানও মনার বাইরে থাকা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ভরা ভাদ্দর। চারিদিক মাঠ ঘাট জলের তলায়। দু'দিন আধপেটা খেয়ে আছে মনা মালতি। ছেলেকে পেট পুরেই খাইয়েছে।

অগত্যা রাতের অন্ধকারে বেরোতে হলো মনাকে। মনা বেরোলে সারাক্ষণ উৎকণ্ঠিত থাকে মালতি মনা না ফেরা পর্যন্ত। মালতির উৎকণ্ঠার অবসান হল যেদিন মনা মারা গেল। যে বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল বাড়ির এক বৌ জেগে তারস্বরে চিৎকার করতেই লোকজন বেরিয়ে এসেছে লাঠিসোটা নিয়ে। মনা জায়গা নেয় এক ডোবায়। ঝোপের আড়ালে জলের ওপর মাথা ভাসিয়ে চুপচাপ লুকিয়ে থাকলেও শেষরক্ষা হলো না। টর্চের আলো ফেলে লোকজন দেখে ফেলল মনাকে। এবার লাঠির বাড়ি যা পড়ল সবই মনার মাথায়। জল থেকে যখন উঠানো হলো মনার মাথা ফেটে চৌচির। দেহ নিষ্প্রাণ। এহসান আলি তদারকি করে মরা নিয়ে শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করল। বিপদে পড়ল মালতি ছেলেকে নিয়ে। ভেসেই যেত যদি না এহসান আলি পাশে দাঁড়াত। ধীরে ধীরে নানা কাজ, লোকের বাড়িতে ধান সিদ্ধ, ঢেঁকিতে বাড়াবানা। এসব করে নিজে আধপেটা খেয়ে ছেলেকে বড় করতে লাগল। গ্রামের কিছু লোকের অশ্লীল ইঙ্গিত এড়িয়ে গেলেও এক দু'জন ছিল বেপরোয়া। রাতে বিরোতে দরজায় হামলা। এহসান আলি এক রাতে একজনকে ধরে কিছু উত্তমমধ্যম দেওয়ার ফলে ভেঙ্গুলেব বাসায় ঢিল পড়ল।

এহসান আলির সঙ্গে মালতির অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ তুলে গ্রামের মাতব্বররা জমায়েত হলো মালতির উঠোনে। নির্ভয়ে মালতি দাঁড়াল সবার সামনে। এহসানের সাথে ওর সম্পর্ক অস্বীকার করল না। মালতি জানাল কারও সাথেই সে সম্পর্ক রাখবে না যদি সবাই মিলে ওকে সপ্তাহে দু'সের চাউলের বন্দোবস্ত করে দেয়। নানা আস্ফালন ও কটূক্তির মাঝেও মালতির একটাই কথা—দু'সের চাউল। চাউলের বন্দোবস্ত সমাজ করতে পারেনি। এহসান আলি মালতির পাশে ছিল আজীবন ওর বিপদে আপদে।

একদিন পাঁচ বছরের ছেলে অনুকূলকে নিয়ে মালতি এসে আছড়ে পড়ল গ্রামের হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক সত্যরঞ্জন সরকার মশায়ের পায়ে, 'আমার ছেলেকে পড়ার ব্যবস্থা কইরা দিতে অইব। ওর বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে যেন চোর না বনে।'

সরকার মশায় কথা দিলেন সাহায্য করার। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ছেলেকে দু'বেলা পেট পুরে খাইয়ে চলছিল মালতির দিন। পড়াশুনায় ভাল অনুকূল। হেডস্যার কথা

রেখেছিলেন। পড়াশুনায় সব সাহায্য অনুকূল পেয়েছে হেডস্যারের কাছ থেকে। জীবনের নানা ঘাটে মানুষের অবহেলা ঘৃণা সয়ে সয়ে মালতির হেডস্যারকে মনে হতো সাক্ষাত ভগবান।

ধোঁয়া, ধুলোবালিতে দীর্ঘদিন কাজ করে অপুষ্ট শরীরে মালতি ক্ষয়রোগ নামক মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। কাশির সাথে রক্ত যেতে যেতে নিঃশেষ হতে থাকল। মালতি তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করে গেল মনার শেষ বাসনা।

বাস্তবতার মুখোমুখি

গাড়ি থেকে নেমে লালমোহন চৌধুরী অফিসের দিকে পা বাড়াল। গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজে ড্রাইভার পাঁচু শব্দকর আন্দাজ করতে পারে মালিকের মেজাজ। পাঁচু বুঝল আজ পারদ একটু চড়া। বাবুর নিজের ঘরে ঢোকার আগেই অফিসের বেয়ারা কাম পিয়ন হরিপদ এ সি চালু করে দিয়েছে। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লালমোহনকে স্বস্তি দিল। কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল রক্তচাপ মাপা হয়নি। কাজের দরবারে নিজে অফিস আদালত যাওয়া আজকাল কমিয়ে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে না গিয়ে উপায় থাকে না। আজই মুরগি বিশ্বাসের টেলিফোন পেয়ে যেতে হল শুল্ক দপ্তরে। শুল্ক দপ্তরের অফিসার মিঃ বিশ্বাসকে ও মুরগি বিশ্বাস বলেই মনে মনে ভাবে। মিঃ বিশ্বাসের কাজের ধারা হল সামনে বসিয়ে কাগজপত্রের কোথায় ভুল আছে তার ফিরিস্তি আওড়ান। ফলে কত টাকা খেসারত দিতে হবে তার একটা আন্দাজ ধরিয়ে দেওয়া। চাপ নামক ছুরিতে শান দিতে দিতে বিশ্বাস হিসাব করে কোন জায়গায় খোঁচা দিলে কতটা উঠে আসবে। খুব অপমানিত বোধ করে লালমোহন এভাবে বসে থেকে লোকটার কথাগুলি শুনতে। শুধু ফালতু দেরি আর ঝামেলা এড়াতে প্রতিমাসে কিছু টাকা ওদের মুখে ছুঁড়ে মারতে হয়। পকেট থেকে দুই বাণ্ডিল একশ টাকার নোট বিশ হাজার টাকা টেবিলে দিয়ে হাতজোড় করে লালমোহন মিঃ বিশ্বাসকে অনুরোধ জানাল, 'আমার রিফাণ্ডের পাওনাগুলোর কাগজপত্র দয়া করে ওপরে পাঠিয়ে দেবেন, স্যার।' টাকার বাণ্ডিলগুলো লালমোহনের দিকে ঠেলে দিয়ে, 'আমি কি ভিখারি নাকি?' বলে টেবিলে রাখা একটা ফাইল টেনে নিয়ে মনোযোগ দিলেন মিঃ বিশ্বাস। কাঁচুমাচু হয়ে বসে থেকে আরও একটা বাণ্ডিল দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল লালমোহন। রাগে শরীরের অণু পরমাণুতে আগুন ধরে যায়। তুমি যেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটা কিছু গড়ে তুললে —লোকগুলোর দাবি যেন পৈত্রিক সম্পদের ভাগ দিতে তুমি বাধ্য। মনে মনে একটা খিস্তি আওড়াল লালমোহন, 'আমার সাধুপণ্ড বাবা কী করে এত বেটির সাথে বিছানায় শুয়ে গেল তার ফসল তার জারজ সন্তানরা পিতৃসম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা চায়।'

মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। বিষণ্ণ হয়ে পড়ে লালমোহন। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এ

পাশ করেছে লালমোহন। পড়াশোনায় উৎসাহ আর আনন্দ দু'টোই ছিল। দর্শনের জগতের বড় বড় নামগুলি ও তাঁদের ভাবনা আজও ওর মনের কোণায় বিদ্যমান। আর্থিক দুরবস্থার জন্য পড়াশোনা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য এক কারখানায় কাজ করতে হত দিনের অনেকটা সময়। কলকারখানার নানান কাজের খুঁটিনাটি তখনই ওর জানা হয়ে যায়। তাই কলেজের পড়া শেষে লেগে গেল কারখানা খুলতে। অসম্ভব মনের জোর, কঠোর পরিশ্রম, সততাকে মূলধন করে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার সুফল একদিন ফলেছে। লালমোহন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে গীতার প্রবচন, 'ফলের দিকে না চেয়ে কর্ম করে যাও।' ওর চলার পথে সহায়ক ছিল পরিবারের সদস্যদেব অক্লান্ত পরিশ্রম। সাফল্য ওকে উৎসাহিত করেছে নতুন কাজে। সার্বিকভাবে চেষ্টা করেছে পরিবারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এবং ওর পরবর্তী প্রজন্মকে আর্থিক অনটনের সামনা করতে হয়নি উচ্চশিক্ষা পেতে। নিজের ও ভাইদের সন্তান সন্ততিদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ওর প্রয়াস ছিল আন্তরিক।

আর্থিক সাফল্যের সাথে এসেছে জীবনের নানান জটিলতা। স্বজনদের প্রত্যাশাও বেড়েছে অনেক গুণ। সেগুলোর মীমাংসায় মানসিক যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে। দীর্ঘ চলার পথে কত জায়গায় যে হাতজোড় করতে হয়েছে।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার সীমা গড়িয়ে রাত্রি নয়টায় থামে লালমোহন। হরিপদ ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিছু কাজকর্মে। অফিসের এক কোণায় বসে একটু পান করা লালমোহনের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এই সময়টা ওর একান্তই আপনার। মনের মাঝে ভিড় করে বড় বড় ভাবনাগুলো। লালমোহন মনে করে ওর সারাদিনের কাজকর্ম নিজের স্বার্থে হলেও দেশের উন্নয়নে তার একটা সদর্থক ভূমিকা আছে। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধঃপতনের মাত্রা যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। মানুষের ভিতরকার লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ওকে ক্লিষ্ট করে। পানের মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছলে ওর মনের ক্ষোভ সেই মাত্রায় বাড়ে। তখনই মনে হয় যুদ্ধই সমাধানের পথ। নিজেকে সব রকম বাহিনীর প্রধান মনে হয় এবং ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে স্থল, নৌ, বিমানবাহিনী নিয়ে। তবে বিভ্রাট ঘটে যায় সেই সময়ের ক্ষোভ কোন অসহায় দুর্বলের দিকে ধাবিত হলে।

সকালের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল লালমোহন। আজকাল প্রতিদিনই কাগজে বেরোয় নানা নারী নির্যাতন। দেখে দেখে গা সওয়া হয়ে গেছে, তাই বিস্তারিত পড়া ছেড়ে দিয়েছে। আজ আবার বড় হরফে হেডলাইন 'ইঞ্জিনিয়ার যুবক গ্রেপ্তার ঃ নব পরিণীতা বধূকে পুড়িয়ে মারার অপরাধে।' বিস্তারিত পড়ল লালমোহন। আরেব্বাস! এ যে মুরগি বিশ্বাসের ছেলে শ্বশুরবাড়ি থেকে আরও টাকা আদায়ে বধূকে পীড়নের মাত্রার শেষ পর্যায় পুড়িয়ে মেরেছে! বিদ্যুৎ এর মত একটা কথা মনে এল লালমোহনের। মুরগি বিশ্বাসের সেদিনের কথা, 'আমি কি ভিখারি নাকি?' উত্তর পেল লালমোহন, 'তুমি নিজে শুধু ভিখারি নও মুরগি বিশ্বাস, তোমার আগামী প্রজন্মের দশ পুরুষকেও ভিখারি বানিয়ে ফেলেছ!'

জলপরি

বাসন্তীদিকে যতবার দেখতাম আমার রূপকথার জলপবি বলে মনে হত। আমাদের লতাপাতায় বিস্তৃত গোষ্ঠীর এক ডজন পিসির এক পিসির মেয়ে বাসন্তীদি। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ার দৌলতে ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়ি ওর যাওয়া-আসা লেগেই থাকত। বছরের সারাটা সময়েই নাক দিয়ে সিকনি গড়াত আর সুড়ুৎ করে ভিতরে টেনে নিত। শীতকালে হাতের আঙুলের ফাঁক থাকত পাঁচড়ায় ভরা। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল। সেই বাসন্তীদি যখন জামা ছেড়ে শাড়ি ধরল কেমন যেন ভোজবাজির মত সব পাল্টেগিয়ে খোলস থেকে এক প্রজাপতি বেরিয়ে এসে আমার চোখে জলপরি হয়ে গেল। আমাদের বাড়ি এলে আমি ওর কাছ ছাড়া হতাম না। ওর গায়ের মিষ্টি গন্ধ আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলত।

স্কুলে যাওয়া আমার কাছে বিভীষিকা মনে হত। স্কুলের বাইরের জগৎ আমায় হাতছানি দিয়ে ইশরায় ডাকত। নদী ঘাট মাঠ, বাঁশঝাড়ে কাকের বাসা, আম জাম তেঁতুল গাছের মগডাল, খেজুর গাছের মাথায় বাঁধা কলসির প্রতি ছিল আমার বেশি আগ্রহ। ফলে মাঝে মাঝে স্কুল কামাই ছিল অবধারিত। সেই অপরাধে জুটত গণপিটুনি। পাবিবারিক নিয়মে বয়সে বড়দের ছোটদের পেটানোর অধিকার ছিল স্বীকৃত। আমি ভাবতাম হীরাদার মত হতে পারলে কী ভালই না হত।

হীরাদা আমার মেজদার বন্ধু। মেজদার মত সুবোধ ছেলের সঙ্গে হীরাদাব কী করে এত বন্ধুত্ব হল বোঝা মুশকিল। লেখাপড়া ছাড়া সব বিষয়ে হীরাদা চৌখস। মেজদার মুখে শোনা দ্বিতীয় শ্রেণিতে দু'বছর কাটিয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বাংলা ক্লাসে দ্রুতপঠনে এক গল্পের অংশ 'ডাক্তার কহিলেন ক্ষীর পাইলে কোথায়' এর জায়গায় হীরাদা দু'বারই পড়ল 'ডাক্তার কইলেন ক্ষীরের পাইল্লা কোথায়।' রেগে গিয়ে গিয়াসউদ্দিন স্যার কষে এক থাপ্পড় লাগিয়ে বললেন, 'যা, গিয়ে দেখ গে, তোর বন্ধু আলফুর দোকানে।' হীরাদার সঙ্গী আলফু মিঞার বাবার বাজারে মাটির হাঁড়ি পাতিলের দোকান। আলফুর সাথে মাঝে মধ্যে হীরাদাও সেই দোকানে বসে। থাপ্পড় খেয়ে হীরাদা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল। লেখাপড়া ছেড়ে হীরাদা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। ডিঙি নাও নিয়ে পাড়ি দেয় নদীর ওপার। বর্ষায় গ্রামের কোথায়ও বাঁশের সাঁকো পুঁততে হীরাদা অগ্রণী। খেলাধুলো হীরাদার ছিল সহজাত প্রতিভা। দাড়িবান্ধা, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু, ফুটবল, ভলিবল সব খেলাতে হীরাদা সবার ওপরে। বাবুই পাখির বাসা দড়ি দিয়ে প্যাঁচিয়ে তৈরি বল-এ ওর খেলা দেখেই উপেনকাকা হীরাদাকে ওর ফুটবল দলে জায়গা করে দিলেন। উপেনকাকা ঢাকার ওয়ারি ক্লাবে ধুতি পরে মালকোচা মেরে ফুটবল খেলে এসেছেন। গ্রামের ফুটবল খেলা—যেদিকে বল সেখানেই বলের পিছন সব খেলোয়াড়। উপেনকাকা শেখাল কিভাবে জায়গা নিয়ে খেলতে হয়। ওর কোচিং পেয়ে হীরাদার খেলার খুব উন্নতি হল। দু'পায়ের কিক সমান জোরদার। দু'তিন জনকে পাশ কাটিয়ে গোলের মুখে পৌঁছে যাওয়া ওর কাছে এখন জলভাত। হীরাদার চেলা আলফু মিঞা গোল

রক্ষক হিসাবে অসাধারণ। এমনিতে আলফুর মেরুদণ্ড কুঁজো, কিন্তু খেলা চলাকালীন ওর মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়।

একদিন গ্রামে সাজ সাজ রব। নবীননগরের সাথে আমাদের গ্রামের ফুটবল ম্যাচ। খেলায় ওরা আমাদের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের গ্রামে খেলতে গিয়ে হেরে গেলেও আমাদের টিম বাজার থেকে পেতলের কলসি কিনে গ্রামে ফিরে দেখায় জেতার প্রাইজ হিসাবে। এবার নবীননগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে হায়ার করা খেলোয়াড় নিয়ে এসেছে। ওদের দলের সব খেলোয়াড় এর গায়ে রঙিন জামা পায়ে মোজা ও বুট। আমাদের খেলোয়াড়দের গায়ে গেঞ্জি খালি পা। সারা গাঁয়ের ও আশপাশের গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে মাঠে। খেলা শুরুর দশ মিনিটের মাথায় নবীননগর এক গোলে এগিয়ে গেল। সারা মাঠ নিঃস্তব্ধ। আমাদের গোল এলাকায় বল ঘুরছে সারাক্ষণ। যে কোন সময়ে গোল হতে পারে। দর্শকদের উত্তেজনায় টানটান। গোল বাঁচাতে হীরাদা নিচে নেমে এসে খেলছে। আমাদের দলের কোন আক্রমণ দানা বাঁধছে না। প্রথম অর্ধেক খেলায় নবীননগর এগিয়ে রইল একগোলে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় জায়গা বদল করে হীরাদাকে পাঠানো হল ডান প্রান্তে। ডানদিক থেকে বল নিয়ে হীরাদা দ্রুত উঠে আসতে লাগল গোলের কাছে। বিপক্ষের তিন খেলোয়াড় ঘিরে রাখল হীরাদাকে আটকাতে। ওর তৈরি করে দেওয়া সহজ সুযোগ নষ্ট করল আমাদের দলের হিমাংশু সাহা। আঠার মিনিটের মাথায় গোল শোধ। চার মিনিটের মাথায় হীরাদার শটে এক গোলে এগিয়ে গেল আমাদের দল। উল্লাসে সারা মাঠ কেঁপে উঠল। নবীননগরের খেলোয়াড়রা সবাই চুইংগাম চিবুচ্ছে। নিমাই জেঠা বুঝতে পারছে না জিনিসটা কী? জেঠা চেঁচাতে লাগলো 'ওগো খাওন পাইছে না। খিদায় জাবর কাটছে, ওগোরে আরও দুইটা গোল দে।' জেঠার কথা রাখবার জন্যই কি না হীরাদা খেলার বাঁশি বাজবার আগে আরেক গোল করল। খেলা শেষে সমস্ত মানুষ নেমে পড়েছে মাঠে। হীরাদাকে কাঁধে নিয়ে মাঠে চক্কর কাটল তারা।

হীরাদার বাসনা একদিন গরুদৌড়ে ওর গরু কালুকে জিতিয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাই কালুর যত্ন আত্তিতে হীরাদার ভীষণ নজর। নৌকা নিয়ে চলে যায় নদীর চরে ঘাস তুলতে। রোজ প্রচুর কাঁচা ঘাস, খইল, ভূষি কালুর বরাদ্দ। জোয়াল জুড়ে কালুকে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় রোজ একপ্রস্ত দৌড় করায়। প্রতি বছর গ্রামের মাঠে বসে গরু দৌড়ের প্রতিযোগিতা। দৌড়ের দিন মাঠ ভর্তি লোকজন। গরুর গলায় গাদাফুলের মালা পরিয়ে দূর দূরান্ত থেকে প্রতিযোগীরা মাঠে হাজির। গরুর গায়ে গতরে কী বাহার যেন তেল ঝরে পড়ছে। প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় হীরাদার গরু কালু প্রথম হয়ে যাওয়ায় গ্রামের লোকের উৎসাহ বেড়ে গেল। কিন্তু মূল প্রতিযোগিতায় হীরাদার গরু বেলাইনে চলে গিয়ে অন্য গরুর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল হীরাদার মইয়ের দড়ি। মরতে মরতে বেঁচে গেল হীরাদা। শরীরের কোন কোন জায়গায় ভাল চোট লাগল। অভিমানে হীরাদা হাটে গিয়ে কালুকে বেচে দিল। কয়েকদিন কালুর জন্য মন খারাপ হল। কোন কাজে মন বসে না। গোয়াল ঘরের দিক চোখ পড়লে বুকের ভিতরটা একটা মোচড় দিয়ে হীরাদাকে আরও বিমর্ষ করে দেয়। কয়েক দিন পর গরুর দালালের সাথে

বাজারে দেখা। ধরল ওকে, কালুকে ফিরে পেতে। দালাল আশ্বাস দিল, সে চেষ্টা করবে। কয়েক হাটবারের পর দালাল জানাল কালুকে বলদ বানিয়ে হালে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

হীরাদার পারিবারিক ব্যবসা নৌকা চালানো। বড় নৌকায় মালপত্তর বয়ে গঞ্জে যাতায়াত করা। গরু ছেড়ে একটা বড় নৌকা সামলায় হীরাদা— সঙ্গে দু'জন মুনিশ নিয়ে। দূরের হাটে অতি সকালে রওনা হয়ে যায় ব্যবসাদারদের নিয়ে। দুপুরে ও রাত্রির খাওয়া সবাই নৌকাতেই করে। রান্নাবান্না করে হীরাদার লোকজন। নৌকার হাল ধরা, দাঁড় বাওয়া এসব করে করে হীরাদার পেশি আরও মজবুত হয়েছে। ঝড়, বৃষ্টিবাদল সব সামলায় সাহসের সাথে। বেলাবরের হাট বেশ দূরে। হাট থেকে ফেরার পথে একবার নৌকায় ডাকাত পড়ল। ছোট পানসি নৌকায় চার ডাকাত এসে ভিড়ল ওদের নৌকার কাছে। ডাকল, 'ও মাঝি, একটু আগুন দিয়ে যাও।' রাতে বিরাতে নদীপথে সচরাচর ডাকাত পড়ে। গেল বছরও ডাকাতি হয়েছে ওদের নৌকায়। ব্যবসায়ীদের নগদ টাকা পয়সা মালপত্তর নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, নৌকায় ছিল চিঁড়া মুড়ি ও গুড়। ডাকাতরা চিঁড়া, মুড়ি খেল আর রামদা উঁচিয়ে নৌকার লোকজনদের গান গাওয়াল, 'বাবাজানেরা চিঁড়া খায় রে, চিঁড়া খায়ে রে।' শাল কাঠের বৈঠা নিয়ে হীরাদা আক্রমণ করে বসল ডাকাতদের। তার অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওরা প্রস্তুত হতে পারেনি। কিছু বোঝার আগেই দুই ডাকাত ধরাশায়ী। বাকি দু'জন সাঁতার কেটে পালাল নৌকা ছেড়ে। ভোরে দুই ডাকাত ধরে ঘাটে ফিরল হীরাদার নৌকা। ভোরবেলা খাকি টুপি মাথায় নিয়ে দফাদার চলে গেল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানায় খবর জানাতে। সকালবেলাতেই ঘোড়ায় চড়ে কাজি দারোগা চলে এলেন—সঙ্গে লাল টুপির পুলিশ বাহিনী নিয়ে। কাজি দারোগার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এহেন কাজি দারোগা হীরাদাকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে সাবাসি জানাল।

সেই হীরাদার সাথে বিয়ে হয়ে গেল বাসন্তীদির। আমরা ভাবতাম লেখাপড়া জানা চাকুরি করা ছেলের সাথে বাসন্তীদির বিয়ে হবে। অনেকটা বাসন্তীদির ইচ্ছায় বিয়ে হল হীরাদার সঙ্গে। বিয়ের পর বাসন্তীদির রূপের জৌলুস আরও খুলতাই হল। মা, মাসি, পিসিরা বলাবলি করল, বিয়ের জল পড়েছে, এমনটি ত হবেই। হীরাদা একটু মনমরা বিষণ্ণ। গাছতলায় বসা বয়স্কদের আড্ডায় হুকায় টান দিতে দিতে নীবারণকাকা ফোড়ন কাটল, 'মায়াডা রস চুইষা একেবারে ছোবড়া বার কইরা লাইতাছে।' কিন্তু বাসন্তীদির গায়ের বিয়ের জল যেন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। আমাদের বাড়ি এলে আগের মত প্রাণবন্ত লাগত না। কাকিমা জেঠাইমাদের কাছে কী বলে চোখের জল ফেলত যা আমার নজর এড়ায়নি। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে তোমার? বাসন্তীদি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমার অবুঝ মন বুঝতে পারেনি, হৃদয়ের কোন গভীরে বাসন্তীদির মনের ক্ষত। একটুকু বুঝেছিলাম যে, পুরুষ হিসাবে হীরাদার মাঝে কিছু কমতি ছিল।

একদিন সারা পাড়ায় রটে গেল বাসন্তীদির ওপর অপদেবতার ভর হয়েছে। খোলাচুলে নদীর ঘাট থেকে ভরা কলসি কাঁখে ফেরার পথে ভর সন্ধ্যায় হাওড়া গাছের নিচে পেত্নীর দৃষ্টি পড়েছে বাসন্তীদির ওপর। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। চুপচাপ বসে থাকে আর মাঝে মাঝে কী

যেন বিড়বিড় করে। বাসন্তীদির বাবা মা এসে নিয়ে গেল ওকে বাপেরবাড়ি। তারা খোঁজখবর করে ধরে আনল এক গুনিনকে। সঙ্গে একজন সাগরেদ। পরনে খাটো ধুতি, লাল জামা, বাবারি চুলের গুনিনের বেশ তাগড়াই শরীর। বাসন্তীদিকে এনে উঠোনে বসানো হল গুনিনের সামনে। গুনিনের সাগরেদ শুকনা ডালপালা দিয়ে ধুনি জ্বালাল। বাসন্তীদির এক আঙুলে সুতো প্যাঁচিয়ে বাঁধল গুনিন। ভূত তাড়ানোর মন্ত্র আউনোর মাঝে মাঝে ঝাড়ু দিয়ে মারছিল বাসন্তীদির মাথায়। ঝাড়ুর বাড়িতে কিংবা আঙুলের ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছিল বাসন্তীদি আর চিৎকার করছিল 'আমায় ছাড়' বলে। বাসন্তীদির চিৎকারে দ্বিগুণ উৎসাহে গুনিন পেত্নীর উদ্দেশে গালমন্দ করতে লাগল। উঠানে জড়ো হওয়া মানুষের মাঝেও বেশ চাঞ্চল্য। গুনিন ভূতকে শাসাল অকথ্য ভাষায়, অবিলম্বে বাসন্তীদিকে ছেড়ে না গেলে পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হবে। সুশীলা বাসন্তীদি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে বসে থাকা গুনিনকে মাড়ল এক লাথি। সেই লাথি লাগল গুনিনের মোক্ষম জায়গায়। 'বাপরে বলে' উল্টে পড়ল গুনিন! বাসন্তীদিও এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিল। ধাতস্থ হয়ে গুনিন জানাল, 'এ যে সে পেত্নী নয়! ডাকাত সুলতান মিঞার ফাঁসিতে মরা বিবি, একে তাড়ানো সহজ নয়।' পয়সা নিয়ে গুনিন বিদায় হল। উপায়ান্তর না পেয়ে ওর বাবা গুরুর পাদপদ্মে শরণ নিল। শিষ্যের আকুল প্রার্থনায় গুরুর আবির্ভাব ঘটল। বাবা শ্রীল শ্রীযুত বলভদ্র তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। রাত নিশিতে নিভৃতে বাসন্তীদিকে ঝাড়ফুঁক করলেন কিছুদিন। বাবার কৃপায় বাসন্তীদি স্বাভাবিক হয়ে উঠে বাবার সেবাযত্নে মন দিল। বাবার অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে শিষ্যরাও বিগলিত। কয়েকদিন পর হীরাদা এল বাসন্তীদিকে বাড়ি নিয়ে যেতে। জলের গ্লাস ছুঁড়ে বাসন্তীদি হীরাদার কপাল ফাটিয়ে দিল। রক্তে ভেজা জামাকাপড়ে হীরাদা একাই বাড়ি ফিরল।

উপসংহার ঃ বাসন্তীদির স্মৃতি আমার মনে চিরকাল অমলিন আছে। পরবর্তী জীবনে আমার ডাক্তারী মন বেদনায় ভরে উঠেছে এই ভেবে যে, সামান্য চিকিৎসায় বাসন্তীদির বিবাহিত জীবনের বিফলতাকে কাটিয়ে ওঠা যেত।

ডক্টর জি. ডি.

গদাই, নিমাই, কানাই ওরা তিন ভাই। পিতা মৃত ভবতারণ দাস, মাতা শ্রীমতী লাবণ্যবতী দাসী। সাং কেশপুর, সদর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ে তাদের গ্রাম। ভবতারণ দাস যখন মারা যান বড় গদাইয়ের বয়স তের কি চৌদ্দ। দশাসই তাগড়াই ভবতারণ ওলাউঠার একটা ধাক্কা কাটাতে পারেনি। সন্ধ্যায় ভেদবমি শুরু। ভোরবেলা নেতিয়ে গিয়ে সবকিছু শেষ। গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত কলেরা নামক মহামারিতে। শ্মশানে, কবরখলায় মৃতদেহের মিছিল। ডাক্তার বদ্যির বালাই নেই। আতঙ্কে সন্ধ্যা হতেই সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে 'হরিবলা বলহরি' ধ্বনি ওঠে। আতঙ্ক কাটাতে গ্রামের কিছুলোক সন্ধ্যা হলে খোল, করতাল, কাঁসর নিয়ে পাড়া ঘুরে কীর্তন গায় ওলাবিবিকে তাড়াতে। কোন বাড়ির মড়া পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরে দেখল আরও এক দু'জন মরে আছে। ফের শ্মশানযাত্রা যেন নিত্যদিনের ঘটনা।

ভবতারণের অকাল মৃত্যুতে অথই সাগরে পড়ল গদাইয়ের মা লাবণ্যবতী। সামান্য জমিজমায় তাদের সারা বছরের খোরাকি চলত না। তবুও আধপেটা খেয়ে বেঁচেবর্তে ছিল। এখন সহায় বলতে পাশে কেউ নেই। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে গদাইকে ওর পিসিমা সঙ্গে করে নিয়ে গেল সদর শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া। একজন ডাক্তারের বাড়িতে ওকে গৃহকাজে লাগিয়ে দিলেন। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া সুন্দর সুঠাম দেহের গদাই কাজকর্মে অচিরেই সবার মন জয় করে নিল।

বিনয় চৌধুরী এম বি বি এস পাশ ডাক্তার। সৌম্য দর্শন। সাধারণত প্যান্ট শার্ট পরেন। কখনও ধুতি জামা পরেও চেম্বারে বসেন, আবার এই পোশাকেই বাইরে রোগী দেখতে যান। দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা আসে। বিনয় চৌধুরী পুরনো রোগীদের সবাইকে নামেই চেনেন। রোগীদের ওর ওপর অগাধ আস্থা। বাহির বাড়ির রাস্তার পাশে বড় ঘরে রোগী দেখার চেম্বার। চেম্বারের পাশের ঘরে বসেন কম্পাউণ্ডার হরিপদ চক্রবর্তী। ঘরে কাঠের তাকে বড় বড় বোতলে রাখা বাঘা বাঘা নানান রঙের সলিউশান। এর অনেকগুলিই হরিপদবাবুর নিজের হাতে তৈরি বিভিন্ন কেমিক্যালের লবণ মিশিয়ে। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে প্রেসক্রিপশান নিয়ে রোগীরা হরিপদবাবুর কাছে আসে। বোতল থেকে একাধিক সলিউশান মিশিয়ে মিক্সচার তৈরি করে শিশিতে পুরেন। কাচি দিয়ে সাদা কাগজ কেটে মাপ তৈরি করে শিশির গায়ে সেঁটে দিয়ে রোগীকে বুঝিয়ে বলেন, দিনে কত দাগ খেতে হবে। ইনজেকশান দেওয়ায় হরিপদবাবুর জুড়ি নেই। কথার ফাঁকে ভুলিয়ে কখন যে সুঁই ঢুকিয়ে দেন—রোগী বুঝবার আগেই কাজ শেষ।

গদাই গৃহকাজের ফাঁকে ফাঁকে হরিপদবাবুর কাছে এসে বসে। তামাক সেজে হরিপদবাবুর হাতে তুলে দেয়। হরিপদবাবুর যাবতীয় ফাইফরমাস গদাই হাসিমুখে করে দেয়। তাছাড়া হাত পা ভাঙা রোগী, যারা সিভিল হাসপাতালে না গিয়ে বিনয়বাবুর চেম্বারে আসে তাদের প্লাস্টার করার প্রয়োজন হলে গদাই হরিপদবাবুর সঙ্গে হাত লাগায়। আজকাল ডাক্তারবাবুও গদাইকে কাছে রাখেন ছোটখাট অপারেশনে গরম জলে ছুরি কাঁচি সিদ্ধ করার কাজে। ছুরি কাঁচি ফরসেফ

এগুলো গদাই টেবিলে সাদা ঢাকনা পেতে তার ওপর সাজিয়ে রাখে। কখন ও .সও অপারেশনের সময় রোগীকে ধরেও রাখে ও ছুরি কাঁচি ডাক্তারবাবুর হাতে তুলে দেয়। একাজে গদাই মোটেও ভয় পায় না। বেশি দূরের গ্রামে রোগী দেখতে গেলে ডাক্তারবাবু গদাইকেও অনেক সময় সঙ্গে নিয়ে চলেন। একবার এক গ্রামে এক মহিলার পেট কেটে মড়া বাচ্চা বের করার সময় ডাক্তারবাবু গদাইকেও সঙ্গে রাখলেন সাহায্য করার জন্য। মেয়েদের গোপন অঙ্গ ছিল ওর ভাবনার জগতে। এভাবে সামনে পড়ে কয়েকদিন ওর মনের জগৎ একেবারে আওলা হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এক ডজনেরও বেশি লোকজন। এছাড়া লোকজনের আসা যাওয়া লেগেই আছে। আপন বলতে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ও দুই ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে সবার ছোট। বড় ছেলে কুমিল্লায় থেকে কলেজে পড়ে। বাড়ির বাকি লে নদেব কেউ ভাইপো, বোনপো, মাসতুতো, পিসতুতো সম্পর্ক যুক্ত। সবাই পড়াশুনা করে। রান্নার ঠাকুর রয়েছে। যদিও এক হাঁড়িতে সবার খানাপিনা তবু সবারই একটা আলস্য ভাব। সংসারের ও পোষ্যদের সবারই ধোপা, নাপিত, পুরোহিত সবকিছুরই হ্যাপা গদাইকে সামলাতে হয়।

গদাইয়ের মনে হল ইংরেজি লিখতে হবে নইলে জীবনে উন্নতি করা সহজ হবে না। বাংলা পড়তে ও লিখতে ও ভালই পারে। বাড়িতেও পরিচিতদের সে পোস্টকার্ডে ছোট ছোট চিঠি লিখে। রোজ একবার খবরের কাগজ পড়ে। গান্ধীজি, সুভাষবসু, জওহরলাল, চিত্তরঞ্জন দাসের নামও জেনেছে কাগজ পড়েই। ডাক্তারবাবুর মেয়ের পুরানো ইংরেজি অক্ষর শেখার বই জোগাড করে হরিপদবাবুর দ্বারস্থ হল ইংরেজি শিখতে। স্লেট পেন্সিল কিনে অক্ষর লিখা অভ্যাস কবল। কিছুদিনের মাঝেই ইংরেজি শব্দ বানান করে পড়তে শিখল। গদাইয়ের মন শয়নে স্বপনে ডুবে গেল ইংরেজি শব্দের আবর্তে। সামনে যা পায় আনাজপাতি, মশলাপাতি, গাড়ি, ঘোড়া, গরু-মহিষ, কাক-শালিক সবের ইংরেজি গদাইয়ের জানা চাই। ইংরেজি শেখার এই স্রোতে মাঝে মাঝে আটকে যেতে লাগলেন হরিপদবাবু—তার সীমিত ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে। ছাত্রের কাছে অপদস্থ হয়ে একদিন গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে দিলেন বাংলা থেকে ইংরেজি ডিকসেনারি। ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে ইংরেজি বাক্য শেখার বইও হরিপদবাবু জোগাড করে দিলেন। গদাইয়ের ইংরেজি শেখার কথা চাউর হয়ে গেলে ডাক্তারবাবুর বাড়ির লোকেরাও হাসি ঠাট্টায় গদাইকে ইংরেজিতেই ফাইফরমাশ কবতে লাগলেন। গদাইয়ের শেখার পেছনে একনিষ্ঠতা ছিল। কী যে আছে গদাইয়ের মনে! হরিপদবাবুর তাকে রাখা সমস্ত ওষুধের নাম গদাই মুখস্থ করে ফেলল। এমনকি ডাক্তারবাবুর লিখা প্রেসকিপসানে ওষুধের নামও গদাইয়ের পড়তে অসুবিধা হয় না। রোগীদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয় তাদের কী অসুখ কী অসুবিধা। ধীরে ধীরে গদাইয়ের খাতা ভরে ওঠে অসুখের নাম ও তার ওষুধের নামে। হরিপদবাবু একদিন ঠাট্টা করে বললেন, 'কি রে গদাই ডাক্তার হবি নাকি?'

দীর্ঘ চার বছর ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে গদাই আঠার বছর বয়সে পা দিল'। কিশোরের রুক্ষতায় প্রলেপ লাগল যৌবনের দীপ্তি। একদিন টিনের সুটকেসে জাপাকামড় গুছিয়ে ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, হরিপদবাবুকে প্রণাম করে গদাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

সজল চোখে সবাই গদাইকে বিদায় জানাল।

শহর ছাড়ার আগে প্রসিদ্ধ ওষুধের দোকান থেকে, দাম দিয়ে একটা স্টেথোস্কোপ কিনল, আর তৈরি করাল নিজের নামফলক ইংরেজিতে লিখা ডক্টর জে ডি। সাইনবোর্ড লিখার লোকটি অবাক হয়ে জানতে চাইল, পদবী কোথায়? গদাই অবলীলায় জানাল, ঘনশ্যামদাস বিড়লা যদি জি ডি বিড়লা হয় তবে গদাই দাস ও জি ডি। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে বুট জুতা, গলায় স্টেথোস্কোপ, টিনের সুটকেসে ডাক্তারি বিদ্যার খাতা, বাংলা থেকে ইংরেজি ডিকসেনারি নিয়ে গদাই নিজ গ্রামে পদার্পণ করল। ডাক্তারিতে পসার জমাতে গদাইয়ের খুব সময় লাগল না। তার গ্রাম ও আশপাশের কোন গ্রামে কোন ডাক্তার নেই। একজন কবিরাজ রয়েছেন যিনি হোমিওপ্যাথি ও আয়োর্বেদিক মিলিয়ে চিকিৎসা করেন। গদাইয়ের সব রোগে এক দাওয়াই ইনজেকশন। গদাইয়ের ইনজেকশন পেলে রোগ পালাবার পথ পায় না। রোগীরা ইনজেকশান পেলে নিশ্চিন্ত হয়। এ সময়ে ঘটল এক চমৎকার। মুসলমান পাড়ায় হাজি সৈমুদ্দিনের বাড়ি। হাজি সাহেবের বাড়িকে লোকে হাজিবাড়ি বলে, আবার কেউ কেউ কাওয়াবাড়িও বলে। বিরাট গোষ্ঠী। মুসলমানদের মাঝে মারামারি লেগেই আছে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক গোষ্ঠীর। হাজিবাড়ির সঙ্গে মারামারি লাগলে কাতারে কাতারে লোক বেরিয়ে আসে দা, বল্লম, সড়কি নিয়ে। সঙ্গে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকে না। পেছন থেকে সড়কি, এককাট্টা এগিয়ে দেয়। এহেন কাওয়াবাড়ির হাসমতকে বাগে পেয়ে ভিন গাঁয়ের মানুষ পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। পেটের ভিতরের সব মালমশলা বেরিয়ে এসেছে। খেতেই পড়ে আছে হাসমত। গদাইয়ের ডাক পড়ল। গদাই এসে নাড়িভুঁড়িতে হলুদ গুঁড়া মেখে পেটে ঢুকিয়ে সেলাই মেরে দিল। একমাস পর লাঙ্গল কাঁধে হাসমত খেতের দিকে রওনা দিল। চারিদিকে সাড়া পরে গেল। লোকেরা ধন্য ধন্য করল। গুরুজনেরা বলল, ধন্য গদাই, ধন্য তোমার মাতৃগর্ভ। ধন্য তোমার চিকিৎসাশাস্ত্র বিদ্যা। এক লাফে গদাইয়ের পসাব অনেক বেড়ে গেল। ডাক্তারিতে পসারের সাথে সাথে অর্থ আগমণের পথও প্রশস্ত হল—মিকচার, ট্যাবলেট, ইনজেকশন বেচে। ছোট কাঁচা ঘর বড় টিনের ঘর হল। তাও আবার ভিটা ও মেঝে পাকা। গদাই বিয়ে করল। দু'ভাইয়ের বিয়ে হল। বাড়িতে তিন বধূ। জমিজমা ছোট ভাই কানাই দেখাশুনা করে। জমির পরিমাণ বাড়ছে। মেজভাই নিমাই জাত ব্যবসা সিঁদল তৈরির গোলা বসাল। গ্রামে কার বাড়িতে কতটা সিঁদলের মটকা তাই দিয়ে বিচার হয় আর্থিক অবস্থা। গদাইয়ের বাড়িতে এর পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলল।

একদিন প্রকৃত অর্থে গদাই সাত গ্রামের মাঝে ডাক্তার জি ডি বনে গেল। সমাজে একজন মান্যগণ্যের স্থান দখল করা ওর বাসনা। মনোযোগ দিল তার একটা নিজস্ব ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে। সে অনুসারে কাজও শুরু হল। সন্ধ্যার পর রোগী দেখা বন্ধ হলে গ্রামের পাঁচজন মানুষ ডেকে চায়ের সান্ধ্য-আসর বসাল। লোকজনের আনাগোনা শুরু হল নেহাতই চা পানের লোভে। তারাই প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠল। এই আসরে গদাই ও তার পরিবার পরিজনেরা— তার মাতৃভক্তি ও নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি, অর্থের পরিমাণ বিষয়ে যথার্থ পরিচয় রাখার চেষ্টা

চালাল। ওর এই প্রচেষ্টার ফল হল মিশ্র।

অল্প বয়সে স্বামীহারা হয়ে তিন সন্তানকে নিয়ে সংসারের হাল টেনে গদাইয়ের মা লাবণ্যবতীর মনে কিছু ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে থাকবে। পুত্রদের আসকারা পেয়ে সে হয়ে উঠল পুত্রবধূদের কাছে জীবন্ত বিভীষিকা! কারণে অকারণে পুত্রবধূদের দৈহিক ও মানসিক পীড়ন ওর নিত্যদিনের কাজ। বৌরা শুধু একমাসের জন্য রেহাই পেত উঠানের কোণায় তৈরি ধাড়ির বেড়া একচালায় মাটিতে খড় পাতা বিছানায় যখন সন্তান প্রসবের জন্য ঢুকতেন। ভৈরববাজার থেকে এক সপ্তাহের খবরের কাগজ গদাই সংগ্রহ করায়। সমস্ত গ্রামের অন্য কেউ খবরের কাগজ পড়ত না। খবরের কাগজ থেকে দেশের বিভিন্ন খবরের সাথে গদাইয়ের সংযোজন, সান্ধ্য আসরকে জমিয়ে দেয়। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। তাদের জীবন— মাছ ধরা, মাছ বিক্রি, গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থার মাঝেই সীমিত। দেশের হালহকিকৎ জানার কোন আগ্রহ বা অবসর তাদের নেই। একজন জ্ঞানী মানুষ হিসাবেও গদাইয়ের নামডাক ছড়াল। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে পেলেই গদাই ডাক্তার তাদের ইংরেজি জ্ঞানের পরীক্ষা নিত। এতে ছেলেমেয়েরা পারত পক্ষে গদাইয়ের কাছে ভিড়ত না। মেজভাই নিমাই ব্যবসায় আয়তন বাড়িয়ে আগরতলা পর্যন্ত বিস্তৃত করল ও সেখানে বাড়ি বানাল পরিবারের ছেলেমেয়েদের থাকার ও পড়ার সুযোগ হবে বলে। গদাই নিজের বিষয়আশয়ের একটা আভাস শ্রোতাদের দিত, ফলে কিছু মানুষ ঈর্ষান্বিত হল। তারা রটাতে শুরু করল গদাই মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে টাকা লুটছে। গ্রামের কারও উন্নতিতে গদাইয়ের খুব জ্বলন হয়। অন্যের নিন্দা রটনায় তার জুড়ি মেলা ভার।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের ছেলে পড়াশুনায় ভাল। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে রেলে চাকুরি পেয়েছে। একদিন সিলেট জেলার বিলের মালিক এক ধনী ব্যক্তি পানসি নৌকায় চড়ে গ্রামে এলেন শিক্ষক মশাইয়ের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। গ্রামে একটা সাড়া পড়ে গেল। পরে জানা গেল ছেলের নিজস্ব কোন পছন্দ থাকার কারণে বিয়ের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত এগোয়নি। গদাই ওর সান্ধ্য আসরে একটি বিস্ফোরক তথ্য পরিবেশন করল। শিক্ষক মশায়ের ছেলে নাকি কলকাতায় ব্রোথেলে যায়। ইংরেজি শব্দটার অর্থ বয়স্যরা বুঝতে পারেনি বলে ওদের কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। অর্থ জিজ্ঞেস করলে অন্যরা গর্দভ ভাবতে পারে মনে করে চুপটি করে বাড়ি ফিরল। এদের একজনের মাথা থেকে শব্দটা মুছেনি। আধা শিক্ষিত দু'একজনকে জিগ্যেস করে মর্ম উদ্ধার করা গেল না। জমি সংক্রান্ত ঝামেলায় ওকে সদর শহরে কাছারিতে যেতে হয় উকিলবাবুর কাছে। হাত কচলে উকিলবাবুকে জিগ্যেস করল ব্রোথেল এর মানে কী? উকিলবাবু থতমত খেয়ে তাকাল ওর দিকে। বুঝতে চেষ্টা করল লোকটা কী ধরনের ইয়ার্কি মারছে। প্রশ্নকর্তার ভাব দেখে মনে হল, না কোন বদ উদ্দেশ্য নয়। চলতি ভাষায় ওকে কথাটার মানে বুঝিয়ে বলল। শুনে লজ্জায় কান গরম হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি উকিলবাবুর কাছে থেকে বেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। গ্রামে ফিরে আসার পর এক কান থেকে চার কান হয়ে সারা গ্রামেই চাউর হল কথাটা। মাস্টার

ও গদাই দুই গোষ্ঠীর মাঝে কয়েকদিন ঠাণ্ডা লড়াই চলে একদিন থিতিয়ে গেল। গদাইয়ের স্বভাবের ইতরবিশেষ হল না। ঈর্ষা পরায়ণতা ওর বেড়েই চলল।

বিশুর বাড়ি গ্রামের পুব পাড়ায়। বিশু ছয় ফুট লম্বা, বগার মত দুটি সরু ঠ্যাং, গালের চোয়ালের হাড উঁচু, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। বিশুর বাবার বেশ কিছু জমিজমা আছে বলে বিশুকে কাজকর্ম বিশেষ করতে হয় না। খোল বাজানো বিশুর শখ ও নেশা। গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে সে কীর্তনের দল গড়েছে। কীর্তনের দল নিয়ে সে দূর গ্রামেও পাড়ি দেয়। শোনা যায় বিশুর দল যখন কীর্তন গায় তখন ভক্তদের কৃষ্ণভাব এসে যায় এবং অনেকেই ভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ধুতি বিশুর হাঁটুর সামান্য নিচে আসে। বা হাতে জুতা জোড়া নিয়ে অবলীলায় মেঘনার পার ধরে বিশ ক্রোশ হেঁটে বিশু চলে যায় বাজেশিবপুর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বাড়ি। যদিও খাঁ সাহেব গ্রামে থাকেন না, কিন্তু বাড়ির অনেকেই সংগীত চর্চা করেন। বিশুর রাগরাগিনীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার তালিম তাদের কাছেই। কোন রাগ কোন সময়ে গাইতে হয় সেই অনুসারেই অহোরাত্র কীর্তনে তার দল কীর্তনের সুর ঠিক করে।

সবাই এসে বিশুকে ধরল গদাই ডাক্তারকে একটু টিট করতে। বিশু গদাইয়ের সান্ধ্য আসরে মাঝে মাঝে আসে। গদাইয়ের স্বভাব ও প্রাত্যহিক চলাফেরা বিশুর মোটামুটি জানা। গদাই যে ঘরে ঘুমোয় তার থেকে প্রকৃতির ডাকের সাড়া দেওয়ার স্থানটি একটু দূরে। অন্ধকার রাতে কর্মটি সেরে ঘরে ফেরার পথে গদাই ডাক্তার পড়ে গেল দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ানো আকাশছোঁয়া ব্রহ্মদৈত্যের সামনে। শুধু একটু গোঙানি, গদাই একেবারে কুপোকাৎ। ঘরে ফিরতে দেরি দেখে গদাইয়ের বৌ বেরিয়ে এসে দেখল গদাই মাটিতে পড়ে আছে। ওর চিৎকারে বেরিয়ে এল বাড়ির ও আশেপাশের লোকজন। গদাইয়ের লুঙ্গি নষ্ট, দাঁত কপাটি লেগে আছে। ধরাধরি করে বারান্দায় এনে কাপড়-চোপড় বদলে বিছানায় তোলা হল। জ্ঞান হলে দেখা গেল বাঁদিক একটু অবশ। বেশ কিছুদিন বিছানায় থেকে গদাই যখন উঠল তখন বাঁ পায়ে জোর কম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। গ্রামের কচিকাঁচারা আড়ালে বলে, ডক্টর এল-ডি (ল্যাংড়া ডাক্তার)। বিশু মাঝে মাঝে আসে গদাই ডাক্তারকে দেখতে। ওর সঠিক উদ্দেশ্য কী ঠিক বোঝা যায় না। তবে কী ভেবে ও রণপাগুলো ও কেভেণ্ডার সিগারেটের লম্বা ডোরাকাটা পাজামা সহ সাময়িক ওপরে তুলে রেখে দিয়েছে।

স্মৃতি বেদনা

ডোলা হাতে মেঘনা নদীর পাড়ে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে হারান দেখছিল সদ্য ডিমফোটা লাটি, পুঁটি চাঁদা মাছের পোনারা উজান বেয়ে খাঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। সাথে ছোট ভাই থাকলে দু'জনে গামছা দিয়ে পোনা মাছ ধরে। রোজ সকালে হারান নদীর পাড়ে অপেক্ষা করে, বাবা ও কাকার সারারাত নদীতে মাছ ধরে সকালে ঘাটে ফেরার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারানের সময় কেটে যায় নদীতে চলা স্টিমার পালতোলা গয়না নাও, দাঁড় বেয়ে চলা ডিঙি নৌকা,গুণটানা সরঙা নাও এর চলাফেরা দেখে। সকালের এই সময়টায় নদীর পাড়ে ভিড় করে, গাঙচিল, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, পাতিকাক, সাদা ও ধূসর রঙের বকের ঝাঁক। এদের প্রত্যেকের মাছ শিকারের কায়দা আলাদা আলাদা। গাঙ চিল আকাশে চক্কর দিয়ে ছোঁ মেরে পায়ের নখ দিযে ধরে ফেলে জলের ওপর ভেসে ওঠা মাছ। পানকৌড়ি ডুব দিয়ে ভেসে ওঠে ঠোটে মাছ নিয়ে। মাছরাঙা ঘাপটি মেরে বসে থাকে—নদীতে পোঁতা বাঁশের ডগায় জলের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে—ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে শিকার নজরে এলে। বকেরা জলে পা ডুবিয়ে লম্বা ঠ্যাং ফেলে ধাওয়া করে ছোট মাছের পিছনে। কখনও বা চোখ বুজে এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে যেন বিড়াল তপস্বী।

হারানদের গ্রাম মেঘনা নদীর পূর্বপাড়ে। ভৈরববাজাব ও আশুগঞ্জকে যোগ করা এগুারসন সেতু থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে। মেঘনার বিস্তার ওর গ্রামের পাশেই সবচেয়ে বেশি। গ্রামের নাম কেশপুর। বিরাট জনবসতি। সাত থেকে আটশ' পরিবারের বাস, যাদের বেশির ভাগেরই জীবিকা নদীতে মাছ ধরা, মাছ ও শুটকি বেচা। কিছু অংশের মানুষের জীবিকা চাষবাস। গ্রামের মুসলমানরা প্রধানতই চাষি ও মজুর। তাছাড়া ছোট বড় নৌকা তৈরি, জালবোনা যা সাধারণত মেয়েরাই করে থাকে, জালে গাবের কষ দিয়ে জলের উপযোগী করা, এসব ছোটখাট কাজেও রোজগার হয়। পশুপালন হয় প্রায় সব বাড়িতেই। হারানের বাবা ও কাকা ইলিশমাছ ধরার জাল বাওয়া নৌকায় জনমজুর। বর্ষার অন্তত চার মাস একাজ নিশ্চিত। বছরের অন্য সময়ে কাজ অনিয়মিত। আংশিক কৃষিশ্রমিকের কাজ নতুবা হাটে ঘুরে শুটকি বেচে কোনভাবে একবেলা হলেও ভাত সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। মাথাব ওপর ছাউনি বলতে একটাই ছনের তৈরি ঘর, তরজার বেড়া, মাটিতে চাটাই পেতে শয্যা, শীত নিবাবণের ছেঁড়া কাঁথা। ঘবের কোণের দিকে পাটের দড়িতে বানানো সিক্কায় ঝুলানো মাটির হাঁড়িতে বাখা সংসারের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র। রান্নার আসবার বলতে ম'টির হাঁড়ি পাতিল। থালা বাসনের মাঝে সাদা রঙের কালাই করা টিনের থালা।

বাবা কাকা ঘাটে এলে ডোলায় করে ঘরে খাওয়ার মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে ডোলা সপে ঘরের কোণায় বেড়ায় আটকানো কাঠের তক্তায় বাখা বই নিয়ে হারান পড়তে বসল। হারানের বয়স এগার কি বার। অপুষ্টিতে রোগা অস্থিসার দেহ। গায়ের রঙ কাল কিন্তু চোখ দুটি মায়াবি। গলায় কাল কাইতনে ঝুলানো একটা কানাকড়ি। পবনের কাপড় বলতে

একটি মাত্র গামছা। এটা পরে খালি গায়ে সে স্কুলে যায়। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশুনার প্রতি ওর আগ্রহ জন্মেছে ওদের বাড়ির কয়েক বাড়ি পরে মামার বাড়ির মামাত ভাইবোনদের লেখাপড়া করতে দেখে। মামার গোষ্ঠীর এক মামা এন্ট্রান্স পাশ। পাঁচ গ্রামের মাঝে প্রথম এন্ট্রান্স পাশ। সেই মামার বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথে থেকেই ওর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। পঞ্চম শ্রেণির পর হারানের পড়াশোনার আর কোন সুযোগ রইল না। ওদের গ্রামের বিশ ক্রোশের মধ্যে উচ্চবিদ্যালয় নেই। পড়তে গেলে ওকে বাড়ির বাইরে যেতে হবে এবং বাইরে গিয়ে থাকা খাওয়ার সংস্থান করা ওদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। বাড়িতে ওর ছোট আরও তিন ভাই ও এক বোন। এত লোকের দু'বেলা অন্ন যোগান দিতেই পরিবার হিমশিম। তাছাড়া হারানের কাকার বিয়ের বয়স হতে চলেছে। পণের টাকা জমাতে না পারলে ঘরে বউ আনতে পারবে না। হারানের কান্নাকাটিতে বিচলিত হয়ে ওর মামা নরসিংদি গঞ্জে এক বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। নিরক্ষর বাবা আশা করছিল হারান কোন মহাজনের গদিতে কাজে ঢুকলে সংসারে একটু সহায় হবে।

একদিন পুঁটলিতে এক জোড়া জামা প্যান্ট নিয়ে হারান রেলগাড়িতে চড়ে বসল নরসিংদির উদ্দেশে। জীবনের প্রথম রেলে চড়া। মন আনন্দ ও বিষাদে মাখা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ওর উচ্চবিদ্যালয়ের পড়া শুরু হল। অপ্রত্যাশিতভাবে ওর জীবনে আবারও অনিশ্চয়তা নেমে এল অষ্টমশ্রেণিতে পড়াকালীন। দেশ স্বাধীন হল বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে। পূর্ব বাংলার সমগ্র হিন্দু সমাজ ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এমন মর্মান্তিক রূপে আসবে কেউ ভাবেনি। মুসলমানদের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উল্লাস, 'নারায়ে তকবির, আল্লাহো-আকবর' ধ্বনি। কিছুকাল পর শুরু হল সারা পূর্ববাংলা জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আজন্মের বাসভূমির শিকড় আলগা হয়ে গেল হিন্দুদের। দেশত্যাগের হিড়িক লাগল চারিদিকে। ছিন্নমূল মানুষের ভারতমুখী স্রোতে ভিড়ল হারানের আশ্রয়দাতা পরিবারটিও। হারান তখন স্কুলের শেষ মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে। কলেজে পড়ার আশা ও প্রায় ছেড়েই দিত যদি না ভাগ্য একটু সহায় হত। ওর ব্যবহার ও স্বভাব ওখানকার অনেকেই ওকে পছন্দ করত। একটি স্বচ্ছল ব্যবসায়ী পরিবার বাড়ির আন্ডাবাচ্চাদের পড়ানোর বিনিময়ে হারানকে তাদের বাড়ি থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল এবং এই ব্যবস্থা কলেজে চার বছর পড়ার পুরো সময় স্থায়ী হল। জীবনের এই পর্যায়ে একটা অন্য ধরনের অনুভূতিতে গ্লানিবোধ করত। আগে হারান কখনও বর্ণভেদ নামক সামাজিক ব্যাধির সম্মুখীন হয়নি। নতুন আস্তানায় অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি হারানের ছিল না, যেহেতু সে জাতিতে জেলে অর্থাৎ নিম্নবর্ণ। বাড়ির বাইরের ঘরে ছিল থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। বাড়ির লোকজনের সাথে এক পঙতিতে বসে খাওয়ার সুযোগ চার বছরে কখনও ঘটেনি। মনে গ্লানিবোধ থাকলেও হারান পরম কৃতজ্ঞতায় ওদের ঋণ ভুলেনি পরবর্তী জীবনে ওদের প্রয়োজনে। স্কলারশিপ ও টিউশনের দৌলতে বি কম পাশ করার মত একটা আশ্চর্য ঘটনা হারানের জীবনে ঘটল। জীবনের এইটুকু পরিধিতে ওর অনুভবে অনেক হারাল যা আর ফেরানো যাবে না। ছোট ভাই বোনদের কারোর লেখাপড়া হল না দারিদ্রতার কারণে।

সংসারের প্রতি মা ছিল উদাসীন। সাথে ধর্মীয় উন্মাদনা মিশে তাকে নিয়ে যায় অন্য এক ভাবের জগতে। বিয়ে করতে না পারায় এক কাকা বিবাগি হল। হারান সরকারি চাকুরি পেল। ঢাকা শহরে অফিস। বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠায়। ছোটবোনেরও বিয়ে দিল। ওপরে ওঠার কোন সুযোগ সে হাত ছাড়া করেনি। চাকুরি করাকালীন ও প্রস্তুতি নিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার। প্রথমবারেই পাশ করে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিল।

মা অসুস্থ। তার পেয়ে বাড়ি এসে শুনল ওর বিয়ে ঠিক। বিয়ের ব্যাপারে ওর বাবা পাত্রীর বাবাকে পাকা কথা দিয়েছেন। ঘটনা হল ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য একদিন হারানের বাবাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। উনি চতুর্থ শ্রেণি অব্দি পড়া ওর শ্যামলা মেয়েকে সামনে এনে হারানের বাপকে প্রণাম করিয়ে হারানের সাথে মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্ত জানালেন। মেম্বারের কাছ থেকে এত বড় সম্মান ওর কাছে কল্পনাতীত। অন্য পাঁচ জনের সমানে পাকা কথা দিয়ে কিছু সুপরামর্শ নিয়ে বাড়ি এলেন। হারান খুব নিরাশ হলেও ঝামেলা এড়াতে বিশেষ উচ্চবাচ্য না করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে গেল। নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঢাকায় সংসার পাতল। কর্মক্ষেত্রে হারান সুনামের সাথে কাজ করছে। সিভিল সার্ভিসে হিন্দুদের সংখ্যা হাতে গোনা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হয়েও হারানকে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৯৪ ইং সনে ফের শুরু হয় দাঙ্গা। এবার দাঙ্গাকারীরা আরও সংগঠিত। তাই পরিকল্পিতভাবে চলল নিধন যজ্ঞ ও নারী অপহরণ। মৃতের সঠিক সংখ্যা প্রশাসন প্রকাশ করেনি। দাঙ্গা যেদিন শুরু হল হারান অফিস থেকে একটু আগেই ফিরে এসেছিল। অনেকদিন একই পাড়ায় থাকায় পরিচিতের সংখ্যা বেড়েছিল, তাই সরকারি আবাসে ও যায়নি। সেদিন ছিল ও বাড়িতে একা, কারণ দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের আগে ওর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। হন্তদন্ত হয়ে অফিসের এক অধঃস্তন সহকর্মী রফিক সাহেব বাসায় উপস্থিত। প্রায় টেনে নিয়ে চললেন রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িতে। কোনভাবে ঘরে তালা দিতে পেরেছিল। রফিক সাহেব গাড়িকে টঙ্গির দিকে যেতে বললেন। গাড়িতে বসে হারান আভাস পেল কী ঘটতে যাচ্ছে। ততক্ষণে দাঙ্গাকারীরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। সামনে পেছনে 'আল্লাহো-আকবর' চিৎকার। ঘুরপথে টঙ্গিতে পৌঁছে এক বাড়িতে ঢুকে রফিক ওর খালার হাতে হারানকে সঁপে বিদায় নেওয়ার আগে শুধু বলল, 'দাসসাহেব, এখানে বাঁচতে না পারলে আর কোথাও পারবেন না।' অচেনা, অজানা পরিবেশে সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কের দিনগুলির কথা মনে এলে আজও মন শিহরিত হয়। ভোলা যায় না খালু ও খালাকে, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওকে আগলে রেখেছিল পরম আশ্বাসে। চতুর্থদিনে শহরে সেনা নামানো হল দাঙ্গা দমনে। পরিস্থিতি একদিনেই নিয়ন্ত্রণে এল। পরদিন রফিক সাহেব এলেন গাড়ি নিয়ে। রফিক ইতিমধ্যে হারানের বাসায় ঘুরে এসেছে। সবই লুটপাট হয়ে গেছে। ঘরে একটা কিছু নেই। তাই মানা করেছে হারানকে বাসায় ফিরে যেতে। পাঁচ দিন হারান একই কাপড়ে।

বাসায় ফিরে পাঁচদিন পর স্নান সেরে অফিসে এল। ড্রয়ার থেকে চেকবুক নিয়ে রফিকের সাথে ব্যাঙ্কে এসে যা টাকাপয়সা ছিল তুলে নিল। সচিবালয়ে এসে অর্থসচিবের সাথে দেখা করে কয়েকদিনের ছুটি নিল। সচিব অনেক সহানুভূতি দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। সরকারি গাড়িতে

হারানকে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়ি ফিরে দু'দিন পর একমাসের শিশুসন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলায় এসে মামাত ভাইয়ের বাড়ি উঠল হারান।

ও এন জি সি সদ্য আগরতলায় এসে কাজ শুরু করেছে। একদিন কাজের খোঁজে দেখা করলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ওদের লোকের প্রয়োজন ছিল। তাই রোজকার ভিত্তিতে কাজ পেল। আপন দক্ষতায় যেখানে স্থায়ী চাকুরি পেয়ে শিবসাগর চলে গেল। চাকুরি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে সততা বজায় রাখতে পেরেছিল। নিজের জীবনে লেখাপড়া করতে যে কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেয়েছিল—তিন ছেলে মেয়ের জীবনে সেগুলো স্পর্শ করেনি। তাছাড়া সংস্থা হিসাবে ও এন জি সি কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশোনার ঢালাও সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে সব ছেলেমেয়েকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে হারান দাস গুজরাটে বাড়ি করে স্থিত হল। ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে।

জীবনে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে পায়ের তলার মাটি যখন শক্ত হল সারাজীবনে অনুভূত গ্লানিও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। চলার পথে হারান ঢাকাতেও দেখেছে দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সমাজের ওপরতলার মানুষের ঘৃণা, অবহেলা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে। গুজরাটের দাঙ্গায় মতলববাজেরা সমাজের দরিদ্রশ্রেণির নিম্নবর্ণের মানুষকে উত্তেজিত করে এগিয়ে দিয়েছে দাঙ্গাকারীদের সামনের সারিতে। দাঙ্গা লাগলে নিম্নবর্ণের মানুষও হিন্দু হয়। হারান নিজের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে ওদের ইচ্ছানুসারে ও পছন্দে। বর্ণ ও প্রাদেশিকতা বাধা হয়নি বিব্রত হওয়ারও কোন কারণ হয়নি। হারান নিজে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়ার কয়েক বছর পর ওর বাবা ও মা গত হল। তাদের অন্তিম শয্যায় আগে ও পরে উপস্থিত হতে পারেনি হারান। ভাইরাও সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছে ত্রিপুরায়। তাদের আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেও সচেষ্ট ছিল। পরিবার পরিজনদের পেছনে ফেলে নিজের ওপরে ওঠার বেদনা মনের কোণে পুঞ্জিভূত ছিল। এ বেদনা ওকে পীড়া দেয়। বুকফাটা কান্না নিয়ে বারবার ফিরে আসে অতীত।

জয়তী

কথায় বলে বাঙালির বার মাসে তের পার্বণ। তার সাথে সংযোজন হয়েছে বইমেলা। সংস্কৃতি মনস্ক বাঙালির হৃদয়ের আবেগ জড়িয়ে গেছে বইমেলাকে ঘিরে। বইপ্রেমী, পাঠক, লেখক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা সবারই এক মিলনক্ষেত্র। দল বেঁধে যুবক-যুবতীদের বইমেলার প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া সামাজিক সুস্থতার লক্ষণ। কিশোরী মেয়েটি এসেছে বইমেলায় বান্ধবীদের সঙ্গে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক কমল বসু আজ পাঠকদের মুখোমুখি হবেন। কমল বসুকে চাক্ষুস দেখা এবং ওনার সাথে কথা বলার সুযোগকে কিশোরীটি তার জীবনে অভাবনীয় ঘটনা বলে বোধ করছে। কমল বসুর লেখার ও একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা। কমল বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কচিপাতা'য় প্রচলিত সামাজিক নীতিকে যেভাবে ভেঙে চুরমার করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্নমালা ও মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিল। কিশোরীটির প্রশ্ন শুনে খুশি হলেন কমল বসু। একঝাঁক শ্রোতার মাঝে মেয়েটির প্রতি কমলবাবুর দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল ওর বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি ও মুখে জ্যোৎস্নামাখা লাবণ্য দেখে। অনুষ্ঠান শেষে কমল বসুর লেখা একটি উপন্যাস ওর সামনে ধরল সইয়ের জন্যে। বইটা হাতে নিতে নিতে শ্রীবসু জানতে চাইলেন মেয়েটির নাম। জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টি সুরে বলল মেয়েটি। সই করার আগে কমল বসু বললেন, 'আমি যা লিখি তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি। তোমার জীবনে সৌন্দর্য দীপশিখার মত চিরকাল প্রজ্জ্বলিত থাকুক' লিখে সই করে দিলেন।

সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করে শিল্প জগতে জয়তীর পদার্পণ বুকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। ওর বাবা তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য জগতের একজন বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি। মেয়ে জয়তীও চিত্রকলার পাশাপাশি অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ও নিয়মিত অভিনয় করে। মেয়েদের সৌন্দর্যের মাপকাঠি নাক, মুখ, চোখ, রঙ, চুল দেহের গড়ন সেগুলি সব জুড়ে জয়তীকে পটের বিবি বলা যাবে না। বরঞ্চ ওর নাক সামান্য চাপা, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, শাড়ির আড়ালে প্রচ্ছন্ন বুকের আদল পুরুষ্ট, ক্ষীণকাটি, মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে গড়ে ওঠা ওর ব্যক্তিত্ব ওকে আলাদা সৌন্দর্যময়ী করেছে। ছেলেদের চোখের মুগ্ধতা দেখে বোঝা যায় ওর প্রতি তাদের অপরিসীম আগ্রহ।

সুঠাম দেহ, সৌম্য চেহারার সুজয় গুপ্ত জয়তীর বন্ধু। ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করে হৃদয়াবেশের দিকে মোড় নিচ্ছে। সুজয়ের সঙ্গ জয়তীর খুব ভাল লাগে। ভিড়ের মাঝে পাশাপাশি হেঁটে চলা, কোথায়ও দু'দণ্ড বসে চানাচুর চিবোতে চিবোতে খুনসুটি করা, সময় কেটে যায় স্রোতের বেগে। কলেজের পড়া শেষ করে চাকুরির আশায় কিছুদিন কাটিয়ে সুজয় এখন ঠিকাদারি করে। নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই। যখন যা সামনে আসে। কথাবার্তায় মনে হয় রোজগারপাতি ভালই। জয়তীর মন সদা উদগ্রীব হয়ে থাকে সুজয়ের দেখা পেতে। সুজয়ের এতটুকু ছোঁয়া ওর দেহে মনে ঢেউ তুলে। আড়ালে আবডালে সুজয় দৈহিক ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে জয়তী খুব বাধা দিতে পারে না, কারণ ওর সেটা ভালই লাগে। মনে হয় সুজয়কে অদেয় ওর কিছু নেই।

ভালবাসা, ভাললাগার এই পর্বে বিপত্তি এল জয়তীর পরিবার থেকে। জয়তীর বাবার চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। বিয়ের উপযোগী দুই মেয়েকে নিয়ে উনি উদ্বিগ্ন। অন্তত চাকুরি থাকাকালীন এক মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলে অনেকটা স্বস্তি। একটি বিয়ের প্রস্তাব আসায় উনি অত্যন্ত উৎসাহিত। বিয়ের বাজারে পাত্রটি সোনার টুকরো। সর্ব ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে রয়েছে। তারানাথবাবুর পারিবারিক বন্ধুর ছেলে। মনে ইচ্ছে থাকলেও আগে তারানাথবাবু সাহস করে বলতে পারেননি। এখন ছেলের বিশেষ ইচ্ছেতেই ওরা প্রস্তাব দিয়েছেন। পাত্রের বাবা উমানাথ ভট্টাচার্য নিজে এসে একদিন কথাবার্তা বলে গেলেন। বিয়ে করবে না বলে বেঁকে বসল জয়তী। স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেখাতে পারল না। ছোট মেয়ের মাধ্যমে তারানাথবাবু জানলেন নেপথ্য নাটক ও তার কুশীলবদের পরিচয়। খুবই নিরাশ হলেন। প্রথমে রাগ, পরে অভিমান ভরে কয়েকদিন চুপ মেরে রইলেন। স্ত্রী বিয়োগের পর ওর একলার ঘাড়ে পড়েছে দুই মেয়ের পুরো দায়িত্ব। ধীরে ধীরে যতটুকু ওর কানে এল তাতে তারানাথবাবু জানলেন মেয়ের পছন্দ করা ছেলের বাবা ধীমান গুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সরকারের রাজস্ব দপ্তরের করণিক ছিলেন। উপরি রোজগারের সুযোগ নিয়ে চাকুরিকালে বাড়িঘব পাকা করেছেন। দুই ছেলের জন্য মোটরবাইক কিনে দিতে পেরেছেন। সুজয় কী এবং কোন ধরনের কাজকর্ম করে সেগুলো জানার কোন স্পৃহা তারানাথবাবু অনুভব করেননি। ধীরস্থির ভাবে কয়েক দিন ভেবে মেয়ের পছন্দকেই মর্যাদা দেবেন বলে স্থির করলেন।

সামাজিক মতেই জয়তীর বিয়ে দিলেন। খরচপাতিও করলেন সাধ্যের বাইরে গিয়ে। লৌকিকতা পূরণ করে এক মেয়ের বিয়ে দিতেই তারানাথবাবুর সারাজীবনের সঞ্চয়ের বেশির ভাগই বেরিয়ে গেল। বিয়ের পর সংসারের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না সুজয় ও জয়তীর জীবনে। প্রথম তিনটি মাস আচরবিহীন রঙীন প্রজাপতির ডানা মেলে ভেসে গেল মধুর আবেগ নিয়ে। চতুর্থ মাসে জয়তী বুঝল ও সন্তান সম্ভাবা। অনাগত মাতৃত্বের শিহরণ তার সাথে শারীরিক অসুস্থতা জয়তীকে এক মানসিক ঘোরের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেছে। ও খুব আশ্চর্য হল সুজয়ের নিস্পৃহতায়। সুজয় একদিন বাইরে থেকে ফিরে বলল, 'সমস্ত খোঁজখবর নিয়েছি, মণ্ডল নার্সিংহোমে একটু বেশি খরচ হলেও সামান্য কতক্ষণের ব্যাপার। কাল সকালেই চল আপদ দূর করে আসি।' সুজয়ের এই মানসিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেল জয়তী। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিল ওর সন্তানের পৃথিবীতে আসা ওর জীবনের এক চরম প্রাপ্তি। কোন ধরনের বাধা ও সহ্য করবে না। দুঃখ পেলেও জয়তী ভেবেছে এ ধরনের ভাবনা হয়ত বা ছেলেদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কল্পনা করেনি ওর জীবনে নেমে আসা কঠোর আঘাত। সুজয়ের ছোট ভাই সুমন বৌদিকে শুনিয়েই মাকে বলল, 'দাদার কীর্তিকলাপে বাইরে মুখ দেখানোর উপায় নেই। আমি এই বাড়ি ছাড়ছি। এখানে থাকা আমার মনের বিরুদ্ধে লড়াই।' সুমন এক ওষুধের কোম্পানির সেলসম্যান-এর কাজ নিয়ে গৌহাটি চলে গেল। জয়তী জানতে চাইলে সুজয় ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তড়পাল, 'দু-

পয়সার চাকুরি নিয়ে ও সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আমি ওর টেরি গুঁড়িয়ে দেব। তখন টের পাবে কত ধানে কত চাল!' সুমন টের না পেলেও জয়ন্তী টের পেল কয়েক দিনের মাঝেই। একজন ছেলে এসে বাড়িতে খবর দিয়ে গেল সুজয় হাসপাতালে ভর্তি। বেহাল অবস্থা। মারামারিতে আহত হয়েছে। জয়ন্তী শাশুড়িকে নিয়ে ছুটে গেল হাসপাতালে। সুজয়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ, শরীরের নানান জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। অচৈতন্য, স্যালাইন চলছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানল, জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না। বেডের কাছে পুলিশ প্রহরা। সারারাত হাসপাতালের বারান্দায় কাটিয়ে সকালে চেতনা ফিরেছে খবর জেনে বাড়ি ফিরল শাশুড়ি ও বৌ। সকালের কাগজে প্রথম পাতায় ছবিসহ সংবাদ শিরোনাম 'এলাকা দখলের লড়াইয়ে সমাজদ্রোহী সুজয় গুপ্ত আহত হয়ে হাসপাতালে।' ভেবে জয়ন্তী কূলকিনারা পেল না, তার জীবনে একি ঘটল। সকালেই ওর বাবা এলেন ছোটবোনকে সঙ্গে নিয়ে। বাবার সামনে মাথা তুলে কথা বলতে সঙ্কোচ হল। বাবা ওকে আর কি সান্ত্বনা দেবেন। কিছু টাকা জয়ন্তীর হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় নিলেন। হাসপাতালে সুজয়কে দেখতে তারানাথবাবু কখনও যাননি। দুবেলা বাড়ি, হাসপাতাল, সাথে ওষুধ পত্তরের খরচ। খরচ মেটাতে শ্বশুরের জমানো টাকায় হাত। গুজুর গুজুর শুনতে হল জয়ন্তীকে। প্রায় কুড়িদিন হাসপাতাল কাটিয়ে সুজয় বাড়ি এল। বাড়িতে সুজয়ের সঙ্গীদের আনাগোনা ও ফিসির-ফিসির জয়ন্তীর কাছে অসহ্য লাগলেও কিছুটা আঁচ পেল সুজয়ের জীবনধারার।

সহজে হাল ছেড়ে দেবে না বলে জয়ন্তী, মানসিক প্রস্তুতি নিল। আশ্চর্যজনক ভাবে জয়ন্তীর প্রতি ওর শাশুড়ির স্নেহ, সহানুভূতি একান্ত আন্তরিক। শাশুড়ি ওর হাত ধরে মিনতি করল, ' বৌমা তুমি চেষ্টা করলে হয়ত ওকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসতে পারবে।' জয়ন্তীর মনে একটা কথা রিনরিন বাজতে লাগল, যেভাবেই হোক নিজের সংসারকে বাঁচাতে হবে অনাগত সন্তানের ভবিষ্যত ভেবেও। একটু ধরাধরি করে জয়ন্তী একটি বেসরকারি স্কুলে স্থির বেতনের কাজ পেল। যদিও টাকা খুব কম, কিন্তু স্কুলের সাথে যুক্ত থাকায় টিউশন পেতে খুব সুবিধা হল। এক আত্মীয়ের সুপারিশে সুজয়ের জন্য ফায়ার একসটিং অফিসার এর এজেন্সি জোগাড় করল। শাশুড়িকে বলে কয়ে শ্বশুরের কাছে থেকে কিছু টাকাও ব্যবস্থা করল মূলধন হিসাবে। কাজটায় ভবিষ্যত রয়েছে খাটতে পারলে। কিছুদিন সুজয় চেষ্টা করল মনোযোগ দিয়ে। সময় মত বাড়ি ফেরা, সংসারের টুকিটাকি কাজকর্ম করে দেওয়া। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জয়ন্তী। ভগবানের কাছে ওর কৃতজ্ঞতার শেষ রইল না। বাঁকা পথে রোজগারের স্বাদ একবার যে পেয়েছে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে রোজগারের পথে তাকে আটকে রাখা কঠিন। সুজয় আবারও বাঁকা পথের সন্ধানে পা বাড়াল। ব্যবসায়ের আয় ব্যয়ের হিসাব রইল না। সঙ্গীসাথিদের সাথে রোজ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এক পেটে সন্তান বহনের মত শারীরিক ও মানসিক চাপ তার ওপর মাতালের শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর দাবিতে চাপাচাপি ওর বিরক্তি চরমে পৌছে মানসিক পীড়নে পরিণত হল। এনিয়ে একদিন জয়ন্তীর গায়ে হাতও তুলল। পরদিন

অনুতাপের সীমাহীন প্রকাশে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। নানান চাপে জয়তীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হল এবং এর মধ্য দিয়েই কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। ওর শাশুড়ি নিরলস পরিশ্রম করলেন নবজাতক ও তার মায়ের দেখাশোনায়। শিশুর জন্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক অনটনের চিত্রও ফুটে উঠল। সন্তান জন্মের পর জয়তীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। বাপের বাড়ির সাথে যোগাযোগ থাকলেও জয়তীর যাওয়া আসা অনেক কমে গেছে। ছোটবোনের বিয়ে উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকতে হল। আত্মীয়স্বজনেরা ওর চেহারা দেখে আঁতকে উঠল। বিবাহ নামক বোঝাকে টেনে নিয়ে জয়তী কাটিয়ে দিল একযুগ। নিজের জীবনের কোন ভাবনাই বিকাশের সুযোগ পেল না। চুরির দায়ে পুলিশ হাজতে আটকে সুজয়। এসব এখন গা সওয়া হয়ে গেছে জয়তীর। ওর সাথে যে ছেলের বিয়ের সমন্ধ এসেছিল সেই পারিবারিক পরিচিত পুলিশ অফিসার এখন বেশ উঁচু পদে রয়েছেন। জয়তী গিয়ে দেখা করল। বেয়ারাকে ডেকে চা আনতে বললেন ভট্টাচার্য সাহেবের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উনি বললেন, 'আমি খবর নিয়েছি, তোমার হাসবেণ্ডও চুরির সাথে জড়িত থাকার কিছু প্রমাণ পুলিশ পেয়েছে। পুলিশের জেরা চলছে। আরও কিছু চাঁইকে ধরা হবে। আমি চেষ্টা করব যাতে জামিন পায়। যা হবার সে ত আদালতে হবে।' বিদায় জানাতে ভট্টাচার্য সাহেব দরজা পর্যন্ত এলেন। 'তোমাকে এখনও আমার মনে পড়ে জয়তী,' বলে হাত তুলে বিদায় জানালেন। জয়তী ভাবে কোথায় তার ভুল হয়েছিল। সে কি সুজয়ের কোন বিশেষ গুণে ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। কোথায় ওদের ভাবনায় মিল ছিল? উত্তর খুঁজে পায় না। শুধু নরনারীর একে অপরের প্রতি জৈবিক আকর্ষণ এত প্রাধান্য পেয়েছিল যে, বিয়ের মত কঠিন সিদ্ধান্ত সে বাবার অমতে এত সহজে নিতে পেরেছিল।

বইমেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে আন্তর্জাতিক মেলায় উন্নত হয়েছে। কৈশোর থেকে এখন পূর্ণ যৌবনে। অসংখ্য লেখক, প্রকাশকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বইমেলাকে ঘিরে। জয়তী কাগজে পড়ল কোন কোন লেখকের বইমেলায় নিমন্ত্রিত পদার্পণ হয়। কমল বসু প্রায় রোজই আসেন। মেয়ের হাত ধরে জয়তী এল বইমেলায়। কমল বসুকে দেখে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল জয়তী। আশ্চর্য, চিনতে পারলেন উনি জয়তীকে! খামে বন্ধ চিঠিটা তুলে দিলেন কমল বসুর হাতে। জয়তী ওর বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বিবৃত করে লিখল, 'আপনার আশীর্বাদ আমার জীবনের ক্ষেত্রে সত্যি হয়নি। আমি সমস্ত সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে ঘোর অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। উত্তরণের কোন রাস্তা থাকলে আমায় বলে দিন। ইতি জয়তী।'

আনন্দ ধামের শেষ পরিণতি

বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হল ইন্দ্রজিৎ। প্রথম বর্ষের ইংরেজির প্রথম ক্লাসে সুদর্শন অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলেন, 'আমরা সাহিত্য পাঠ করি কেন?' একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'জ্ঞান লাভ করার।' উদ্দেশ্যে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে অধ্যাপক তাকালেন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে। একটি মেয়ে বলল, 'ভাষা শিক্ষার জন্য।' পেছনের সারি থেকে চিৎকার করে একজন সাড়া দিল, 'মনকে উন্নত করার জন্য।' স্মিত হেসে অধ্যাপক বললেন, 'আমরা সাহিত্য পাঠ করি আনন্দ পাওয়ার জন্য।'

পরবর্তী জীবনের বিচিত্র পথ পরিক্রমায় ইন্দ্রজিৎ দেখেছে মানুষের জীবনে আনন্দ বিরল বস্তু। ওর চারিপাশের মানুষ যেন অত্যন্ত কুপিত, অসহিষ্ণু, পরশ্রীকাতর, ভীত, সন্ত্রস্ত, লোভী। মানুষেব জীবনে আনন্দের বড় অভাব। ইন্দ্রজিতের জীবনটা যেন কুইচলা মাছের মত। একটা সুখের পিচ্ছিল আস্তরণে ঢাকা যা বেয়ে খসে পড়ে দুঃখ, বিষণ্নতা, বেদনাবোধ। সমাজে কোন ক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ কোন ছাপ রাখতে পারেনি, যাতে করে ওকে একজন কেষ্টবিষ্টু বলে গণ্য করা যায়। ওর কল্পনাবিলাসি মন আকাশকুসুম রচনা করে আপন আনন্দেই বিভোর। পরিবারের বৃহৎ দায়দায়িত্ব পালন করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কোন কাজে শরিক হতে পারলেই সে খুশি। নিজের সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে হঠাৎ করে যোগ হয়ে গেল পৈত্রিক অধিকার সূত্রে পাওযা আরও কিছু অর্থ কীভাবে সেই অর্থের সৎ ব্যবহার করা যায় এনিয়ে ইন্দ্রজিতের ভাবনা বেড়ে গেল।

এক শনিবার কোন একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর মৃত্যুর কারণে অফিস ছুটি হয়ে গেল। বাসায় ফিরে কী করবে এই ভাবনায় যখন মগ্ন তখন টেলিফোন এল বন্ধু অবিনাশের। অবিনাশ জানাল ও দশমিনিটের মধ্যে আসবে, ইন্দ্রজিত যেন অপেক্ষা করে। গাড়ি নিয়ে অবিনাশ হাজির হয়ে বলল, 'চল, সরকারি পশু খামারে যাব সেখান থেকে হাঁস কিনে আনব। পরশু ছুটির দিন তোরও নিমন্ত্রণ।' সরকারি খামারের পাশ দিয়ে ইন্দ্রজিত অনেকবারই যাতায়াত করেছে। কখনও ভিতরে ঢোকা হয়নি। গাড়ি চলাচলের রাস্তার পাশেই গরু রাখার ঘর। ঘরের বাইরে বাঁধা অতি বৃহৎ আকারেব ষাঁড়গুলোকে ও দেখেছে। কাল কুচকুচে রঙের দৈত্যাকৃতি ষাঁড়গুলোর খাড়া শিং নাড়া দেখে দূর থেকেই ওর ভয় হত। সে শুনেছে ঐগুলো আনা হয়েছে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে উন্নতমানের গরু উৎপাদনের জন্য। রাস্তাঘাটে অনেকবারই দৃশ্যটা চোখে পড়েছে, গাইকে ষাঁড় ধরাতে গাইয়ের পেছনে বাঁশ দিয়ে কাঁচি বানিয়ে ধরে রাখতে যাতে গাই পড়ে না যায় ষাঁড়ের ওজনে। ইন্দ্রজিতের মাথায় কিছুতেই ঢুকে না খামারের ঐ দৈত্যদের কী করে সামলানো হয়। খামারে এসে ইন্দ্রজিত মনে মনে ভাবছে এই ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে। ডা: গোঁসাই খামারের কর্মকর্তা। অবিনাশের খুবই পরিচিত। তিনিই বোঝালেন খামারের ক্রিয়াকাণ্ড। ইন্দ্রজিত আশ্বস্ত হল ওর জানার চেয়ে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে। একটা কথা তৎক্ষণাৎ মনে পড়ায় ওর হাসি পেল। পাশের বাড়ির অনুকূল মাঝি বাড়ির কচিকাঁচাদের কোনটা বেশি দুষ্টামি করলে বলতেন, 'এটা ইনজেকশনের বাচ্চা।' কথাটার মর্ম এতদিনে ইন্দ্রজিতের মস্তিষ্কে কাজ

করল। সব কিছু দেখে শুনে ফেরার পথে বিদ্যুতের মত একটা মহৎ ভাবনা ওর মাথায় এল। ইন্দ্রজিৎ মনে করে সাহিত্য কর্মের মাঝে কবিতা হল শ্রেষ্ঠ ফসল। মনের গহন ভাবনাকে সূক্ষ্ম তুলির টানে ফুটিয়ে তোলা এক অপূর্ব চিত্র। কবিতা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। কবিতা রচনা ও চর্চা যত বাড়বে সমাজের কলুষ তত বেশি কমবে। সে গড়ে তুলবে কবি প্রজনন কেন্দ্র। বাংলার জল, হাওয়া ও বাঙালির মন কবি জন্মের পক্ষে খুবই অনুকূল। সেখানে একটু পালের হাওয়া পেলে ফুলে উঠবে কবির সংখ্যা। জায়গার কোন সমস্যা ওর নেই। ওর এক জ্ঞাতিভাই কালোবাজারিতে অনেক টাকা কামিয়ে শ্মশানের কাছের বাড়ি ছেড়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে চলে গেছে। পুরানো বাড়িটা দেখাশুনার ভার ইন্দ্রজিতের ওপর। পরদিন সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে উপস্থিত হল বন্ধু মুকুল দেববর্মার বাড়িতে। মুকুল প্রতিষ্ঠিত কবি। ইতিমধ্যেই অনেক পুরস্কার হাতিয়ে দেশে বিদেশে আমন্ত্রণ পেয়ে কবিতা পাঠ করছে। প্রখর বুদ্ধি, কিন্তু ঠোঁটকাটা, যা বলার কোন রাখ ঢাক না রেখেই বলে। মনে ভয় ছিল কী জানি মুকুল গালমন্দ করে না তাড়িয়ে দেয়। প্রস্তাব শুনে মুকুল কিছু সময় ভাবল। তারপর বলল, 'ধনতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকায় এ ধরনের ব্যবস্থাপনা আছে।' সুতরাং এমন একটি কেন্দ্র স্থাপনে কবি-বিলাসি কুলের কিছু সহায়তা তো হতেই পারে। তবে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগোবার পরামর্শ দিল। যে সব বিষয় বিশেষ করে ভাবতে হবে সেগুলো এই রকম (ক) শহরে কবিদের মিলিত হওয়াব কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই ঘুরে ফিরে চায়ের দোকান, বাড়ির রক, বন্ধ দোকানের বারান্দায় কবিরা আড্ডায় বসে কবিতা বিষয়ে মত বিনিময় করে থাকে। কোন সুনির্দিষ্ট জায়গা পেলে খুবই ভাল হবে। নবীন ও প্রবীণ কবিদের ভাব বিনিময়ের পথ সহজ হবে। (খ) কবিরা কবিতা চর্চাকালীন প্রচুর পরিমাণে চা, কফি, তেলে ভাজা, লঙ্কা সহযোগে ভাজা মুড়ি খেতে ভালবাসেন। কেন্দ্রে সস্তায় সেগুলো হাতের কাছে পাওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। (গ) কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সুললিত কণ্ঠে কবিতা পাঠ কবিতার মাধুর্য বাড়িয়ে তোলে। অনেক দিকপাল আবৃত্তিকার নানা অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করে আসরকে মাতিয়ে তোলেন। কেন্দ্রে আবৃত্তি করা শেখানোর জন্য ঘনঘন ওয়ার্কশপ করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে আবৃত্তির ক্যাসেট বের করা যেতে পারে। (ঘ) বইমেলায় বই বিক্রির পরিসংখ্যান-এ কবিতার বইয়ের বিক্রি সবচেয়ে কম। এটা কবিদের পক্ষে বিরাট বাধা। কারণ তাদের কবিতা প্রকাশের জন্য কম প্রকাশনা সংস্থাই এগিয়ে আসে। নিজেদের পয়সায় বই ছাপিয়ে বিলি করা অনেক কবির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। লিটল ম্যাগাজিন কবিদের বড় সহায়ক। কেন্দ্র থেকে একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে। (ঙ) কবিদের নির্বাচিত কবিতার সংকলন হলে আর্থিক চাপ সমভাবে বণ্টন হয়। কিন্তু কোন কবিই নির্বাচনের ভার নিতে রাজি হয় না। কারণও স্পষ্ট করে বলে না। কেন্দ্রকে সে ভার নেবার ও বহির্রাজ্যের কবিদের এনে সম্মেলনের আয়োজন অবশ্য করণীয়। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে কবি সম্মেলনে অনেক শ্রোতা নীরবে কবিতা শোনেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইতিহাস খুব নিরাশাজনক। এখানে কবিরাই কবিদের কবিতা শোনেন না। নিজের কবিতা পাঠের সাথে সাথে আসর ছেড়ে চলে যান।

পরিকল্পনা রূপায়ণে জোর কদমে এগিয়ে গেল ইন্দ্রজিত। লোকজন লাগিয়ে বাড়িঘর ধোওয়ামোছা করাল। ভাইকে বলে কয়ে বাড়িতে এক প্রস্ত রঙ লাগানো হল। যেহেতু বাড়ির

মালিক ভাইটির পয়সার রমরমা, তাই পুরানো বাড়ির কোন আসবাবপত্র ঘর গেরস্তালির জিনিসপত্র পুরানো বাড়িতেই ছেড়ে গেছে। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ইন্দ্রজিতকে খুব কিছু খরচপাতি করতে হল না। সবচেয়ে বড় ঘরটির মেঝে কার্পেট মুড়ে চারিদিকে সোফা লাগিয়ে দিয়ে সুন্দর বসার জায়গা হল। রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা আগেই ছিল। টুকটাক বাসন কিনে চা ও ভাজাভুজির বন্দোবস্ত হল। মুকুলকে দিয়ে কিছু কবিতার বই কিনেও জোগাড় করে আলমিরায় সাজিয়ে রাখা হল। বকুল সংস্থার নামের ব্যাপারে প্রথমেই সাবধান করেছিল যে, কবিরা খুব স্পর্শকাতর হয়, তাই নামাকরণটি ঠিকভাবে করতে হবে। একটু পুরাতন ধাঁচের নাম রাখা হল 'আনন্দধাম'। নিচে ছোট হরফে সাইনবোর্ডে লেখা হল 'কবি ও কবিতাপ্রেমীদের মিলন কেন্দ্র'। রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত নামীদামি কবিদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। সবাই একবাক্যে ইন্দ্রজিতের প্রয়াসের প্রশংসা করে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল।

প্রতিদিন ইন্দ্রজিৎ আনন্দধামে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বসে কবিতা পড়ে কাটাল কিছুদিন। মাঝে মাঝে কেউ এসে বসে গল্প গুজব করে যায়। এক সন্ধ্যায় চারজন যুবক এল। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সাধারণ। একজন জানাল সে কবি। কলেজে পড়ার সময় নিয়মিত কবিতা লিখত এবং ওর কবিতা কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাও হয়েছে। সমসাময়িক কবিদের নামও সে উল্লেখ করল, যাদের সাথে তার পরিচয় রয়েছে। ইন্দ্রজিৎ খুব উৎসাহের সঙ্গে তাদেরকে বসার ঘরে এনে বসাল। একথা সেকথার পর তাদের একজন বলল, ওরা শ্মশানে প্রায়ই আসে কলকে নিয়ে গাঁজা খেতে। আজ কোন একজন নামী লোকের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে প্রচুর লোক সমাগম। ওরা ওখানে বসে গাঁজা খাওয়া সমীচীন মনে করেনি তাই চলে এসেছে আনন্দধামে। সুবিধা হলে এখানে বসে একটু সময় কাটিয়ে যেতে চায়। প্রথম ইন্দ্রজিৎ খুব ঘাবড়ে গেল। একজন কবিকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। 'দেখবে যাতে কোন গোলমাল না হয়', বলে পাশের ঘরে চলে গেল। জীবনে অনেক মাতাল সামলেছে ইন্দ্রজিৎ, কিন্তু গাঁজাখোরদের সম্পর্কে ওর কোন ধারণা ছিল না। তাই মনে একটু উৎসুক ওরা কী বলে ও করে জানার। পাশের ঘর থেকেও চোখ রাখল ওদের ওপর। কানকে সজাগ করে শুনল ওরা কী বলে। বাঁ হাতের তালুতে গাঁজা রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে অনেকক্ষণ গাঁজা টিপে কলকেয় পুরল। দেশলাইয়ের আগুনে টিকা জ্বালিয়ে কলকের মাথায় বসিয়ে ঘন ঘন টান মারছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। একটা মোক্ষম টান মেরে পাশের জনের হাতে কলকে ধরিয়ে দিল। একই ধারায় কলকে ঘুরতে লাগল একহাত থেকে অন্য হাতে। গন্ধটা ইন্দ্রজিতের খারাপ লাগল না, বরঞ্চ মিষ্টি বলেই মনে হল। তাদের ব্যবহারে কোন চঞ্চলতা নেই। কান পেতে ওদের কথাবার্তা শুনল।

প্রথমজন ঃ কাল রাতে শেষ ট্রিপে রাত দশটায় বাড়ি যাওয়ার সময় সেই ট্রাফিকমামা এসে উঠল। বেশ পান করে এসেছেন। খাতির দেখাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন?' 'খুব খারাপ! মাসের কুড়ি তারিখ না যেতেই বেতনের পয়সায় মাল খেতে হল।' বলল মামা। ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্তায় নামিয়ে শালাকে একটা লাথ কষাই।

দ্বিতীয়জন ঃ তোর যে লাইন মিস হত জিন্‌স ও টাইট টপ পরা উঁচু বুকের মেয়েটির জন্য—

সেটার কিছু এগোল?

প্রথমজন ঃ আমার আর হল, ওটা খুব সেয়ানা। রামদত্তের ছোট ছেলে যেটা বাজাজ পালসার নিয়ে ঘুরে, এখন ওর সাইকেলের পেছনে তুলে নিয়েছে।

তৃতীয়জন ঃ দিলু তুই দে না ছোট মাসির বাড়ির ব্যাপারটার একটা সুরাহা করে।

চতুর্থজন ঃ (সম্ভবত যার নাম দিলু) তোর মেসোটাই একটা হারামি। বেআইনি বাড়ি তুলে পাশের বাড়ির লোককে লাঠি নিয়ে মারতে যাওয়া। এখন জড়িয়ে গেছে মিউনিসিপালিটি, থানা, ক্লাব, রাজনীতি। আমি চেষ্টা করছি একটা মীমাংসায় আসতে।

এদের আলাপচারিতায় ইন্দ্রজিতের কোন অসংলগ্নতা খুঁজে পেল না। গাঁজা খেলে শারীরিক কী ক্ষতি হয় ইন্দ্রজিৎ জানে না। তবে ওরা হয়ত খেয়ে আনন্দ পায়। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল ছেলেমেয়ে এল আনন্দধামে। অনেকক্ষণ বসে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা করল। তাদের কয়েকজন কবি। ওদের যাতায়াত প্রায় নিয়মিত। ধীরে ধীরে কবিদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়তে লাগল। বসার ঘর ছাড়িয়ে আনন্দধামের অঙ্গন মুখরিত হল কবিদের গুঞ্জনে। উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরার ককবরক ভাষার কবিদের উপস্থিতি। কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা কবিতার জগতের নামী কবিদের উন্নাসিক মনোভাব ও ত্রিপুরার কবিদের অপাংক্তেয় করে রাখার প্রয়াসকে আনন্দধামে আসা কবিরা হেলায় অবহেলা করে। ওরা উদ্দাম, দুর্বার ওদের প্রাণশক্তি। রাজ্যের সব প্রান্তের কবিদের কবিতা বেছে সংকলন বেরোল বরিষ্ঠ কবি মুকুল দেববর্মার সম্পাদনায়, আনন্দধামের আর্থিক সহায়তায়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাল বিক্রিও হল। খরচপাতি প্রায় উঠে এসেছে। দু'জন কবির বই ছাপতে সংস্থা সাহায্যও করল। তবে কবিতার বই ছাপার ব্যাপারে একটা কৌতুককর ঘটনাও ঘটল। একদিন এক ভদ্রলোক বাঁধাই করা খাতা নিয়ে হাজির। ওর কবিতার বই ছাপিয়ে দিতে হবে। ত্রিশ হাজার টাকার তিনটি একশ টাকার নোটের বাণ্ডিল ইন্দ্রজিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার চাকুরি জীবনে সঞ্চিত অর্থ। বইমেলার আগেই বই বের করতে হবে যাতে বইমেলায় প্রিয় কবিমন্ত্রীকে দিয়ে বইয়ের উদ্বোধন করানো যায়।' ইন্দ্রজিৎ টাকাটা ভদ্রলোকের কাছে রাখতে বলে ওর ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার খাতাটায় লিখে নিল। কয়েকদিন পরে আসার অনুরোধ করল। খাতায় লেখা কবিতা পড়ে ইন্দ্রজিতের চুল একেবারে খাড়া। তাড়াতাড়ি ডেকে আনল বন্ধু মুকুলকে। কবিতা পড়ে মুকুলের হাসি আর থামে না। অপূর্ব সাহিত্য কীর্তিতে দু'জনই মোহিত। টেলিফোন ধরে ইন্দ্রজিৎ ভদ্রলোককে বোঝাল, 'আপনার কবিতা খুব ভাল হয়েছে। তবে কবিতার বই বিক্রি কম হয় তাই সঞ্চিত টাকা নষ্ট না করাই শ্রেয়।' ভদ্রলোককে বললেন যে, কোনদিন এসে ওর খাতাটা নিয়ে যেতে। ভদ্রলোক এলেন সঙ্গে স্ত্রী। ভদ্রমহিলা বললেন, 'টাকারজন্য ভাববেন না। উনি এমন একটা কাজ করেছেন যাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। পরিবারের সবাই চায় বই ছাপা হোক।' ইন্দ্রজিৎ অতি বিনয়ের সাথে ওর অক্ষমতা জানালে ভদ্রমহিলা কুপিত হয়ে দু'চারটা মন্দ কথা বলে চলে গেলেন।

আনন্দধামের উদ্যোগে কবি সম্মেলন হয়। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অনেক কবি এলেন। একজন বৈষ্ণব কবি, যিনি প্রায়ই আনন্দধামে আসেন সম্মেলনে কবিতা পড়বেন বলে।

নাম লেখালেন। কবিতা পড়ার আসরে লোক সমাগম ভালই হয়েছে। বৈষ্ণব কবি উঠলেন কবিতা পাঠ করতে। তিরিশ মিনিট অতিক্রান্ত কবিতা শেষ হচ্ছে না! বলে-কয়ে থামাতে হল। কবি ক্ষুণ্ণ হয়ে গ্রামের প্রতি শহরে কবিদের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে গটগট করে চলে গেলেন।

আনন্দধামের সাফল্যে ইন্দ্রজিৎ উৎফুল্ল। ওর মনে হচ্ছিল একটা কাজের কাজ করছে! কিন্তু হায়! হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে সর্বাঙ্গে ব্যথা বেদনা জর্জরিত ইন্দ্রজিৎ ভেবে কূল পাচ্ছে না, তার ভূমিকা কী? রাজনীতির কারবারি এক দাদার একমাত্র মেয়ে পালিয়েছে এক উঠতি কবির সঙ্গে। তাদের প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম নাকি হয়েছে আনন্দধামে। দাদার মাতাল চেলারা চড়াও হল আনন্দধামে। দরজা জানালা আসবাব পত্র ভেঙে একাকার। বাধা দিতে গিয়ে ভীষণভাবে প্রহৃত হল ইন্দ্রজিৎ। প্রথমে কয়েকটি কিল, ঘুষি, লাথি ওর অনুভূতিতে ছিল, পরে আর কিছুই মনে করতে পারছে না! হাসপাতালে শুয়ে দিন গুনছে আর ভাবছে আদৌ কী চলবে আনন্দধাম?

আমোদ্দার বাপ

নগেন হালদারের বাড়ির হালের মুনিশ আমোদ্দার বাপ মাথায় একটু মোটা। আমোদ্দার বাপ এখনও অকৃতদার। তবুও সে কেন বাপ হল কেউ জানে না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বলদজোড়া নিয়ে লাঙল কাঁধে, জোয়াল হাতে, আমোদ্দার বাপ খেতের উদ্দেশে রওনা দেয়। একটানা হাল চালিয়ে রোদ বাড়লে হাল থামায়। জোয়াল ছাড়িয়ে গরুকে ছেড়ে দিয়ে খেতের আলে বসে বিড়ি ধরায়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। এ সময়ে বিড়ি টানতে খুব ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরে গোয়াল ঘরের সামনে মাটি দিয়ে উঁচু করে বসানো গামলার জলে খইল, ভুষি মিশিয়ে বলদগুলোকে এক গামলা জল খাওয়ায়। কুচি কুচি করে কাটা খড় গরুগুলিকে খেতে দিয়ে সে চলে যায় বাঁধানো পুকুরের ঘাটে। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেজে, হাত, মুখ, পা ধুয়ে সোজা ওঠে রান্না ঘরের বারান্দায়। পিঁড়ি পেতে বসে হাঁক দেয়, 'বৌদি ভাত দাও।' হালদার গিন্নি নিজে অথবা বাড়ির অন্য কোন বৌঝি উঁচু কান্দার থালে পুরো থাল পান্তাভাত এনে দেয় পাতের সামনে। কোনদিন শুটকি পোড়া, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ নয়তো একদলা গুড়-কলা দিয়ে একথাল ভাত মেরে দেয় আমোদ্দার বাপ। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে আটচালা ঘরের বারান্দায় এসে জলচৌকিতে বসে। আয়েশ করে হুঁকার কলকেয় ফুঁ দিয়ে আগুন চড়ায়। হালদার মশায় বাইরে এসে চেয়ারে বসে। হুঁকা বাড়িয়ে দেয় আমোদ্দার বাপ হালদারের দিকে। নগেন হালদার ওর মাঝ বয়েসী কাজের লোকটিকে পরিবারের একজনের মত গণ্য করে ও খেতে খামারের কাজের জন্য নির্ভর করে। হুঁকা টানতে টানতে হালদার খবরাখবর করেন চাষবাসের। এক সময় হুঁকাটি বাড়িয়ে দেয় আমোদ্দার বাপের দিকে। দু'জনের কাজের কথা শেষ হলে হালদার তৈরি হয় গদিতে যাওয়ার জন্য। আমোদ্দার

বাপ ও লেগে যায় ছড়িয়ে থাকা কাজকর্মে।

গদি থেকে ফিরে নগেন হালদার শুনল ওর বড়মামা এসেছেন, সঙ্গে নগেনের ছোট মামিমা। বড়মামা নগেনকে খুবই ভালবাসেন। নগেনেরও বড় মামার প্রতি খুবই আকর্ষণ। বড় মামার আগমনে নগেন খুশি হল। মামার সাথে দেখা করে পায়ের ধুলো নিয়ে মামার সংসারের সবার খোঁজখবর নিল। বড় মামা বিশেষ ভূমিকা না করেই নগেনকে বলল ওনার আসার উদ্দেশ্য। সংসারের বিধবা ছোটমামীর ভার নেওয়ার আর কেউ নেই তার অবর্তমানে। বড় মামার বয়স হয়েছে। সংসারের ঝামেলা নেওয়ার মত ক্ষমতা এখন খুব নেই। তাই ছোট ভাইয়ের বিধবা বৌকে নগেনের কাছে রেখে বড়মামা নিশ্চিত হতে চান। নগেন আপত্তি করল না। বড়মামা নগেনকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

ঘরের কাজে হাত লাগানোর আর একটি লোক পেয়ে হালদার গিন্নিও খুশি, কারণ অচিরেই ষষ্ঠ সন্তান প্রসবের জন্য তাকে আঁতুর ঘরে ঢুকতে হবে। সংসারের অনেক কাজের ভারই স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিল ছোটমামী।

সংসারের নানা কাজে ছোটমামীর সাথে আমোদ্দার বাপের দেখা ও কথা হত। এই দেখা সাক্ষাৎ যে একদিন সর্বনাশা রূপ নেবে তা কী ওরা নিজেরা ভেবেছে, না বাড়ির অন্য কেউ ভাবতে পেরেছে! গবেট আমোদ্দার বাপের সাথে কী করে ছোটমামীর শারীরিক সম্পর্ক হল এবং এর পরিণতি ছোটমামী বহন করে চলেছে আপন শরীরের ভিতর—তা একদিন পড়ল হালদার গিন্নির চোখে। বিপদ যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে—বুঝতে পেরে ছোটমামী লজ্জায়, ভয়ে দিশাহারা! কথাটা এক কান থেকে আরেক কান হয়ে হালদারের কানে পৌঁছল। অগ্নিশর্মা হালদার আমোদ্দার বাপকে কিছু চড় থাপ্পড় দিয়ে গালাগালের তুবড়ি ছোটাল। 'হারামজাদা, নমক হারাম! যে থালে খাস সেই থালেই হাগস! আমার মান সম্মান নিলামে চড়িয়ে দিছস!'

আমোদ্দার বাপ নির্বিকার। দিশাহারা।

এই বিপদে নগেন হালদার গিয়ে পরামর্শ করল দীর্ঘদিনের সাথি বাজারের ধানের আড়তদার খুরশিদ কেরানির সাথে। খুরশিদ আমোদ্দার বাপকে পছন্দ করত, অনেকবার এসেছে গদিতে ধানের বোঝা নিয়ে। খুরশিদ ওর বাড়ির কোণায় থাকার জায়গা দিল। নগেন ঘর তুলে আমোদ্দার বাপকে ছোটমামী সহ বাড়ি থেকে বিদায় করে মুসলমান পাড়ায় খুরশিদের বাড়ির এক কোণায় বাস করতে পাঠাল।

আমোদ্দার বাপ ও ছোটমামীর ঘর সংসারের খবর জানার কৌতূহল থাকলেও সেই খবর নিতে পরিচিত পরিজন কখনও এগিয়ে আসেনি। তবে শোনা গিয়েছে ওদের একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। দু'বছর পর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ছোটমামী মারা যায়। আমোদ্দার বাপ মেয়েকে নিয়ে বিভ্রাটে পড়ল। কাজকর্মে বেরোলে প্রতিবেশিদের কাছে মেয়েকে রেখে যেতে হয়। কাজকর্ম, রান্নাবান্না যাবতীয় কাজ এক হাতে করে বড় অসুবিধার মাঝে মেয়েকে সামলাতে সামলাতে মেয়ে আরতি ডাগর হল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠও

শেষ করল। স্কুলে ওকে নানা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। তবে ওর চারপাশের নানা নানী, চাচা, ফুফা, ফুফী, ভাই, ভাবীদের স্নেহচ্ছায়ায় আরতি বড় হয়েছে এবং ওদের কাছে আরতি খুবই আপনজনের ভালবাসা পেয়েছে।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমোদ্দার বাপের মুখ শুকিয়ে ওঠে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে মনে উদ্বেগ। আজকাল ওর নিজের দেহও সঙ্গ দিচ্ছে না। কাজ করতে গেলে হাঁপ ধরে যায়। কখনও মাথা চক্কর মারে। হাট, বাজার, পরিচিতদের কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলের খোঁজখবর করে। অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে আবার কেউ সহানুভূতির সুরে আশ্বাস দেয়। যেহেতু আরতি দেখেতে সুশ্রী, বলতে গেলে সুন্দরীই, তাই কেউ কেউ আগ্রহও দেখায়। কিন্তু ভাগ্য আমোদ্দার বাপের সহায় হল না। দুপুরের প্রচণ্ড রোদের মাঝে খেতে নিড়ানির কাজ করার সময় চোখে অন্ধকার নেমে এল। লোকজন ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল। চেতনাহীন দেহের হাত পা অবশ। দু'দিন এই অবস্থায় থেকে আমোদ্দার বাপ সংসার থেকে বিদায় নিল। খুরশিদ কেরানি কয়েকজন হিন্দুকে ডেকে আমোদ্দার বাপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাল।

আমোদ্দার বাপের অবর্তমানে আরতিকে নিয়ে সবাই চিন্তিত। খুরশিদ কেরানির উঠোনে বসল পাড়ার মুসলমানদের বৈঠক। সবাই একমত যে বাপ-মা মবা মেয়ের দায় দায়িত্ব তাদেব সবার। আরতির গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে তার দেখাশুনা করবে পালা দিয়ে গ্রামের বউ ঝিরা। আর্থিক দায়দায়িত্ব অনেকটাই পালন করবে খুরশিদ নিজে। খুরশিদ বন্ধু নগেনকে অনুরোধ করল আরতির জন্য একটি বিয়ের পাত্র জোগাড় করে দেওয়ার। পাড়াব মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে তাদের দায়িত্ব। কোন লোভী-হাত সাহস করেনি আরতির দিকে এগিয়ে আসতে। আড়তদার হিসাবে খুরশিদের পরিচয় ছিল বিভিন্ন গঞ্জের হিন্দুদের সাথে। ওর চেনা জানা পাশের গাঁয়ের এক বর্ধিষ্ণু ঘরের লেখাপড়া জানা ছেলে এগিয়ে এল সম্বন্ধ করতে। নগেনকে সঙ্গে নিয়ে খুরশিদ বিয়ের সব কথাবার্তা পাকা করল। দিনক্ষণ দেখে আবতির বিয়ে হল। পাড়ার সব মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সামর্থ্য অনুসারে। নগেনও পিছিয়ে থাকল না। ধূমধাম করে বিয়ে হল। কন্যাদান করল নগেন হালদার। পাড়ার সব নানা নানি চাচা চাচি ফুফা ফুফী ভাই ভাবী চোখের জলে বিদায় দিল শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়া আরতিকে।

কল্যাণী ভট্টাচার্য

খোয়াব

অম্বরের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। জীবনের এ সাফল্যের দিনটি মনের মণিকোঠায় বাঁধিয়ে রাখবে সে। বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত প্রফেশনে যোগ দিয়ে আজ সে ধন্য। ওফ্ উত্তেজনায় মনের ভেতরটা যেন শিহরিত হচ্ছে। এই প্রথম তার কো-পাইলট হিসেবে কোন ফ্লাইট-এ চাপা।

পাইলট রিমঝিম কাবাডিয়ার পাশের সিটে বসে এগিয়ে চলছে, চব্বিশ বছর দু'মাস সাতদিন বয়স্ক নবীন প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর যুবক অম্বর ভট্টাচার্য। নীল আকাশের গায়ে সাদা রাজহাঁসের মতো উজ্জ্বল রঙের অথবা স্টিল কালারের গায়ে ঠিকরে পরা রোদ্দুরের ঝিলিকে উজ্জ্বল এয়ার বাসটা এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট পথে।

অম্বর রিমঝিমের প্রতি মুহূর্তের একশ'ন লক্ষ করতে করতে নিজের মধ্যে হারিয়ে যায়। ট্রেনিং পিরিয়ডের বন্ধু পথ পার হয়ে আজ সে কো-পাইলট। হোক না প্রাইভেট ছোট্ট কোম্পানি নতুন কোম্পানি। আকাশে উড়াতো সবখানেই এক !

নীল আকাশের বুকে পথ চলার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে। আজ সাথে আছে তারই কাছাকাছি বয়সি পাইলট রিমঝিম কাবাডিয়া। কতো আর বয়স হবে মেয়েটির, মেরে কেটে না হয় চব্বিশ বা পঁচিশ।

অম্বরের মনে হয় এ বিরাট আকাশসমুদ্রে শুধু আমরা দু'জন বসে আছি। আর কোথাও কেউ নেই। শুধু দু'জন। রিমঝিম কাবাডিয়া পাইলট আর অম্বর ভট্টাচার্য কো -পাইলট।

প্যাসেঞ্জারের সিটের আরোহীরা তো আছেন এ সিটের পেছন দিকে। ম্যাটেলের চাদরের পারটিশনের অন্তরালে। চালক বা চালিকার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হয় যন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ প্রয়োজনে।

উড়ানটা কি একটু বাম্প করলো?

রিমঝিমের দিকে তাকায় অম্বর। না তার চোখে মুখে বা অভিব্যক্তিতে কোন টেনশনের ছাপ নেই। অম্বর ফ্লাইটের অভিমুখের দিকে তাকিয়ে গাছপালা, নদীনালা, মনুষ্যবিহীন এ বিরাট শূন্যতাকে অনুভব করে। আকাশের বুক থেকে বলতে গেলে মাটির কিছুই দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়াশা ভরা এক অস্তিত্ব যেন মাটি। আকাশসায়র থেকে মাটিকে দেখতে কেমন যেন ভয় ভয় করে। কাছে দূরে আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, শুধু এগিয়ে যাওয়া একা একা একা। অনুভূতি থাকলে বিমানটা এ একাকীত্বকে কেমন ভাবে গ্রহণ করত?

কোন মহিলা বিমান কর্মীর রিনরিনে গলার যান্ত্রিক আওয়াজ, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কানে আসে। সমুদ্রতল থেকে কতটা উঁচু দিয়ে বিমান পাড়ি দিচ্ছে তাই ঘোষণা করছে আরোহীদের উদ্দেশ্যে।

আজ প্রথম চালকের সহকারী হিসেবে বিমানে উঠলেও ক'দিন যাবতই সে ঘুরে ফিরে আসছিল এ পরিবেশে। সুদৃশ্য পুরুষালী এ্যাপিয়ারেন্সের অধিকারী অম্বরের উপস্থিতি অনেক বিমান সেবিকাকেই আকৃষ্ট করেছে প্রথম দিন থেকেই। অম্বর ওদের সাথে সম্মানজনক দূরত্বই

আজ পর্যন্ত বাজায় রেখে চলেছে।

জানা হয়ে গেছে এরা যখন হোমসিটি ছাড়া অন্য কোন শহরে যায় তখন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ওদের নাচা গানা বা ড্রিঙ্কস নিয়ে মাতামাতি—মস্তি মস্করা সবই চলে।

অম্বর ভাবে, প্রথম প্রথম দূর থেকে তো স্টাডি করি তারপর দেখা যাবে।

নিজেকে ত্যাগীযোগী নীরস যুবক হিসেবে ওদের সামনে তুলে ধরার ইচ্ছা না থাকলেও অন্তত তো ডিগনিটি নিয়ে চলতেই হবে। এখন সে মনে করে—আমি শিক্ষানবীশ —আমার অনেক পথ এগোতে হবে। কাজেই দেখে শুনে বুঝে ঝাঁপানো উচিত।

হ্যালো সম্বোধনে চমকে ওঠে অম্বর। তাকিয়ে দেখে মিটিমিটি হাসির ঝিলিক ঠোঁটে ঝুলিয়ে রিমঝিম দাঁড়িয়ে। অম্বর বলে—স্যরি ম্যাডাম, ফ্লাইটযে ল্যাণ্ড করেছে তা আমি খেয়াল করিনি।

' নো প্রব্লেম' বলে ওর ডান হাতটা নিজের বাম হাতের মুঠিতে নিয়ে বলে মিস কাবাড়িযা-- চলো আমরা একটু মাটি ছুঁয়ে আসি।

অম্বর মনে মনে হাসে, কোথায় মাটি ছোঁয়া—ইউনিফর্মে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভ ড়িয়ে কি প্রকৃতিকে ছোঁয়া যায়। নিচে নামলেই কি মাটির পরশ পাওয়া যায়?

স্মার্টলি দামী স্যু'র আওয়াজ তুলে দ্রুত চলতে থাকে রিমঝিম। ছ'ফুট এর কাছাকাছি উচ্চতা সত্ত্বেও অম্বরের মনে হয় বিমঝিম এর পাশাপাশি চললে যেন তাকে ছোটই দেখায়। ওফ্, মেয়েটির হাঁটায় কী প্রচণ্ড স্পিড। অম্বরও দ্রুতই হাঁটে। তবু কিন্তু তার সঙ্গে যেন কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

চলতে চলতে এয়ার পোর্টের ক্যান্টিনের চেয়ারে মুখোমুখি বসে বিমঝিম জিজ্ঞাসা করে এ্যনি প্রব্লেম?

অম্বর সংকোচে মাথা নেড়ে বলে—ন্ না, তেমন কিছু না।

এমনি করে চলতে চলতে রিমঝিমের সঙ্গে কখন যে অম্বরের সম্পর্কটা সহজ হয়ে যায় এখন তা আর মনেই পড়ে না। একসঙ্গে ডিউটি থাক বা না থাক—ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলে। ডিউটি এক সাথে না পড়লে ফ্লাইট থেকে নেমেই পরস্পরকে মোবাইলে শুধায়, সব ঠিকঠাক, তো?

অম্বরও এখন পাইলট। তবু পেশাগত দিকে রিমঝিমকে সে যথেষ্ট সমীহই করে চলে।

গল্প করতে করতে রিমঝিম বলে—এখন ড্রিঙ্কস নিতে বা ডান্সের আসরে যোগ দিতে আর এতটুকুও সঙ্কোচ হয় না বল্?

হ্যাঁ তবে এটা ঠিক একসময় কিন্তু এ কালচারটাকে উশৃঙ্খলতা বলেই মনে হতো। কিন্তু এখন তা মেনে নিয়েছি।

—ইচ্ছে না হলে মানা কেন?

—কি আর করা। যখন যেমন, তখন তেমন।

—এডজাস্টমেন্ট ইজ এডুকেশন, তাই তো?

ছাড় এসব তত্ত্ব কথা। সত্যিই রিমঝিমের জন্য নিজেকে...।

দেখা হলেই এদের মধ্যে খুনসুটি লেগে থাকে।

অম্বর মূলত একেবারে ঘরকোণো প্রকৃতির মানুষ না হলেও রিমঝিমের মতো প্রজাপতি হয়ে যত্রতত্র...। পার্টিতেই হোক বা ঘরোয়া আড্ডাতেই হোক সবার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে না অম্বর।

কিন্তু রিমঝিম? যে যেমন মন নিয়েই এগোক—হাতে সময় থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা চালিয়ে যেতে পারে হাল্কা বা ভারি যে কোন চালে কথা বলে।

অম্বরের মনে হয় এসব পেশা এমনিতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায়। আর আজ সে জন্যই কষ্ট হচ্ছে পেছনে পরে থাকা বন্ধুদের কথা ভেবে।

এক কাপ চা তিনজনে ভাগ করে খাওয়ার পর পয়সা কে দেবে এ নিয়ে ঠেলাঠেলি—কোথায় 'ওয়াক ইন ইন্টারভিউ' আছে করে, কোথায় কোথায় চাকুরির নোটিশ ঝুলোনো হয়েছে বা সম্ভাবনা, এসব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গবেষণা - এসব অম্বরকে আজো টানে। চাকুরির দরজা খটখটাতে কাজ-পাগলী সমব্যাথী মেয়ে বন্ধুও তো জুটে ছিল!

দামি পারফিউমের গন্ধ, ক্লাবে হাইফাই ফ্যামেলির যুবতীদের সংকীর্ণ পোশাক পরে আনাগোনা সবকিছু যেন তার কাছে আর্টিফিসিয়্যাল বলে মনে হয়।

রিমঝিমের নানা মাত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে সর্বক্ষণ ধন্দে রাখে। এতদিন ভাবত সে, যেখানে যেমন সেখানে তেমন বচনটা বুঝি শুধুই কথার কথা কিন্তু রিমঝিম যেভাবে এ ফিলোজফিকে মেনটেন করে চলে তাতে সে অবাকই হয়।

এমনিতেই তো পেশা হিসেবে এয়ার পাইলট হওয়ার চাহিদা মেয়েদের মধ্যে কম দেখা যায় -তার মধ্যে-

টিভির চ্যানেলের কোন রান্নাঘরে গিয়ে ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে রান্না করে আসা বা অন্য কোন চ্যানেলে সাজগোজ বিষয়ে টিপ্‌স দেওয়া স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কুইজ কনটেস্টে এনকারেজিং--এসব যেমন একদিকে ভালবাসে অন্যদিকে ভালবাসে মন্দ কী পুরুষদেরই বিপরীতে টেনিসের রেকার্ট ধরে লড়াই করতে।

প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করে অম্বর—রিমঝিমকে কী আমি ভালবাসি? অথবা রিমঝিম আমায়? আপন মনে হেসে নিজেই জবাব দেয়---আজকের এই জটিল দুনিয়ার কে কাকে ভালবাসে তা বলা কী এতই সহজ? একি কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র যে..। তবে এটা ঠিক—রিমঝিম আমাকে আকর্ষণ করে। হয়ত আরও অনেক যুবককেই করে। রিমঝিম ডান্সের সময় যখন অন্য পুরুষের হাত ধরে অঙ্গভঙ্গী করে তখন আমার ভেতরে যে কী হয়...ঐ পুরুষটার সঙ্গে তখন ডুয়েট লড়তে ইচ্ছে করে। অন্য পুরুষের এতো কাছাকাছি রিমঝিমকে দেখতে কিছুতেই মন মানে না। ভেতরটায় এক অদ্ভুত যন্ত্রণা হয়। ঐ পুরুষটার প্রতি ঈর্ষা হয়।

আবার আঁটোসাঁটো পোশাকে আবৃত হয়ে যখন টেনিসের র‍্যাকেট উঁচিয়ে ফ্লাওয়ার থ্রু করে—তখন রিমঝিমের শরীরের উদ্দাম বিপজ্জনক স্তনযুগল দেখে ওকে ঝাপটে ধরতে ইচ্ছে করে। মন পাগলপারা হয়ে ওঠে।

রিমঝিমকে কাছে টেনে বলতে ইচ্ছে করে, এতো কিছুতেই নিজেকে না জড়ালে চলে না? কিন্তু ভেতরের এ কথাটা খোলাখুলি বলতে পৌরুষে বাঁধে। অম্বর জানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে খিটিমিটির মূল কারণটাই এই 'ইগো'।

নারী পুরুষের চেয়ে সববিষয়ে খাটো, এই যে পুরুষতান্ত্রিক কনসেপ্ট যা দীর্ঘ পরম্পরায় চলে আসতে আসতে বাসা বেঁধে বসেছে বেশির ভাগ পুরুষের মনে, এমনকী পুরোনো ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নারীর অন্তরেও। এ বিশ্বাস বহু প্রগতিশীল পুরুষকে গিলে বসে আছে। সে কারণেই মেয়েদের পদে পদে হেনস্থা সইতে হয়। সে কারণেই মন্ত্রপাঠ করে স্বামী হিসেবে স্ত্রীর জীবনযাপনের সবরকম দায়দায়িত্ব শাস্ত্রীয় নিয়মে পালন করেও ক'দিন পার না হতেই আসে বধূর ওপর চরম নির্যাতন। কোন কোন ক্ষেত্রে বধূকে হত্যা করার পর তার জন্য দুঃখিত না হয়ে স্বামী বা তার বাড়ির মানুষ উতলা হয়ে ওঠে আত্মরক্ষায়। আসলে মেয়েদের হেয় করার বাসনা বহু পুরুষের এবং পুত্রগর্বে গরবিনী মা তথা শাশুড়ির মনের গভীরে কাজ করে চলে। পতির চরণই সতীর শ্রেষ্ঠ আসন এমনটা বিশ্বাস করতেই ভালবাসে বেশিরভাগ পুরুষ।অম্বরের মনে হয় আজও একটা বিশেষ অংশের পুরুষ নারীকে সমপর্যায়ের মানুষ না ভেবে একটা ভোগের যোগ্য শরীর বলেই মনে করে। বাইরে বাইরে যা ঘটে ঘটুক আমার পরিবারের মহিলারা আমার অঙ্গুলি হেলনে ওঠুক বসুক, এটাই পছন্দ করেন বহু প্রগতিশীল পুরুষ সিংহ। এ চিন্তাটা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ অফিসের উচ্চ আসনে আসীন নারীর শরীরের দিকে অশ্লীল হাত বাড়াতে সঙ্কোচবোধ করে না সমপর্যায়ের চেয়ারে আসীন কোন কোন পুরুষও।

আচ্ছা রিমঝিমের দিকে এমন কেউ কি হাত বাড়িয়েছে?

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করি তা হলে কি—খুব অশোভন হবে?

নিজেকে খুব বোকা মনে হয় অম্বরের। না হলে ফাঁকে ফাঁকে রিমঝিম ওর সম্পর্কে না জানা কথা জিজ্ঞাসা করলেও—ওর সম্পর্কে আমার তো জানা হলো না কিছুই। আসলে অম্বব নিজেই বোঝে রিমঝিমের সংস্পর্শে গেলেই অম্বর কেমন চুপসে যায়। অথচ ওকে এড়ানোর জন্য দুরে সরে যেতেও মনে চায় না।

বিয়ের পর রিমঝিম কী ঘরোয়া মেয়েদের মতো সংসার করতে পারবে?

হাসি পায় অম্বরের। ধ্যাৎ কী ভাবছি আমি। আশ্চর্য উপায়ে এ চাকরিটা ম্যানেজ করতে পারলেও আমাদের মতো মিডলক্লাস পরিবার কি এক হাইফাই মেয়েকে মেনে নিতে পারবে? তবে কেন আমার সারা মন জুড়ে রিমঝিম বিরাজ করে? একদিনও আমি ওকে ভালবাসার কথা বলিনি—অথচ কেন অন্য কোম্পানিতে এর চেয়ে বেটার অফার পেয়েও রিফিওজ করলাম?

কেন, কেন আমি দুরে যেতে চাইনি?.

ভাবনাটায় মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে।

হঠাৎ করে কানে আসে ঘেড়ঘেড়ে কর্কশ গলার সেই আহ্বান—অম্বর ভট্টাইজ হাজির? চোখ খোলে তাকায় অম্বর। মনে পড়ে যায় সাতদিন আগে সে ধরা পড়েছিল চোরাপথে আমদানি

করা কোরেক্স ও ফেন্সিডিল ওষুধ-এর গাড়ি বাংলাদেশ বর্ডার পার করার সময় ও এক'দিনের পুলিশি অত্যাচারে অবসন্ন অবস্থায় বসে গাড়িটার সিটেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তার ধরা পড়াটা মিথ্যা সাজানো কোন ঘটনা নয়। তবে এটা ঠিক এ সবে জড়িয়ে পড়ার আগে এ বিষয় সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও ছিল না তার। কিন্তু নিজের গরজে না জেনে বুঝেই এ জালে এসে সে নিজেকে জড়িয়েছিল।

একটা প্রাইভেট বিমান কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে সিলেক্ট হয়েছিল। সে দু'মাস আগে। ওদের সাথে কথা ছিল জয়েন করার আগে এক লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার। টাকার জন্য যখন হন্যে হয়ে ছুটছে তখনই সোনামুড়ার বন্ধু সুমেরু বলেছিল—লক্ষ টাকা একটা ব্যাপার নাকি রে! উড়ছে টাকা তো উড়ছে রে বাতাসে, ধরলেই হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন নরেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেন— তেমনি কতো মুস্কিল আসান মুখ বাড়িয়ে বসে আছে টাকা দেবার জন্য।

কথাটা শুনে অম্বর বলেছিল, দেখ ভাই, এখন ফাজলামোর সময় নয়—বলতো টাকাটা কী করে জোগাড় করি?

সুমেরু তাকে আন্তরিকভাবে বলে, তুই বর্ডারের কাজ করলে কিন্তু টাকা আছে, অবশ্য রিস্কও আছে।

সত্যিই প্যারিস? বলে নিশ্চিতের হাসি হেসেছিল অম্বর। তারপরের কাহিনি খুব সংক্ষিপ্ত।

অম্বর ভট্টাইজ হা-জি-র।

আবার সেই ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ কানে আসায় চোখ খোলে অম্বর। ডাণ্ডা হাতে খাঁকি পোশাকধারী ধমকে বলে কোর্টের রাস্তাঘাট চিনিস না শালা? ঐ সামনের দিকে চল্—

কাশীকান্তর স্বদেশ যাত্রা

'মনচল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে, বিদেশির বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।'

গানটা শুনতে শুনতে কাশীকান্তর মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরও দিন কতক বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে পড়া মানুষটার ভাবনা চিন্তা আজ ওলট পালট হয়ে একটা অন্য অভিমুখে ধাবিত হতে থাকে।

দীর্ঘ জীবৎকালের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলি মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারে। নাতির বয়সী যুবক শুভম কাশীকান্তকে বার ঘন্টা দেখভাল করে, সকাল আটটা থেকে রাত্রি আটটা। ঘড়ি ধরে নানা রকম জীবনদায়ী ওষুধ খাওয়ায়, ক্যাথিটাব পাল্টায়, ইউরিনের প্যাকেট ভরে গেলে পুরাণটা ফেলে নতুন প্যাকেট লাগায়, বেডপ্যান এগিয়ে দেয়—আরও প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে।

অনুরাধা অবুঝ হয়ে যাওয়ার পর কাশীকান্ত ও অনুরাধার রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি দেখাশোনার জন্য ছেলে মানে কুশল—একজন পার্টটাইম রাঁধুনি-কাম-নার্স রেখে দিয়েছে।

বুড়ো মানুষ দুটোকে ভাল না বাসুক ক্ষমতাবান ছেলের দাপটে কাশীকান্তর বা অনুরাধার যত্নের কোন খামতি হয় না। শুভম তার ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে এক একদিন এক এক গান বারবার শোনে আর পায়ে তাল বাজায়। কখনও বা ছোট্ট টেপ রেকর্ডের গানের সাথে নিজেও গুনগুনিয়ে সুর মেলায়।

কাশীকান্তর শরীরটা বিট্রে করলেও বুদ্ধির ভাণ্ডার একেবারে ঝকঝকে। চোখ বা কানও ফুরিয়ে যায়নি।

শুভমের গলাটাও বেশ তৈরি। 'মন চল নিজ নিকেতনে'—কথা ও সুর বেশ খুলছে তার গলায়।

কাশীকান্তর মনে প্রশ্ন জাগে এ তরুণ বয়সে শুভম এমন গান গাইছে বা শুনছে কেন? আমরা তো তার বয়সে খেয়াল ঠুংরি টপ্পা আরও নানা রকম রসের গান শুনতাম। হোলির গান, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান ভাল লাগত। অবশ্য যত ছেলে এখানে কাজ করে গেছে তাদের মধ্যে শুভমের ধাতটা একটু আলাদা। আগে তো এখানে কাজ করতে আসতো যারা তারা বেশিদিন থাকতই না। শুভমরা নাকি ত্রিপুরা ব্যাণ্ড নামে একটা বাংলা ব্যাণ্ড খুলেছে। এ ব্যাণ্ডের মাধ্যমে এরা সাংস্কৃতিক আন্দোলন করে। হুঃ, কুশল কলেজ পড়ার সময় বাবাকে না বলে এমন কিছু একটা করতো। এতদিন টিভিতে ব্যাণ্ডের গানের হেডিং দেখলেই টুপ

করে চ্যানেলটা বন্ধ করে অন্য চ্যানেলে চলে যেত কাশীকান্ত। কিন্তু এখন শুধু শুভমের কারণে ওদের কথা জেনেও ওর গান শোনা। সেবা পরায়ণতা কর্তব্য বোধ দায়িত্বজ্ঞান মূল্যবোধ এসব দেখে মনটায় কেমন নাড়া দেয় কাশীকান্তর। নতুন করে জানতে ইচ্ছে করে ওদের চিন্তার জগৎটাকে। জেনারেশন গ্যাপ বলে যে সমাজে একটা রব উঠেছে তার জন্য শুধু এরাই দায়ী নয়। বয়স্ক তথা সিনিয়ার সিটিজেনরাও নিজেদের জমানার সঙ্গে তুলনা করে ওদের অ্যাভয়েড করে। আরে শীতের ফুল কি গ্রীষ্মে ফোটে। সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ীই ত যুবকদের চলন বলন হবে।

পিতৃভক্ত সন্তান কুশল শুভমকে তুলে এনেছে বেশ ক'মাস আগে বুড়ো বাপকে দেখভালের জন্য। তার ডিউটি সপ্তাহে পাঁচ দিন। শুভম তার কাজে বিন্দুমাত্রও গাফিলতি করে না।

এসব কিছু নজরে রাখার মতো মস্তিষ্ক সজাগ আছে কাশীকান্তর। স্ত্রী অনুরাধার মতো ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। অনুরাধা কাশীকান্তর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়সে—ফেলে ছড়িয়ে বার তের বছরের ছোট তো হবেই। তবু সে মস্তিষ্কের সবকিছু খুইয়ে বসে আছে। একমাত্র সন্তান কুশল গ্র্যাজুয়েশন করার পর আই এ এস পরীক্ষায় যেবার প্রথম বসে, সেবারই তার গর্ভধারিণী বিপাশা হঠাৎ করে সামান্য জ্বরে ওপার চলে গেলে—কারা যেন ধরে বেঁধে তখন অনুরাধাকে এ বুড়োর সঙ্গে বিয়েতে রাজি করিয়েছিল। কীভাবে কী হয়েছিল সে কথা আজ আর মনে পড়ে না কাশীকান্তের।

শুধু একা থাকার ভয়ে সেদিন পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও বিয়ের কথা শুনে পিছোতে ইচ্ছে করেনি।

বাবা মিশুক স্বভাবের মানুষ নয়, মা চলে গেলেন বাবা একা থাকবেন কী করে? কুশল তাই আই এ এস কোর্সের (কোচিং ক্লাসের) পড়া ছেড়ে দিল্লি থেকে আগরতলায় ফিরে আসতে চেয়েছিল। সবাই বিশেষত তার মামা মাসিরা বাধা দেয় সে সময়। কাজেই মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি সেরেই নেড়ামাথা নিয়ে দিল্লি ফিরে গিয়েছিল কুশল। তারপর?

বেশি বয়সে আসা ছেলেকে কেন্দ্র করে বিপাশা আর কাশীকান্তর সাজানো সংসারের স্মৃতি অস্থির করে তুলত একা ঘরে কাশীকান্তকে । দিন পোহালে রাত আর রাত পোহালে দিন সবই তার কাছে বিষময় তখন। বিপাশা ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। লোকজনের আসা-যাওয়া, খাওয়া-খাওয়ানো হৈচৈ, গান বাজনা বিপাশা ভালবাসত। নিরিবিলি স্বভাবের কাশীকান্ত মোটেই বরদাস্ত করতে পারত না এসব। বিপাশা সংসারের খরচ বাঁচিয়ে কীভাবে যে মেনটেন করতো! হঠাৎ করে বিপাশা চলে যাওয়ার পর কাশীকান্ত নিজেকেই প্রশ্ন করে—তবে কি আমিও এতো মানুষ এতো পাগলামো পছন্দ করতাম?

কাশীকান্তর এখন মনে হয়, এ বংশের পুরুষদের যেন সবারই ছিল পত্নী বিয়োগের যোগ। বিপাশা চলে যাওয়ার কিছুদিন পর বড়দার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মানে কাশীকান্তর চেয়ে বছর সাতেকের ছোট, বড়বৌদি এসে বলেছিল ঠাকুরপো—এ বয়সে বিপাশাকে ভুলে কি

আর বিয়ে করা সম্ভব? অথচ এ খা খা একা বাড়িটায় থাকবেই কী করে? তোমার বড়দা বলছেন একটা পনের কুড়ি বছরের ছেলে এনে রাখতে। এমন একটা ছেলে আছেও হাতের কাছে। সে তোমার সাথে থাকবে দিনরাত, ফাই ফরমাস খাটবে, রাতে ঘরে ঘুমাবে। কিন্তু শেষ অব্দি এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি কুশল। ভবিষ্যতে প্রশাসক পুত্র বলেছিল জেঠিমণি ছেলেটা যদি টাকা পয়সার লোভে বাবাকে খুন করে সব কিছু নিয়ে পালায়?"

এ ভয়টাই তখন গিলে খাচ্ছিল কাশীকান্তকে। সারাদিন টিভি দেখে দেখে ক্লান্ত একা বয়স্ক মানুষটার কল্পনার চোখে দুটো শক্ত পেশীবহুল হাত, তার গলাটিপে ধরার জন্য এগোচ্ছে দেখে চমকে উঠত।

মামাতো বোন অনন্যা একদিন এসে বলেছিল, দাদা তুমি একা একা ঘরে থাক, কখন কী ঘটে ভেবে চিন্তায় মরি। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে যে মেয়েটি কাজ করে, তার বিধবা দিদিমার বয়স বছর পঞ্চাশ বাহান্ন হবে। ওকে যদি নিয়ে আসি—তোমার কাজকর্ম করা, সংসার সামলানো এসব তো সুবিধা হবে বলে মনে হয়। নিয়ে আসব দাদা?

কাশীকান্ত তখন এক কথায় জবাব দিতে পারে না। চিন্তা হয়, বয়স হয়েছে তো কী হয়েছে? পাড়ার ছেলেরা বা মহিলার আত্মীয় স্বজন বা মহিলা নিজেই যদি প্রচার করে যে তার প্রতি অশালীন আচরণ করা হয়েছে? তাছাড়া গভীর রাতে একা ঘরে চোখে ঘুম না এলে যদি আমার দেহেই আদিম লালসা জেগে ওঠে?

নিজ নিজ বুদ্ধিমতো উপকার করতে এসে বিফল মনোরথ হয়ে বিরক্তিতে ভাইবোন, শালাশালি আত্মীয়স্বজনরা মুখ ফেরায়। কানে বাজে বিপাশার রাগের কথাগুলো।

ভালবাসা, বউ-এর প্রতি টান বা বউকে নিয়ে আদিখ্যেতা এসব কিছু না—তুমি শুধু নিজেকেই ভালবাস। তোমার নিজের সাধ মেটানোর জন্যই সংসার। নিজের চাওয়া আর মক্ষীচুষের মতো টাকা জমানো ছাড়া অন্য কিছু বোঝ? মরলে তো হাত দুটো সঙ্গে যাবে না? পাশ বইটা নেবে কী করে? পরে বিপাশা চলে যাওয়ার পর মনে হয়েছে, সত্যিই কী আমি হাতের মুঠিটা আর একটু আলগা করতে পারতাম না?

অথবা বাপের বাড়ি বা বোনের বাড়ি গেলে ফিরে আসার জন্য এমন তাড়া না দিলে পারতাম না? এখন কেউ এসে পায়ের ধুলোও দেয় না। আর তখন? তার বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনরা এলে ঠারে ঠারে ভাগিয়ে দিতাম আমার প্রতিদিনের রুটিন জীবনে চোট লাগবে বলে? কাছের মানুষ দূরে সরে গেলেই তার সঠিক মূল্যায়ন হয়? এখন কাশীকান্ত বিপাশাকে যেন বুঝতে পারে। সে তার স্বামীর এসব সংকীর্ণ ব্যাপার স্যাপারগুলো পছন্দ করত না বলেই একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছিল এই উদার মনস্ক মহিলা। বিপাশার কথাই সত্যি। আসলে সে চলে যাওয়ার পর আমি কি সে নেই বলে কষ্ট পেতাম? নাকি একা একা থাকার যন্ত্রণা সহ্য হত না বলে।

শতবর্ষ পূরণের মাত্র পাঁচ বছর বাকি। কাশীকান্তর এখন মনে হয়—জীবনভর যা করেছি সব কিছুই নিজেকে ভালবেসে। মায়ের শিক্ষায় লালিত ছেলে কুশল তার অসাধ্য

কর্তব্য পালন করলেও আমি মনে করি সে যেন যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। কিন্তু আজ শুভমের বাজানো গানটা 'মন চল নিজ নিকেতনে' শুনে বার বার মনে হয় এ গান আমায় সচেতন করার জন্যই রচিত হয়েছে।

শুভম দাদ ঔষধ খাও বলে জল আর ক্যাপসুল নিয়ে দাদুর কাছে এলে—কাশীকান্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে—তুই এ গানটা শুনছিস কেন বারবার? দাদুর কথায় চমকে উঠে শুভম বলে—কোন গানটা দাদু? কাশীকান্ত জড়িয়ে জড়িয়ে ঘেড়ঘেড়ে গলায় বলেন, তুই কি আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাস যে আমার ঘরে ফেরা উচিত?

আবার জিগ্যেস করে—তুমি যে কী বলতে চাইছ, আমি তা বুঝতে পারছি না দাদু।

ঐ যে 'মন চল নিজ নিকেতনে'গানটা বাজিয়ে কি আমায় সচেতন করছিস?

এতো সাত পাঁচ না ভেবে শুভম বলে—দাদু তোমাকে তো বলেছি আমাদের ব্যাণ্ডের কথা? সে ব্যাণ্ডের জন্য নানা ধরনের গান আমরা শুনি। কোন্ গানে কোন্ প্রোপারটি আছে খুঁজি--তাই এ গান শুনি।

ওঃ তাই বল!

কাশীকান্তর জীবনে যেন আজ বাঁক নেওয়ার দিন। নানা প্রশ্নেরা এসে ভিড় করছে তার মাথায়। সত্যিই তো আর কতো—কতটা বছব যাবত একই আকাশ, একই বাতাস, একই প্রজাতির পাখির গান শুনে, আর একই লতাগুল্ম দেখে কাটানো? একই চন্দ্র সূর্যের উদয়াস্তর পথের পাশে বসে থাকা? আর তো দেখার কিছু নেই? তবে কেন এতো শারীরিক যন্ত্রণা, অর্থব্যয়, সন্তানের কর্মব্যস্ত জীবনে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে মাথার বোঝা হয়ে থাকা? আজ শুধু একই প্রশ্ন আসছে ভেতরে থেকে—কেন বেঁচে আছি আমি? বিপাশার গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের কলিটা মনের ভেতরে আজ উথালপাথাল করছে 'শেষ কোথায়/পথের শেষ কোথায়... সম্মুখে ঘন আঁধার ভারি ক্ষণে ক্ষণে। মরিচিকা অন্বেষণে...।' সত্যিই তো আমার এ জীবন পথের শেষ কোথায়? সারাদিন মনেব মণিকোঠায় এক অন্য আলোর দিশা সঞ্চারিত হচ্ছে আজ। সত্যিই ত এ সংসার তো আমার কাছে এখন বিদেশ। আমার ভ্রমণ সাথি কবে বিদায় নিয়েছে। কুশলরা যেমন সপরিবারে ছুটি কাটাতে স্বল্প দিনের জন্য ভ্রমণে যায়, আবার আপন কর্মক্ষেত্রে, আপন ঘরে ফেরে, তেমনি তো আমার ফেবার চিন্তা করা দরকার। জীবনের দীর্ঘকাল তো কাটানো হল? বিপাশাব বাবা মানে শ্বশুরমশাই বলতেন— জগতের হিতকর্ম সাধনই জীবনের ধর্ম। জীবন কিছু সহজ কথা নয়। জীবন একটি প্রক্রিয়া, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে হাত ধরে এগোয়। জীবন মানে তো গতি। চলমান স্রোতের মতো তার ধারা। কিন্তু এই পঁচানব্বুই বছর বয়সে সে গতিই বা কোথায় আর...। জন্মের মাধ্যমে এ ধরাধামে এসে কিছু সময় কাটিয়ে চলে যাওয়া আপন উৎসে। জন্মমৃত্যুর মাঝখানের সরু গলি পথটাই জীবন। এ জীবনটা তো ভ্রমণ কেন্দ্র, এ জীবনটা তো বিদেশ। এ বিদেশ থেকে আমাকে আমার নিজের আশ্রয় নিজের পরিমণ্ডলে যে ফিরতেং হবে। অথচ পঁচানব্বুই বছর বয়সে আমি এক স্থবির পদার্থের মতো পড়ে আছি বিছানায়। কর্মহীন প্রেমহীন গতিহীন

এক জড় বস্তুর মতো। বিপাশার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই এর প্রতি খুব নেশা ছিল। একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম— প্রকৃতির খেয়াল হলো 'নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা। আর সে কারণেই পরিপক্ক বীজ ফুটে অঙ্কুর হয় তা থেকে বের হয় চারাগাছ। চারাগাছ বেড়ে পত্র পুষ্পে শোভিত হয়ে নতুন পরিপুষ্ট বীজের সৃষ্টি করে। বীজ পাকে, তা থেকে হয় আবার অঙ্কুর...। বীজ পরিপক্ক হলেই প্রকৃতির খেলার মাঠে গাছের প্রয়োজন শেষ। পুরোনো গাছের ছুটি।' কাশীকান্তর মনে হয়, যেখানে পড়েছিলাম সেখানকার ভাষাটা অন্য রকম হলেও ভাবটা ছিল এমনই। আমার তো ছুটির ঘন্টা বাজার সময় পারই হয়ে গেছে। তবে আর কেন? কুশল যখন ছোট ছিল তখন বিপাশা আদর্শ লিপিতে তাকে পড়াতো 'ঔষধি বৃক্ষ ফল পাকিলে মরে।' প্রকৃতির ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে আমারও তো বংশধরের প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেছে। আজ মনে হচ্ছে মানুষের জীবনটাও তো ঔষধি বৃক্ষেরই মতো। জন্ম থেকে শৈশব বাল্য কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছা। যৌবনের পৌঁছানো পর্যন্ত চলে প্রকৃতিকে ফলদানের প্রস্তুতি। নবসৃষ্টির আয়োজন। যৌবনই ধরিত্রীকে সেবা করার শ্রেষ্ঠ কাল। সে সময়েই মানুষ মানুষের জন্য কাজ করে, বিবাহিত জীবনে সংসার ধর্ম পালন করে, সন্তান উৎপাদন—মা, বাবা, স্ত্রী,সন্তান সবার প্রতি কর্তব্য পালন ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গলসাধন করে। আসলে যৌবনকালই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। আমাদের অবচেতন মনে সে অনুভূতিটা জাগ্রত বলেই শিশু পুত্র বাবার মতো টিচারের মতো কাকা মামা দাদার মতো চলতে চায়। খেলাচ্ছলে তাদেরই অনুকরণ করে। বড় হওয়ার বাসনায় হাঁটা শেখার সাথে সাথেই বড়দের চটি পরে হাঁটতে চলতে চায়। কন্যা শিশু অবশ্য বাবা নয় তার যুবতী মাকে অনুসরণ করে, স্কুলের ম্যামকে বাড়ির পিসি, মাসি, মামী, কাকীদের অনুকরণ করে। অপর পক্ষে প্রৌঢ় আবার জীবনপথের সম্মুখ পানে না তাকিয়ে যৌবনকেই ধরে রাখতে ব্যাকুল চিন্তায় চেতনায় চলনে বলনে সাজসজ্জায় এরা যৌবনের দূত হিসেবেই নিজেদের হাজির করতে চায়। আর সে সাইকোলজি মাথায় রেখেই ত্বকের যত্ন, চুলের যত্ন, নানা ধরনের পোশাকের বিজ্ঞাপনে বয়স চেপে রেখে যৌবনকে উদ্ভাসিত করার এত আয়োজন। জীবনের পরম লগ্ন হল যৌবন। কাশীকান্ত ভাবে যৌবনকে পেছনে রেখে কত পথ যে পার হয়ে গেছি তার কি কোন হিসাব আছে? যৌবনকে যতই ধরে রাখার চেষ্টা কর বাবা, বেশি আয়ু পেলে সে একটা জীবনে বার্ধক্যই হয় গ্রীষ্মকালের দিবা ভাগের মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

আজ গানটা শুনে মনে হচ্ছে— আমার এ বন্দরের কাল ফুরানোর পালা এসে গেছে। জীবন থেকে মরণে পাড়ি জমানোর দিন এসে গেছে। কে যেন বলেছিল মনে আসছে না , তবে কথা হল অবিনশ্বর আত্মা জীবন থেকে মরণে ঘুরে বেড়ায় আপন খেয়ালে। কারণ আত্মা যে অবিনশ্বর তাকে আগুন পোড়াতে পারে না, অস্ত্র কর্তন করতে পারে না, কালও ধ্বংস করতে পারে না। আর পঁচানব্বুই বছর বয়সে আমার যে দেহটা নিয়ে টানা হেঁচড়া হচ্ছে, যাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এত ব্যবস্থা, সে আত্মার একটা খোলস বা পোশাক ছাড়া

তো কিছু নয়। মানুষ যেমন ছিন্নবস্ত্র ত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জরাগ্রস্ত পুরানো দেহটা পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। পুরানো বস্ত্র ত্যাগকে বলা হয় মৃত্যু, আর নববস্ত্র ধারণ মানে নবজন্ম লাভ।

শুভম ঔষধ খাওয়াতে গিয়ে ডাকে, দাদু, দাদু, ঔষধ খাওয়ার সময় যায় যে চোখ খোলো, হাঁ করো। জড়িত কণ্ঠে দাদু বলে— ছিন্নবস্ত্রটাকে আরও সেলাই করে ধরে রাখতে চাও?

শুভম ভাবে আজ আবার এ কোন ভাব হলো। যে ঔষধ দিতে সামান্য দেরি হলে পাগলা হয়ে ওঠে, তার আজ একি মতিভ্রম! আবার ডাকে সে, দাদু চোখ খোলো, হাঁ করো। কাশীকান্তর কানে বেজেই চলে

'মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে, বিদেশির বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।'

ওয়ারিশ

যেখানে বাচ্চাদের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেখানেই লতিকাকে দেখা যাবে উজ্জ্বলার হাত ধরে হাজির হতে। উজ্জ্বলার মধ্যে লতিকা শয়নে স্বপ্নে দেখতে পায় প্রতিভাব স্ফুরণ। উজ্জ্বলা যখন নাচে, তখন তার মনে হয় এমনটি আর কেউ পারে না। একই অবস্থা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা গান আবৃত্তি পড়াশোনা বিষয়ে। লতিকার এ কন্যারত্নটিকে ঘিরে আদিখ্যেতা দেখে গজ গজ করে অশোকতরু। লতিকা বুক দিয়ে আগলে রাখতে ব্যস্ত তার সোনামণিকে।

ব্যস্ত হবেই বা না কেন? উজ্জ্বলা যে বম্‌মা ছাড়া আর কিছুই জানে না। এক ছেলের মা লতিকার এসব সাধ তো আর পূর্ণ হয়নি। স্বামীর এ মানসিকতার বিষয় জেনেই যৌবনকালে ছেলেকে একটু গান শেখাতে বসলেও অশোকতরু বলত, গানের কাম নাই, পড়াশোনা লইয়া ব'বাবু। সে বাবু অশোকতরুর মনের মতো মানুষ (?) হয়ে অন্যরাজ্যে চাকরি বাকরি করে সংসার ধর্ম পালন করছে এখন।

অশোকতরু উঠতে বসতে লতিকাকে শোনায় পেনশন বা বাড়ির অংশ কিছুই পাবে না এই উড়ে এসে জুড়ে বসা বোঝা। অশোকতরুর অভদ্রতার ভয়ে মুখফুটে কিচ্ছুটি বলে না লতিকা। উজ্জ্বলাকে বুকে ধরে মনে হয়, গয়নাগাঁটি সব বেচে জিপিএফ থেকে লোন নিয়ে বাড়ি কেনার বেশির ভাগ টাকা আমি দিলেও, ভদ্রতার খাতিরেও তো একবার সে বাড়িটা আমার নামে করার কথা বলেনি?

ভলান্টারি পেনশনের পর অশান্তির ভয়েই না—সমস্ত টাকা পয়সা আর পেনশনের বই তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। বাবু বলতে অজ্ঞান সে, কিন্তু আমার পেটের সন্তান হলে কি হয় বিশাল অঙ্কের টাকা আয় করলেও মা বাবাকে কি ছিটাফোঁটা দেয়? বরং প্রয়োজনে সেই হাতপাতে। গেল বছরও ছেলের স্কুলে ডোনেশন দিতে টাকা চেয়ে নিয়েছে অথচ ফোনে যদি বলি—বাবু বড়ো একা লাগে রে, তোদের দেখতে খুব ইচ্ছে করে। জবাবে বলে—আজকাল সব বাপমাই একলা থাকে। তোমাদের কথা মনে হলেও বাবুর স্কুল কামাই করে আসা সম্ভব নয়।

লতিকার সব অভিযোগ মনে মনেই। মুখ খুলে বলবে কার কাছে? অশোক চিরকালই আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ভাবনা চিন্তা চাওয়া পাওয়ার শেয়ার কাউকে সে করতে চায় না কোন কালেই। বিয়ের পরে পরে তো এমন আচরণের জন্য অভিমানই হতো। পরে লতিকা বুঝে নিয়েছে, মান অভিমানের মূল্য ও মানুষের কাছে নেই। এজন্যই সে ছেলের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল, জোটেনি তাও। তাই এখন এ বয়সে অন্য কথা ভাবে।

বউমার ডেলিভারির সময়ে লতিকা ভলান্টারি পেনশন নিয়ে ছেলের কাছে চলে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় অশোকতকর কী আনন্দ। লতিকার মনে হয় অশোক তার বিবাহিত জীবনে কখনও এমন উচ্ছ্বসিত হয়নি। বারবার প্লেনে ওঠার আগে টিকিট কেটে এনেই বলেছিল, লতু আমার কী মনে হয় জান, এই খরচটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ খরচ। ভাব তো, বাবুর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমরা কত আনন্দ করব। ছোট ছোট হাত পা নেড়ে সে খেলা করবে, আর আমরা দেখব। লতু বৌমাকে তুমি শিশুপালন, মা ও শিশুর যত্ন, এসব বিষয়ে শিখিও। নাতি-নাতনি নিয়ে তার জল্পনা কল্পনার শেষ ছিল না।

কিন্তু জীবনভর যে হাসপাতালে ধাত্রীর কাজ করেছে সে নাকি শিশু পালনের আধুনিক রীতিনীতি জানে না, বাচ্চাকে তেল মাখালে তার মা মনে কষ্ট পায। একদিন মুখের ওপরই বলে দেয় দিয়া, বাচ্চাকে নাড়তে চাড়তে সখ তো আমারও হয়?

সারাদিন আপনারা এভাবে ঘিরে রাখলে আমরা ওকে কী করে পাব?

এরপর আর অপেক্ষা নয়, ছেলে ঘরে ফিরতেই তার হাতে ঘরে ফেরার টিকিটের টাকা ধরিয়ে দেয় অশোক।

বিস্মিত বাবু বলে—এটুকু বাচ্চাকে ফেলে তোমরা চলে যাচ্ছ, একবার ভাবলেও না, দিয়া কী করে বাচ্চাটা সামলাবে!

স্বামী স্ত্রী পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে।

ছেলে বউ তো সময় পায় না, তাই বছরে রিটার্ন টিকিট কেটে সপ্তাহের জন্য মা-বাবা গিয়ে ছেলে বউ নাতিকে দেখে এসে ওদের স্মৃতিচারণ করে। তবু রাত কাটলে দিন কাটে না। এমন মানসিক অবস্থায়ই লতিকা সিদ্ধান্তটা নেয়। দীর্ঘদিনের ধাত্রী লতিকা একটা এন জি'ও-র শিশু নিকেতনে কাজ পেয়ে যায় চাকুরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার পর। এখানকার সবাই বলে—বাচ্চা আসে, বাচ্চা অ্যাডপট হিসেবে নিয়েও যায়। কিন্তু এ মেয়েটি ঠেকে আছে দু'বছর ধরে।

তিন বছর বয়সে এসেছিল। এখন বয়স পাঁচ বছর। এ সংস্থার কাজই হল অবহেলিত শিশু—তাকে রাস্তায়ই পাওয়া যাক বা নার্সিংহোম বা হাসপাতালে—এখানে এনে সেবাযত্ন করে আইনানুগভাবে দত্তক দেওয়া।

লতিকা এখানকার আট দশটি বাচ্চাকে সেবাযত্ন করে পোশাক পরায়, বিকেলে নিয়ে বেড়ায়, খাওয়া-দাওয়ায়, যারা কথা বলতে পারে তারা আন্টি বললেও সেই মেয়েটি লতিকাকে বলে বম্‌মা। ডিউটি শেষে চার্জ হ্যাণ্ডওভার করে যাওয়ার সময় রোজ লতিকার আঁচল ধরে বলে—আমায় ফালাইয়া যাইওনা বম্‌মা, আমি তোমার লগে শুমু। পরদিন ডিউটিতে এলেই শেফালি বলে, কী যাদু করেছিস লতাদি, তোর ভক্তের যন্ত্রণায় তো আমি অন্যদের সময়ই দিতে পারি না।

এমনি করেই বাচ্চাটির প্রতি টান বেড়ে যায় লতিকার। বাড়িতে গিয়ে বলে স্বামীকে—শোনো, তোমার আমার একটা সাথি খুঁজে পেয়েছি যাকে চটকালে, আদর করলে, মারধর করলে, খাওয়ালে, সাজালে কেউ কিছু বলবে না। এ সাথিটা হবে শুধু তোমার আর আমার একেবারে নিজস্ব।

অশোক বলে সাথি কী? বিদেশী কুকুর? জিভ কেটে লতিকা বলে মানুষের বাচ্চা কোলে উঠতে চাইলে কুকুরের বাচ্চা কোলে নেওয়ার কথা ভাবব কেন?

এ বয়সে একটা বাচ্চা বড় করতে পারবে?

কেন পারব না? আর সে তো সদ্যজাত নয়। বছর পাঁচেক বয়েস। বম্‌মা বলতে অজ্ঞান। জান, ওর চোখগুলো কী মায়াতে ভরা?

না হ্যাঁ লড়াই চলতে চলতে একদিন হ্যাঁরই জয় হয় এবং উজ্জ্বলা নামে মহিমান্বিত হয়ে বম্‌মা, আর জেঠুবাবার ঘর আলো করে বিরাজ করতে থাকে সেই পাঁচ বছরের মেয়ে।

হাতের কাছে চিরুনি পেলে বম্‌মার মাথা আঁচড়ায়, ফোন এলে রিসিভার হোল্ড করে হ্যালো, হ্যালো করে, জেঠুবাবাকে তাসের প্যাকেট, বাজারের ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলে—জেঠুবাবা, আমি ভাল মেয়ে না?

লতিকার আদিখ্যেতা দেখে বিরক্ত হলেও এক্ষেত্রে—'তুই বালা মাইয়া,' বলে মাথায় হাত দেয় অশোকতরু।

মেয়েকে নিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে করলেও লতিকা কাজে যায়। সুবিধা পেলে প্রাইভেট ডেলিভারি করিয়ে টাকা আয় করে। মেয়ের সুখের জন্যে যে টাকার বড় প্রয়োজন? ভাবে, আমি মরে গেলে টাকা থাকলে তবু তার একটা হিল্লে হবে, না হলে? যে লতিকা নিজের নামে কোনদিন কোন একাউন্ট খুলেনি সে এখন মেয়েকে নমিনি করে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলেছে।

পূর্ব পঞ্চাশের লতিকার যেন এখন ভরা যৌবন। মেয়েকে নিয়ে মত্ত হয়ে দিন কাটায়, কাজের সময় কাজে যায়। কাজের লোককে নির্দেশ দেয়, স্বামীর যত্ন করে—নিজের স্বাস্থ্যের জন্যও এখন তার বাড়তি নজর। বিয়েব বয়স হলে ওকে পাত্রস্থ করে মরতে হবে যে!

উজ্জ্বলার রং শ্যামলা। তবে বম্‌মার ভালবাসার ছোঁয়ায় এখন শরীরে তার জেল্লা এসেছে। ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই বলে—বম্‌মা এতদিন আমায় ওখানে ফেলে রেখেছিলে কেন? বম্‌মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বলে— তুমি আগে বড়ো দুষ্টুমি করতে যে মা।

অশোকতরু ভাবে কোথাকার এক নামগোত্রহীন কুড়ানি মেয়েকে ঘিরে আমার সংসারটা এখন বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে তো! দুপুরবেলা বাড়িটা এখন আর নীরবে থাকে না। কাজের মাসি ওকে খাইয়ে দাইয়ে গেলেও জেঠুর পাতের কাছে বসে সে হাত পাতে—আমায় ঐ ভাজাটা দেবে? আমাকে চাটনির আমটা দাওনা জেঠুবাবা?

মাসের শুরুতে দু'জনের পেনশনের বই থেকে মোটা টাকা তুলে অশোকতরু জীবনের প্রথম লতিকার নামে একটা একাউন্ট খুলে উজ্জ্বলাকে নমিনি করে। কেন সই দিচ্ছি একথা যেমন কোন দিন প্রশ্ন করেনি, এক্ষেত্রেও কোন প্রশ্ন করে না লতিকা।

লতিকার সামনে গজ গজ করলেও শূন্য ঘরে উজ্জ্বলার সঙ্গ আনন্দ দেয় অশোকতরুকে। ওকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে অশোকবাবুকে চানাচুর, সিঙ্গাড়া বড়ই এসব কিনতে দেখে ফিচেল ছেলেরা বলাবলি করে লতিকা নার্স কি এ বয়সে. । আবার এরাই মন্তব্য করে ধ্যাৎ তাব মা হওয়ার বয়স কবে পার হয়ে গেছে! উজ্জ্বলাকে নিয়ে এমনি করে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌছা দুটো নরনারী বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়।

লতিকাকে অবাক করে দিয়ে একদিন অশোক বলে— উজ্জ্বলা মেয়ের জন্মদিনটা করলে হয় না?

বিস্মিত লতিকা বলে, ওর জন্মের তাবিখ কি আমরা জানি? অশোক বলে, নিকেতনেব কাগজপত্রে জন্মের তারিখ আছে না?

বহুদিন পব লতিকার বাড়িতে লোকজন আসে। এন জি ও-র মেম্বার শিশুনিকেতনের আসার-যোগ্য বয়সের শিশুরা, ডেয়ারির কর্মচারীরা, বড়দার ভাতিজির জন্মদিনে সবাই আসে। উজ্জ্বলাকে মনের মতো করে সাজিয়ে বাববার চুমু খায় লতিকা।

ডেয়াবির সকাল বিকাল দুধ সাপ্লাইর হিসাব নিকাশ থেকে ছুটি নেয় আজ অশোকতরু।

মেয়েকে সাথে নিয়ে দু'জনে মিলে কাগজ কেটে বেলুন ফুলিয়ে ঘর সাজায়। ডেয়ারির কর্মচারীকে দিয়ে লিখিয়ে আনা 'হ্যাপি বার্থ ডে টু উজ্জ্বলা' দেওয়ালে লাগিয়ে অশোক বলে, আর কী চাই গো?

লতিকা বলে কেক? কেক কই? ফটোগ্রাফার? আর ছয়টা মোমবাতি? আবার অশোব আর লতিকার সংঘাত বাঁধে। অশোক বলে পাঁচটা মোম, লতিকা বলে নানা ছ'বছরে পা দিচ্ছে যখন তখন ছয়টা মোম লাগবে।

লতিকার ইচ্ছায় হোম ক্যাটারার থেকে মাংস পোলাও আসে। নাতির জন্মদিনে দেখেছে রিটার্ন গিফট দেওয়ার রীতি। বাচ্চাদের হাতে রিটার্ন গিফ্ট হিসাবে বেলুন চকলেট এসব তুলে দেয়। উজ্জ্বলার জন্মদিনে ভাল টাকা খরচ হলেও অশোকের মনটা খুশিতে ভরে যায়।

উজ্জ্বলা, উজ্জ্বলা, উজ্জ্বলা! তোকে আমরা বিয়ে দিয়ে যেতে পারব তো মা? তুই আসবি জানলে মিলিটারির চাকরি থেকে আসার সময় পাওয়া টাকায় ছোট্ট একটা বাড়ি করে রাখতাম।

উজ্জ্বলা জেঠুবাবার গালটিপে বলে—একা একা তুমি কী কও জেঠুবাবা?

অপরাজিত বলে আজকাল মা বাবাতো ফোন করে খুব কম। ওদের হল কী?

দিয়া বলে এরা ভাল থাকলেই হল, ফোন করলে বা না করলে আমাদের কী আসে যায়। মায়ের ফোনের কান্নাকাটি নিয়ে কথা বলতে বলতে যখন স্বামী-স্ত্রী ছুটির দিনের সকালে টিফিন খাচ্ছে তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। দিয়া বলে, নিশ্চয় তোমার মায়ের ঘ্যানঘ্যানানির ব্যাপার। রিসিভার হোল্ড করে 'হ্যালো' বলতেই মায়ের খুশিখুশি সুরটা ভেসে আসে। বাবু, তোরা ভাল?

তোমরা কেমন আছ বল.?

ভাল বাবা?

মা বলে, সব ভাল। এতদিন বলিনি, একটা ভাল খবর আছে রে!

ভাল খবর? সে আবার কী?

আমরা এখন আর একা নই। আমাদের সঙ্গ দেওয়ার একজন মানুষ জুটেছে।

ভালকাজের লোক? যত ভালই হোক কাজেব লোকের কী ভরসা? ইচ্ছে হলেই চলে যায়।

তবে?

আমবা অ্যাডপট নিয়েছি।

কী — অ্যাডপট? কেন? ধপ্ করে রিসিভারটা রেখে দেয় অপরাজিত।

দিয়া বলে। কী ব্যাপার?

বলো না, বুড়ো বয়সে ভীমরতির কথা। এরা নাকি সঙ্গ পাওয়ার জন্য অ্যাডপট নিয়েছে।

অ্যাডপট? কাকে নিয়েছে? ছেলে নাকি মেয়ে? বয়স কতো?

তা আমি কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করিনি।

না জিজ্ঞাসা করলে হবে? যদি বাড়িঘর টাকা পয়সা সব দিয়ে দেয়? আইন সম্মত ভাবে দত্তক আনলে সেতো সম্পত্তির ওয়ারিশ হতেই পারে।

তাহলে এখন উপায়?

স্বপ্নের পুরুষ

চল না গো— ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে একটু ভিজে আসি।

আকাশ বলে— পাগল হয়েছ বৃষ্টিতে ভিজবে? তুমি জান না যে আমার সর্দির ধাত?

তবু আমার ইচ্ছে করছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়াকে অনুভব করে হাত ধরাধরি করে পথ চলতে।

আকাশ আবার বলে—মাথা খারাপ। ঠাম্মা নাতি কেউ বাড়ি নেই, তার-চে বরং চলো—।

সোফা ছেড়ে উঠে দরজাটা ভেজাতে গেলে বৃষ্টি তাকে আটকায়। বলে—না, না, দরজা জানালা ভেজিও না।

কেন, বৃষ্টি পড়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মেঘলা দিনে ঘুমোতে ইচ্ছে করে না তোমার?

তুমি বিছানায় যাও আকাশ, ঘুমোও। আমি খোলা জানালা দিয়ে নারকেল পাতার মাথা দোলানো, আমগাছে ঝুলে থাকা বাবুইপাখির বাসায় দোল খাওয়া দেখে এনজয় করবো আজকের এই বর্ষাঘন দুপুরকে।

আকাশ এসে হুমড়ি খেয়ে বৃষ্টিকে বুকে জড়িয়ে বলে—আমার এখন বউকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।

আকাশের এই রোমান্টিকতাহীন শরীর সর্বস্ব ভালবাসার আদিখ্যেতাই ভাল লাগে না বৃষ্টির। আকাশকে বৃষ্টি পছন্দ করে বিয়ে করেনি। মা-বাবা পত্রিকার পাত্র পাত্রীর কলাম থেকে ঠিকানা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে বিয়ে দিয়েছিলেন, বি এ পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই।

বাংলার ছাত্রী বৃষ্টি যখন আশা করত স্বামীর কাছে কোন রোমান্টিক মুহূর্তের, তখনই আকাশ. .। বিয়ের এক বছর পার না হতেই যমজ ছেলেমেয়ের মা হয়ে যায় বৃষ্টি। কীই বা বয়স তখন। ছেলেমেয়ে সামলে যখন সে নিজের পুরুষটাকে নিয়ে জ্যোৎস্নার সাগরে চাঁদের তরণী বেয়ে আকাশটার এপার ওপার হতে চাইতো, তখনই আকাশ বলত— সকালে বেরুতে হবে—তোমার মতো তো আরাম করে ঘরে বসে থাকলে চলবে না—ঘুম কম হলে শরীর খারাপ হবে।

বিছানা মানে তো অনিচ্ছুক বৃষ্টির দিনযাপনের এক প্রাত্যহিক রুটিন মাফিক পরস্পরের দেহ সান্নিধ্য। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এই রুটিন প্রেম তাকে বিষণ্ণ করে তুলত। মাঝে মাঝে মনে হতো— এর নাম স্বামী সুখ? কোন সখ আহ্লাদ নেই—রোমান্টিকতাহীন শুধু চাল-ডাল-নুন-মরিচ ফ্রিজ, টিভি, গ্যাস আর শরীর সর্বস্বতা। সেই প্রথম থেকেই কাছের বন্ধুরা আগ বাড়িয়ে বলতো— অবশ্য এখনও বলে—বৃষ্টি তোর স্বামী ভাগ্য কিন্তু দারুণ রে! কী সুন্দর তোকে সবকিছু দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে!

বৃষ্টি মনের জানালায় আগল দিয়ে মুখে হাসির ঝিলিক এনে বলে—যা বলেছিস।

কলেজ হোস্টেলে থাকা মফঃস্বলের ছাত্রী মিনতি প্রায়ই বৃষ্টিদের বাড়ি ছুটির দিনে এসে আড্ডা জমাত। আড্ডাতেই সে বলেছিল— কোন বর নাকি তার সদ্য বিবাহিত বউকে বলেছিল— চলো আমরা আজ রাতভর জেগে জেগে চাঁদ দেখি।

জবাবে বউ বলেছিল— চান্দের মধ্যে দেখবার মতো কী আছে?

বৃষ্টির প্রায়ই মনে হয়—আকাশ যদি ঐ নতুন বরের মতো রোমাণ্টিক হতো?

আকাশের পাশে সন্তানদের নিয়ে শুয়ে, স্বামীর সংসার সাজিয়ে, দিনরাত তাদের সুখসন্তুষ্টি বিধান করেও বৃষ্টির মনে হয় এমন বঞ্চিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয়? আবার সকাল হয়, বৃষ্টি বাচ্চাদের স্কুলে পাঠায়, বর অফিসে যাবে বলে রান্নার মাসিকে কী রান্না হবে বলে দেয়। স্বামী শাশুড়িকে সকালের খাবার দেয়—নিজে খায়। অফিস যাত্রী স্বামীকে হাত উঁচিয়ে টাটা বলে বিদায় জানায়।

আস্তে আস্তে এ যান্ত্রিক জীবনে প্রাণ না থাকলেও একটা অভ্যাস জন্ম নেয়। এভাবেই হয়ত আরও অনেক নারী পুরুষের মতো একঘেয়ে জীবনটা তার চলেই যেতো। কিন্তু তা আর হলো কই!

২

বৃষ্টি বিকেলের জল খাবার বানিয়ে রেখে গা ধুয়ে শাড়ি পাল্টে টিপ হয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় এ সময়টায়। ছাদে দাঁড়িয়ে সারাদিন কাজের পর ঘরে ফেরা মানুষগুলোর অভিব্যক্তি লক্ষ করে। অচেনা এই মানুষগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল দেখে। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে সে, এই কী জীবন? মাতৃগর্ভের অন্ধকারের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে হাত পা ছুঁড়ে ওঁয়া ওঁয়া করে কান্না দিয়ে যাত্রা শুরু করে প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পথ ধরে বড়ো হতে হতে দেহে যৌবন এর আবির্ভাব— দেহে মনে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ—পরস্পর সান্নিধ্যের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন, এদের টিকিয়ে রাখার লড়াই, তারপর অস্তগামী সূর্যের পথরেখায় পথ চলে বুড়িয়ে গিয়ে কোন একদিন অন্য কোনখানে, অন্য কোন লোকে চলে যাওয়া।

তার এই ভাবনাগুলো কারও সাথে শেয়ার করতে ইচ্ছে করলেও—সাথি কোথায়? নিজের অজান্তেই মনের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

নিচে কি ডোরবেলের আওয়াজ হোল?

তাহলে আকাশ আজ এত আগে ফিরল? ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামে তরতরিয়ে।

দরজা খুলতেই আকাশ বলে— আমি প্রোপার্টি সেলের সাইড বিজনেস শুরু করেছি— এঁর আগ্রহে। পুষ্করের সঙ্গে বৃষ্টির পরিচয় করিয়ে সে বলে—আমাদের একটু চা-ফা খাওয়াবে না?

আকাশ পোশাক পাল্টে আসা অব্দি বৃষ্টি পুষ্কর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। কোথায় পড়াশোনা? বাড়িতে কে আছেন, মা বাবার প্রফেশন, এসব।

পুষ্করের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, তার পুরুষালী শরীরের ভাষা, সর্বোপরি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনার পর শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া এসব শুনে বৃষ্টি অভিভূত হয়।

না পুষ্করের বিয়ের ফুল এখনও ফোটেনি। বৃষ্টি অনুমান করে ওর বয়স কম করেও তার চেয়ে চার ছ'বছর কম হবে।

আকাশ এসে বসতেই বৃষ্টি বলে— তোমরা কথা বলো, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

রাতের বিছানায় দু'জন পাশাপাশি শুয়ে একই মানুষকে নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হয়।

আকাশ ভাবে, হাউসিং বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক নিজে থেকেই যখন অফারটা দিয়েছেন, তখন সে এখানে থাকতে থাকতে জবটা রপ্ত করে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে।

পুষ্করের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাটা মনে পড়ে তার। এন জি ও-তে কাজ করে বাড়তি আয় করতো আকাশ। উদ্দেশ্য ইনকামটা আরও বাড়ানো—যাতে ক্যাপিটেশন ফি দিয়েও ছেলেমেয়েকে ভাল লাইনে পড়ানো যায়। পুষ্কর সেদিন বলেছিলেন—মশাই, ইনকামই যদি করতে হয় তো কমিশনে প্রপারটি সেল-এর কাজ ধরুন।

আকাশের মাথায়ও আসে, সত্যিই যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, শিল্প বাড়ছে, সে হারে তো মাটি বাড়ছে না? আজকাল বড় বড় শহরে এ কাজ করে কতো লোক কোটিপতি হচ্ছে।

কি মশাই? প্রশ্নে চমকে উঠেছিল আকাশ। তারপর বলেছিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কী করে?

পুষ্কর তার হাতটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, সে দায় আমার।

পাকা? পাকা।

সেই যে হাতে হাত মেলানো তারপর থেকে প্রায়ই যায় আকাশ পুষ্করের অফিসে, প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়, কমিশন কেমন হবে তার সিদ্ধান্তও হয়।

পুষ্কর খুব ভাল গল্প করতে পারে। সে জন্যেই আজ ওকে বাড়ি নিয়ে আসা বৃষ্টির সাথে পরিচয় কবানোব জন্যে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে আকাশ বলে—কেমন লাগল পুষ্করকে বলো?

বৃষ্টি বলে— যে কোন মেয়ের ওকে পছন্দ হবে।

তোমার কেমন লাগল বলো?

এখনও যাচাই করি নি, তবে আমার ভাবনার সঙ্গে তার ভাবনার অনেক মিল দেখেছি।

মাঝে মাঝে সে যদি বাড়ি আসে, তো বিরক্ত হবে?

তোমার বন্ধুবান্ধব এলে কবে আমি বিরক্ত হয়েছি?

মাথা নেড়ে আকাশ বলে—না পুষ্করকে তো আমি অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাই। তাই আর কি! হেঁ হেঁ বুঝলে না, জানেমন! বলে বৃষ্টির গালে একটা টুসকি দেয়।

বৃষ্টির শাশুড়িমা কার কী অনুষ্ঠানে যেন প্রসাদ পেতে আশ্রমের গেট বন্ধ হয়ে যাবে বলে একটু আগে আগেই বেরিয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েরা তো স্কুলে আর আকাশ অফিসে।

কালো মেঘ আকাশকে এমন করে ছেয়ে আছে, মনে হয় যে কোন সময় সর্বশক্তি নিয়ে মৃত্তিকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শাশুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর গেটে তালা দিয়ে ঘরে ফিরতেই টিং টিং করে ডোরবেলটা বেজে ওঠে।

ইলেকট্রিক বিলের রিডিং নেওয়া হয়ে গেছে। ডাকপিয়ন এ বাড়ির গেটের পথ ভুলে গেছে কবে কোন কালে। বৃষ্টিভাবে , তবে এমন আসন্ন ঝড়বৃষ্টির মুহূর্তে কে আসতে পারে? অবশ্য কোম্পানির সেল পারসনও হতে পারে।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন। বৃষ্টি গিয়ে দরজা খুলতেই পুষ্কর বলে—আসতে পারি? এক মুখ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বৃষ্টি বলে—কেন নয়? আসুন—আসুন।

পুষ্কর একটা বড়ো খাম বৃষ্টির দিকে বাড়িয়ে বলে—আকাশকে দেবেন। কাল সকালে আমি স্টেশন লিভ করব এক সপ্তাহের জন্য—তাই।

খিলখিলিয়ে হেসে বৃষ্টি বলে— এতো সঙ্কোচ? হোন না আপনারা বিষয়ী, তবুও বসুন না আজকের এই ঘনঘোর বর্ষাকে উপভোগ করতে?

ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে পুষ্কর। মুখে বলে ঠিক আছে।

বৃষ্টি জিজ্ঞাসা করে—চা না কফি?

চিনি ছাড়া কালো চা।

ভেতরের ঘরে গিয়ে বেশবাস ঠিকঠাক করে, মাথায় চিরুনি বুলিয়ে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে লিপস্টিক ঠোঁটে ছুঁইয়ে ফিটফাট হয়ে নিজে পছন্দ করে কেনা সুদৃশ্য কাপ ডিসে চা আর এক ডিস পাঁপড় ভাজা নিয়ে বসার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই কানে আসে তার প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি। ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে বৃষ্টি দেখে. কাচের জানালা দিয়ে কালো মেঘ ভেঙে বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে আপন মনে ভরাট গলায় গান ধরেছে পুষ্কর। ওফ্ কী অসাধারণ!

বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো,
এলো, আমাব মনে...

বৃষ্টি ট্রেটা আস্তে করে টেবিলে রেখে তাকিয়েই থাকে। তার বুকের ভেতরে তখন গুরু গুরু মেঘ গরজি গরজি উঠছে। বুকের ভেতরে এ মাতনে সে চমকে ওঠে।

এক লহমায় মনের কোণে প্রশ্ন জাগে—আমাব কিশোরবেলার প্রার্থিত পুরুষ এ অসময়ে কেন পুষ্করের রূপ ধরে উপস্থিত হল এই বাদল দিনে?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে গোপন করতে বৃষ্টিও তাকিয়ে থাকে। বাইরের ঝড় বৃষ্টিরই দিকে।

একটা বিদ্যুতের চমকে মুখ ঘুজিয়ে বৃষ্টিকে দেখে পুষ্কর অসমাপ্ত গান থামিয়ে বলে—ও, আপনি চা নিয়ে এসে গেছেন?

হ্যাঁ, বেশ তো গাইছিলেন, থামলেন কেনো?

সলজ্জ হাসিতে সযত্নে লালিত দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে এক পাটি ঝকঝকে দাঁত বার করে পুষ্কর বলে, দেখুন শান্তিনিকেতনে বড় হয়েছি আমি। বিশ্বকবি ছয় ঋতু নিয়ে যে কতো গান, কতো

কবিতা রচনা করেছেন। বসন্তে বর্ষায় শরতে কতো উৎসব যে হতো। সে সব উৎসব আমাদের ছাত্র জীবনটাকে মাতিয়ে রাখতো। আজ এ দুপুরে একা ঘরের অলস মুহূর্তে এ ঘন বরিষণ যেন আমাকে সেই পরিবেশেই নিয়ে গেছিল। সরি, আপনি কিছু মনে করবেন না।

বৃষ্টি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—আমি শান্তিনিকেতনে পড়িনি, এমন কি সে তীর্থে যাওয়ারও সৌভাগ্য হয়নি কখনও, তবু আমার মাতৃভাষা বাংলা। স্পেশাল বেঙলি ছিল আমার পাঠ্য। আমাদের বাঙালি জীবনের পরম প্রাপ্তি যে প্রকৃতির কোলে বিলীন হয়ে আকাশ বাতাস জ্যোৎস্না তথা বিশ্ব প্রকৃতিতে একাত্ম হয়ে যাওয়া—এটা তো সত্যি।

পুষ্কর বলে, বাঃ আপনি তো দারুণভাবে বেঁচে আছেন।

সেটা কেমন?

খুব সহজ। যার জীবনে স্বপ্ন আছে, প্রকৃতির প্রতি প্রেম আছে, পাখির ডাক, আকাশের মেঘ এসব যাকে আকর্ষণ করে। বাহার রাগের সুরে মোবাইলটা বেজে ওঠে পুষ্করের। বৃষ্টি ভাবে, আকাশের মোবাইল বাজলে কানে আসে 'হাই বাবলী, ধরনের চটুল গানের সুর। আর ওর?

অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে বাইরে। চলে যাওয়াটাও অভদ্রতা এ সময়ে। কাজেই সময় কাটাতেই পুষ্কর বলে—আপনার ভাবনাগুলো যে এতো সুন্দর তা কিন্তু আজ বৃষ্টি না এলে জানাই হতো না আমার। তারপর এক সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—বৃষ্টিও ধরে এলো আর আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর সময়ও হল, চলি।

চলি বলতে নেই, আসি বলুন। মাঝে মাঝে আ-স-বে-ন।

পুষ্কর বাই করার ভঙ্গিতে বলে— সুযোগ পেলেই চলে আসব। সেই বর্ষার দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ পথ চেয়ে থাকে পুষ্করের। আকাশ যে এতো সাধারণ, 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়'-এর জীবনের বাইরে কি, জানে না, তারও চোখে পড়ে বৃষ্টির পরিবর্তন।

সপ্তাহে যেদিন যেদিন পুষ্কর আসে তার কাজের রুটিন মতো, সেদিন বৃষ্টি নতুন নতুন রেসিপির খাবার বানায়, নিজের পাশাপাশি ঘরটাকেও সাজায় অন্য আদলে। প্লাস্টিকের ফুলের বদলে গন্ধরাজ, বেলি, শিউলি ফুলের শোভায় ঘর উজ্জ্বল হয়।

এ বাড়িতে ছেলেমেয়ে এবং মাকে নিয়ে ডিনারে বসে আকাশরা এটাই নিয়ম। একদিন খুশি মুডে মা বলেন— বৃষ্টি যে এখনও এমন ভাল গান করতে পারে, হারমোনিয়াম নিয়ে না বসলে তা বুঝতেই পারতাম না!

শাশুড়ির প্রশংসাতে বৃষ্টির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আকাশ যে কিছু একটা অনুভব করছে তা বুঝতে দেয় না মাকে।

বৃষ্টির প্রাণ চাঞ্চল্য, বৃষ্টির হাসিখুশি মুখ এসব দেখে আকাশ নিজেকে সামলাতে না পেরে একদিন বিছানায় গিয়ে বলেই ফেলে—কী ব্যাপার, তোমার মুখে যে আজকাল ...।

চোখে মুখে হেসে বৃষ্টি বলে— কেন, আমার হাসিমুখ তোমার ভাল লাগে না?

বিষণ্ণ মুখে আকাশ বলে—আমার জন্যে তোমার মুখে একটা দিনও তো আলো ফুটলো না বৃষ্টি! আমার যতো পরিশ্রম সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য, তোমার মুখে হাসি ফুটানোর জন্য, নয়?

গাল ফুলিয়ে বৃষ্টি বলে—কোনদিন কী তুমি আমার মনের খবর জানতে চেয়েছ? আমার সাধারণ কোন আবদার রেখেছ? আমার খুশির উৎস কোথায়, তার খোঁজ করেছ? তুমি যখন আমাকে বুকে টেনে নাও, তখন একবারও আমি চাইছি কী না ভাবো না। বৃষ্টির কথায় আকাশের চোখ জলে ভরে ওঠে। বলে —সবার ভালবাসা প্রকাশের ভঙ্গি কি এক হয়? তুমি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের ঠাঁই কি আমার অন্তরে হয়েছে?

বৃষ্টি বলে তোমার বাইক, তোমার বাড়ি, তোমার কম্পিউটার এসবকে যেমন করে তুমি ভালবাস, আমার মনে হয়...। কিন্তু আমার চাওয়া আছে, আমার চেতনা আছে—সেসব তুমি কোনদিন ভেবেছ? যাক্ গে, ভালবাসা প্রকাশের বিভিন্ন রূপ আমার গবেষণার বিষয় নয়।

বৃষ্টির মাথায় হাত বুলিয়ে আকাশ বলে, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা তুমি ভাবো?

বৃষ্টিকে আজ যেন সত্যি বলার নেশায় পেয়েছে। বলে—কী করে ভাবব? ওরা পরীক্ষায় ফল খারাপ করলে তুমি বকুনি দেবে। সে ভয়ে আমি আর আমার সন্তানেরা কেন্নো হয়ে থাকি। ওদের ভবিষ্যৎ ভাবার স্বাধীনতা কী আমার আছে? বলে বৃষ্টি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বৃষ্টি যখন আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে, তখনই ফোনটা বাজে। আকাশ ফোন রিসিভ করে দরকারি কথা সারে।

আবার সকাল হয়। ছেলেমেয়ে, স্বামী, শাশুড়ির সকালের খাবার টেবিলে দিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিত্যদিনের মতো সকালের কাগজটা উল্টাতে গিয়েই চোখে পড়ে সংবাদটা।

বৃষ্টি কাল রাতের কথা ভুলে আকাশকে বলে— তোমর ব্যবসার পার্টনার যে চলে যাচ্ছে আন্দমানে, সুনামির পর নতুন করে দ্বীপটাকে গড়তে, সে খবর রাখো?

বাইরের পোশাক পরতে পরতে আকাশ বলে, তাকে এয়ারপোর্টে সি অফ করতেই তো রেডি হচ্ছি।

কী করে জানলে? কেন, রাতেই তো সে ফোনে বলল সব কথা।

শাশুড়ি বসেছেন টিভির সামনে। ছেলেমেয়েকে স্কুলের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এসে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে চোখের জলে বুক ভাসায় বৃষ্টি—পুষ্কর তুমি আমার স্বপ্নের পুরুষ। যাবার বেলায় আমাকে একটু দেখে যাওয়ার কথা তোমার মনে না এলেও আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার জন্মটাই ব্যর্থ মনে হতো। পুষ্কর, তোমার সঙ্গে তো আমার কোন লেনদেনের সম্পর্ক নেই, আর আমাদের বয়স যাই হোক, তোমার বোধের জগৎটা চিরকাল আমায় বাঁচার রসদ জোগাবে।

লং সাউণ্ড দিয়ে ফোনটা বেজে ওঠে। হোল্ড করে কানে লাগাতেই ওপার থেকে মেঘমন্দ্রিত স্বর ভেসে আসে, 'রবীন্দ্রনাথ বর্ষা আর প্রকৃতির ঐশ্বর্য বাঙালির সম্পদ'—ম্যাডাম, আপনার এ অনুভব চিরকাল আমায়... হয়তো আর কখনও দেখা হবে না।'

সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

উত্তরণ

প্রচণ্ড খাটাখাটুনির মধ্য দিয়ে দিন কাটছিল দিনুচরণের। একটু বিশ্রাম পর্যন্ত নেবার সময় নেই। এক একবার ইচ্ছে করে ক'দিন শুয়ে বসে কাটিয়ে দেবে, কিন্তু পারে না। দিনুর মনে হয় এই বুঝি জীবন স্রোতের ঢেউ থেমে গেলো। স্ত্রী, বার বছরের এক ছেলে, দশ বছরের এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সে আশ্রয় নিয়েছিল ত্রিপুরায়। আর ফিরে যায়নি। শহর থেকে সাত আট মাইল দূরে খাসটিলা আবাদ করেছে জঙ্গল কেটে কেটে। প্রায় কানি খানেক জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছে। আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারকেল, কলা এবং নানা ফুলের গাছ লাগিয়েছে। টিলার নিচ বেয়ে ছোট্ট ছড়া এঁকেবেঁকে চলে গেছে। বৃষ্টি হলে মুহূর্তে ফুলে ওঠে, অন্য সময় তরতর করে বালু কেটে পরিষ্কার জল গড়িয়ে চলে। মিলেছে লক্ষ্মীছড়ায়। বর্ষার জল ঘোলা থাকে, তাই দিনুচরণ অন্য সময়ে ছড়ার জলই ব্যবহাব করে স্নান করে, থালা বাসন পত্র ধোয়। ছোট্ট উঠোনেব পুবদিকে এবং পশ্চিম দিকে দু'খানা দু'চালা ছন বাঁশের ঘর দিনুচরণের। হাঁস, মুরগি,ছাগল আছে গোটা কতক। শেযালের বেশ উৎপাত। তাই চোখে চোখে রাখতে হয়। নিজের দখলে জায়গা বেশি নেই, তাই এসব বোঝা আর বাড়ায় না। ভালো গাইগরু, রাখবার শখ দিনুচরণের। পারে না এত টাকা নেই তার।

দিনুচরণ প্রথম প্রথম সোজা শহরে চলে যেতো রোজ কামের ধান্দায়। মাটি টানার লরিতে কনট্রাকটরের কাজও করেছে এক সময়। কিন্তু পারেনি ধরে রাখতে তা বেশিদিন। বেশি বেশি টাকার দেমাক ভাল লাগেনি।

সেই থেকে দিনুচবণ দড়ি তৈরি করে। উদাল এবং পাটের দড়ির কারবার দিনুর। তার তৈরি দড়ির বেজায় কদর। বেশ সুনাম হয়েছে তার হাতের শক্ত পাকের দড়ির। এই দড়ি বিক্রি করে করে চলছে দিনুচরণের সংসার। ছেলে এবং মেয়েটাকে স্কুলে পর্যন্ত দিতে পারেনি দিনুচরণ। কাকভোর থেকেই দড়ির গুণ তৈরির পালা। গুণ পাকাতে পাকাতে ওরা এগোয়। দিনু সমান হারে গোছা গোছা পাট যোগান দিয়ে দিয়ে গুণ পাকায়। দিনু বুঝতে পারে পাট ভাল না মন্দ। পাট গাছ ভাল করে জলে পচলে পাট নরম হয়। আর স্রোতজলে আছড়ে আছড়ে ধুয়ে নিতে হয়। তা হলে শনের মত পাট ফুলে ফুলে ওঠে। দেখতেও লাগে সাদা সাদা। আর এমন পাটে পাক শক্ত হয়, দড়ি ভাল হয়।

পাকানো গুণ বাড়ির চারদিকে বেড়ায় টাঙ্গিয়ে রাখে দিনুচরণ। দড়ি পাকাবার আগে গুণগুলোতে রোদ লাগলে টান টান হয়। ভাল হয় বলে কাজের এই পদ্ধতি। এ যেন মাকড়সার জাল। গোটা বাড়িটা ঘিরে রয়েছে।

— কি হে দিনু, আর কতকাল দড়ি পাকাবে। তামাক টানতে টানতে শশিচরণ একপাল গরু নিয়ে চিনিবাগানের দিকে যেতে যেতে বলল।

দিনু কোন উত্তর করে না। শালার টাকা হয়েছে, তাই দেমাক। দিনু দড়িতে পাক লাগায়।

উদাল গাছের ছাল বছরেব সব সময় পাওয়াও যায় না। ভেলকম টিলা থেকে দাগারাই আগে আগে উদালের পাট (ছাল) এনে দিত। এখন আর দিতে পারে না। তাছাড়া উদালের দড়ির প্রতি দিনুর আকর্ষণও কম। খসখসে ছাল, দড়ি শক্ত হয়। পালিশ হয় না। দেখতেও সুন্দর হয় না পাটের দড়ির মত। শক্ত শক্ত। তাই কাটতি কম।

হাট খুব কাছেই। রোববার বুধবার হাটবার। অন্যান্যদিনেও বেচাকেনা চলে। প্রতিটি হাট - বারে গোটা পঞ্চাশ বা ষাট পাটের দড়ি বিক্রি করা দিনুর কাছে কিছুই না। মাঝে মাঝে পাইকারও এনে নিয়ে যায় দড়ি।

ইদানীং বাজারের গলিতে একটা টেবিল ও টুল নিয়ে বসে দিনুচরণ। গোল গোল দড়ির চাকতিগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখে টেবিলে। এদ্দিন মাটিতেই বসত দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনে দড়ি সাজিয়ে কলাপাতায়।

ছাগলের সরু দড়ির চাইতে গরুর বড় দড়ির কাটতি অনেক বেশি। দড়ির আয়ু কম বর্ষায়। ভিজে ভিজে পচে যায় তাড়াতাড়ি। তাই এ সময় দড়ির চাহিদা একটু বেশি। মরশুমে পাট কিনে আড়ত রাখতে চায় দিনু। ইচ্ছেমত পারেও না। অভাবের সংসার টাকা কড়ির টানাটানি। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ। ওষুধ ত লেগেই আছে। ছনবাঁশের ঘর। আগুনের ভয়। ক'বছর আগে একবার সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে আট/দশ মন পাট কিনে রেখেছিল দিনু। দড়ির কারবারে সেবার বেশ লাভ হয়েছিল।

হাটের গলিতে দিনুর পাশে তরকারি, কুমড়, সবজি ইত্যাদি নিয়ে বসে রামু সর্দার। ডিম, খইল এসব নিয়ে বসে হানিফ মিঞা। এরা তিনজনে খুব ভাব। পর্যায়ক্রমে ঘন ঘন চা'র অর্ডার পড়ে। ভাল বিক্রি হলে ত কথাই নেই। মাঝে মাঝে সাথে কুকিজ, শিঙাড়া বা জিলিপি। মরশুমে দাগারাই চিনার, আনারস, পালংশাক এসবের চালান নিয়ে আসে। সেও বসে তাদের সাথে। চারজন প্রায় স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে পাশাপাশি। খদ্দেরের সঙ্গে দরদামের ফাঁকে ফাঁকে এরা সংসারের নানা কথা নিয়ে গালগল্প করে। রঙ্গরসিকতা করে।

হাটবার বাদে ওরা একসাথে বছরে দু'তিন দিন সিনেমা দেখতে যায়। এ ব্যাপারে রামু সর্দারের শখ বেশি। জানাও আছে সব কিছু পথঘাট, টিকিট করা এইসব। বেশ মজা করে সিনেমা দেখে এরা। ছেলেমেয়েদের ভিড়ে প্রথম প্রথম দিনুর লজ্জা লাগত। তারপর অভ্যেস হয়ে গেছে। রামু সর্দারের স্পষ্ট জবাব—আমরা ত আর হামাশা দেখতাছি না। বছরে না হয় দু'তিন দিন। তাও সময় সুযোগ বুঝে সুজে। একটু আনন্দ করা, ফূর্তি করা। তবে হ্যাঁ, কলকাতার যাত্রাদল যখন শীতকালে শহরের মেলারমাঠে আসতে আরম্ভ করে —তখন এরা পরামর্শ করে যাত্রাপালা দেখতে যায়। বিড়ি, সিগারেট, পান, চা, শিঙাড়া বেশ চলে। সেকেন্ড ক্লাসে ত্রিপলের ওপর। গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসা আসন করে। বেশ মৌজ করে। একবার বারুণীর মেলায় দিনুচরণ প্রচুর দড়ি বিক্রি করেছে। জমজমাট মেলা। দিনু এক চালায় দড়ির দোকান সাজিয়ে দিল। টিনের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল— ভাল দড়ি। ভাল আয়ু। বন্ধুরা নিষেধ করেছে।

বারুণীর মেলায় হয়ত দড়ি কেনাবেচা হবে না। কিন্তু দিনু বুঝে গিয়েছিল, কেবল ত বাবুরাই বারুণীর মেলায় যায় না—যায় গ্রামের চাষি, গেরস্তরাও। এদের সংখ্যাই বলতে গেলে বেশি। কাজেই ছাগল, মহিষ, গরু যাদের আছে—দড়ি তারা কিনবেই। দিনুর জগত দড়ি তৈরি আর দড়ি বিক্রির মধ্যেই সীমিত।

গ্রামসেবক ইন্দুবাবু দিনুচরণের খোঁজ খবর রাখেন। বারবার তিনি বলেছেন, ছেলেমেয়ে দু'টোকে স্কুলে দিতে। এদ্দিন দেয় নি, ভাবেওনি ওদের লেখাপড়ার কথা। এবার দিনু ঠিক করেছে – সামনের বছর শুরুতেই ওদের দু'জনকে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। অভাবের সঙ্গে লড়াই করবে একা একা। অগত্যা দড়ির গুণ পাকাতে বৌ'র সাহায্য নেবে। বৌ তার কবে থেকেই বলছে ওদের লেখাপড়ার কথা। পাত্তা দেয়নি এদ্দিন দিনুচরণ। দিনু এখন বুঝেছে ঘরের বৌ দড়ির গুণ পাকালে ইজ্জত নষ্ট হয় না। অত ঠুনকো নয় ইজ্জত; বরং ছেলেমেয়ে দুটো মুখ্যু রইলে ও' ইজ্জতে বাধবে চিরদিন। মাথা হেঁট হবে।

এরা মুখ্যু রইলে, তারই মত দড়ির গুণ পাকাবে, দড়ি তৈরি করবে। এ করতাছি না, দিনুচরণের সাফ উত্তর। দড়ির গুণ পাকাতে পাকাতে তার হাতে খস্‌খসে কড়া পড়েছে। কাল কালদাগ হাতের তালুটাকে বর্ষার কাল কাল মেঘের মত ছেয়ে ফেলেছে। এত দড়ি সে (পাকিয়েছে) তৈরি করেছে জীবনে! এক একবার ভাবে দিনুচরণ---ইচ্ছে করলে সে গোটা দুনিয়াটাকে যেন বেঁধে ফেলতে পারে। এত দড়ি পাটের আর উদালের।

হাটবারে একবার এক বাবু দড়ি কিনতে এসে বলেছিল- -- কত হে তোমার পাটের দড়ি?

দিনু বলেছিল—ছাগলের দড়ি জোড়া তিনটাকা, আর গরুর দড়ি জোড়া পাঁচ টাকা।

দড়ি তোমার এত দাম! বলে বাবু চমকে উঠেছিলেন যেন।

বাবুদের মাইনা তরতর করে বাড়ে। আর দিনুচরণের কাছ থেকে দড়ি কেনবার বেলাই যত কৃপণতা। দিনু সব বুঝতে পারে। সব টাকার খেল, টাকাকড়ির গতিবিধি লেখাপড়া না জানলেও অনুমান করতে পারে দিনু। একদিকে চলছে গাড়ি, বাড়ি, শাড়ির পরিপাটি। দিনুচরণের বরাতে কেবল হাড়ভাঙা গতরখাটা-রেশনের মোটা ভাতের জন্যে প্রাণান্ত ; এ বুলেট ভাত তার বরাত থেকে কবে যে ঘুচবে, ভাবে দিনুচরণ।

একটা জেদ বাড়ে দিনুচরণের দিন দিন। তার এ খাটাখাটুনির জীবন নিজের মধ্যে সীমিত রাখতে চায়। ছেলে ও মেয়েটাকে সে স্কুলে ভর্তি করবেই। লেখাপড়া না করলে তার মত দুঃখ আছে জীবনে। এ সত্যিটা দিনুচরণ ভাল করেই বুঝে ফেলেছে। তাছাড়া ভালটা মন্দটা যুক্তি দিয়ে পরখ করা চাই। আজকার জটিল জীবনে দিনুচরণ নিজেকে বড় অসহায়, পঙ্গু মনে করে।

দিনুচরণের বড় ইচ্ছে 'বাচই ঘরে' (গলিতে দু-চালা খোলাঘর) দড়ির দোকান খুলে বসবে। একদিন বসত মাটিতে দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে। তারপর এল টুল টেবিল। এতেও দিনুচরণের তৃপ্তি হয় না। সে একটা গদির ঘরে হাটবারে দোকান সাজিয়ে বসতে চায়। চারদিকে রিঙ্ এর মত ঝুলতে থাকবে দড়ি আর দড়ি। ছাগলের, গরুর। কত খদ্দের আসবে, পাইকার আসবে। বুক ফুলিয়ে বসে সে বলতে চায়— দেখে যাও আমার দড়ি।

দিনচুরণের সাদামাটা জীবনে কোন জটিল জিজ্ঞাসা নেই। নেই কোন জীবন দর্শন। তবে সে জানে হাটবারে দড়ি সাজিয়ে বসার মাঝে রয়েছে এক বিবর্তন। জীবনে এটার মূল্য রয়েছে। অন্তত দিনচরণ তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। দিনুচরণ জানে ধনী মানুষেরাও ব্যবসা করে, কারবার করে। তারা ব্যবসা করে বিরাট লাভের জন্য। শরীরটাকে জীবনটাকে আরাম দেবার জন্যে। আর দিনুচরণ রাতদিন খাটে কেবল পেটের খিদে দূর করবার জন্যে। আর জীবনদর্শনের তফাৎ এখানটাতেই। এসব সত্যি কথাগুলো দিনুচরণ হয়ত আজকাল বুঝতে পারে।

সংস্পর্শ

সুদেষ্ণা কাছে এসে বসল। প্রলয় একটা প্রেরণা পায় সুদেষ্ণা কাছে বসলে। মনে হয় সারাটা জীবন ও কাছে বসুক আর প্রলয় আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকুক। সুদেষ্ণা এক প্রাইভেট ফার্মে কেরানি। নেহাৎ পেটের দায়ে ও চাকরি করে। এটাই জীবন জীবিকা এখন। ওরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। তাই একটু ভাব গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে অন্তরঙ্গ হয়। তাই কাছে বসতে ওর তরফ থেকে কোন জড়তা নেই। একটা গন্ধ গা থেকে ঠিকরে বের হয়। তা প্রলয়কে দারুণ উত্তেজিত করে, অনুপ্রাণিত করে। গন্ধটা অন্যের কাছে কেমন লাগবে তা প্রলয়ের জানা নেই। তবে তার কাছে পারিজাতের চেয়েও উত্তম, বড় স্নিগ্ধ।

সুদেষ্ণা উঠতে যায়। প্রলয় বসতে অনুরোধ করে। প্রলয়ের হাতের সিগারেটটা তখন রিঙ্ করতে করতে চলে। ওর মাঝে একটা ছবি যেন উড়ে যায় নাচতে নাচতে। ধোঁয়া শূন্যে মিলায়। প্রলয় বিছানায় কাৎ হয়ে চেয়ে দেখে সুদেষ্ণা একমনে তখনও কবিতার বইখানায় চোখ বুলিয়ে চলেছে। সুদেষ্ণার সিনসিয়ারিটি প্রলয়কে সব সময় উৎসাহ দিয়েছে। প্রলয় 'এপ্রিশিয়েট' করেছে। এ যেন দুই সমান্তরাল রেখার মাঝে একখানি অনুরাগ সিক্ত প্রেরণা।

প্রলয় ধাক্কা দেয় তার সামনের চেয়ারে। এটা তার মনে হয় এ মুহূর্তে বড় অকেজো। আবার বন্ধুবান্ধব এক দঙ্গল লোক এলে এগুলোর প্রয়োজনটা কম নয়। এ সকল একরাশ চিন্তা ঠিক এ সময়টায় কোথায় মিলিয়ে যায় জানে না। গন্ধটা তাকে নেশার মত চেপে ধরে। প্রলয় বুঝতেই পারে না যে, সব ক'টি সিগারেট শেষ। খালি প্যাকেটটা ফেলে দেবে কিনা ভাবে। ভাবনার কোন উৎস সেসময় খুঁজে পায় না। তবু একটা বন্য-ইচ্ছা সারা ঘরটায় গমগম করতে থাকে। সুদেষ্ণা উঠতে চায় হাতের বইখানা রেখে দিয়ে।

প্রলয় এবারও নিষেধ করে ওকে উঠতে। ও বসে। আবার চোখ বুলিয়ে যায় কবিতার বইখানায়।

—রেখে দাও সুদেষ্ণা—ও বইখানা। গল্প কর। কথাবার্তা বল। চুপ করে বসে কবিতার

বইখানা পড়ে যাওয়াই কি জীবন। প্রলয় অনুরোধের সুরে বলে।

সুদেষ্ণা প্রলয়ের কথা মত কাজ করে।

—তুমি আজকাল আমার এখানে বড়ো একটা আস না কেন সুদেষ্ণা? প্রলয় জানতে চায়।

সুদেষ্ণা মৃদু হাসে। কিছু আগে পান চিবিয়েছে। তাই ঠোঁট দু'খানার রঙ লাল। প্রলয় পান খায় না খুব একটা। কালেভদ্রে। কিন্তু পান খাওয়া মুখ তার ভালই লাগে।

সুদেষ্ণা সুশ্রী। টানাটানা চোখ। গায়ের রঙ ফর্সা। নীল ছাপা শাড়ি পরে সুদেষ্ণা। তাতে আরও স্মার্ট লাগে। এ রূপ অন্যের কেমন লাগে জানে না, তবে প্রলয়ের ভাল লাগে। আর রোদ থেকে এলে তো ঘাম ঘাম শরীরে মনে হয় যেন কোন শিল্পীর তুলির কাজ শুকোয়নি এখনও।

পরক্ষণেই প্রলয়কে অপরাধী মনে হয়। একটা অতীত ঘটনা প্রলয়কে কেমন বিহ্বল করে।

অতীশ আর বরুণা, স্বামী-স্ত্রী। অতীশ প্রলয়ের একসময়ের বন্ধু ছিল। এখন দূরত্ব সম্পর্কটাকে ফিকে করে দিয়েছে। ওদের সুন্দর ছন্দেভরা সংসার-জীবনে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়। তারপর একদিন কোর্টে ডাইভোর্স এবং ছাড়াছাড়ি। প্রলয় যোগসূত্রটাকে অটুট রাখতে পারেনি। হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে এখনও শুনতে পায় একটি শিশুর কান্না।

—সুদেষ্ণা! আমার এক বন্ধু অতীশ আর তার স্ত্রী বরুণার কথা শুনবে? আজ থাক প্রলয়। শুনবো আর একদিন।

প্রলয়ের আব্দার সুদেষ্ণার ওপর। প্রলয়ের অনেক অনেক চাওয়াকে সুদেষ্ণা ঠিক প্রত্যাখ্যান করেছে বলা যায় না। তবে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেছে। সংসারের ছকবাঁধা জীবন সুদেষ্ণার ভয় লাগে। তাই সেপথটা তার কাছে বড় ঝাপসা। প্রলয় ঘৃণা করে না এ পথ। অথচ জোরও করতে পারে না, কারণ মনের ব্যাপ্তি দূর দিগন্তে ছড়িয়ে। আর সুদেষ্ণা তা হলে সম্পর্কটা যদি চিরদিনের মত কাট্ করে দেয়। ভীষণ ভয় হয় প্রলয়ের। তাই ওকে পাশে বসিয়ে যা পাবার তার মাঝেই তার জগৎ...তার মাঝেই তার মনের পরিধি। এটা ভাবতে মনে কষ্ট হয় না। প্রলয় বিশ্বাস করে— অনেক পেয়েও কেউ কেউ রিক্ত আবার না পেয়ে আশায় আশায় কেউ অনুরাগ সিক্ত।

কষ্ট হয়তো হয়েছে এক সময়। আজকাল আর হয় না। ফাউ একটা গল্পগুজব, আড্ডাই বা মন্দ কী। তাছাড়া ওর অস্তিত্বটা তো তার দখলেই ছিল। এ অনুভূতিটার তলদেশ বুঝতে পারেনি সে সময়। আজ বুঝতে পারে প্রলয়। বুঝতে বুঝতে ভাবে, তবে অনুশোচনা করে না কারণ মনটা তো দু'জনেরই এক বৃন্তে বাঁধা ছিল। আজ কিছু যেন বেঁকে গেছে।

কী করলে সুদেষ্ণার মনটা আবার পেতে পারে তা ভাবে না অতশত। আবিষ্কৃত দেশটার সম্বন্ধে জানতে আর কৌতূহল জাগে না। এ যেন অবসান আর কৌতূহলের দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতিযোগিতা।

—সুদেষ্ণা! তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে কেউ যেমন প্রশ্ন করে, প্রলয়ের কথাটাও এ রকম।

—বলো, প্রলয়, কবিতার বই থেকে মুখ তুলে বলে সুদেষ্ণা।

—তুমি সাহস কর আমার কাছে বসতে!

—করি।

—আগের পথ তোমার ভাল লাগে না?

— সে পথটা আজ বনানী ঢেকে ফেলেছে। তাই ভীষণ ভয় হয়।

—একটা কথা বলব সুদেষ্ণা।

—বল।

তুমি বিয়ে করবে? জীবনে জীবন যোগ করবে না?

—কাকে?

—ধরো আমরা যদি একত্রে একটি সুন্দর ঘর বাঁধি—এক হয়ে যাই।

—তা হয় না প্রলয়। মনটা একটু বেঁকে গেছে। সুদেষ্ণার দৃঢ় জবাব।

—করে নিলেই ত হয়। ঘুরে দাঁড়াও দেখবে সব ঠিক। বলল প্রলয় অত্যন্ত আগ্রহে।

—আগের বাস্তব আবার নতুন করে বাস্তব হয় না, প্রলয়। আর জোর করে করলেও তাতে আনন্দ থাকে না।

—আনন্দ উপলব্ধিটাত মনের কাছে সুদেষ্ণা। প্রলয় ওকে পথে আনতে চেষ্টা করে।

—সুদেষ্ণা বইখানা থেকে চোখ সরায় না। কী যেন পড়েই চলেছে। তা প্রলয়ের মাথায় খেলে না। সে ভাবতেও পারে না। সব এলোমেলো হয়ে যায়।

মনে হয় এ সব বই ছিঁড়ে ফেলে দিতে। নতুবা পুড়িয়ে শেষ করে দিতে। তাহলে সুদেষ্ণা এলে স্থির হয়ে বসবে। কথা বলবে, গল্প করবে, হাসবে, প্রলয়ের ভাল লাগবে। এ সব ভাবতে ভাবতে ঘাম ঝরে প্রলয়ের গা থেকে।

—ফ্যান্টা চালিয়ে দেব সুদেষ্ণা? সুদেষ্ণা চায় না, ওর ঘাম হচ্ছে না। দারুণ গ্রীষ্মেও ওর ঘাম ঝরছে না। সুদেষ্ণা বরফ ঠাণ্ডা। হিমশীতল হয়ে আছে। অথচ প্রলয় কেমন হাপিত্তেশ করছে বেজায় গরমে।

—এবার উঠি প্রলয়। সুদেষ্ণা বলে।

—লক্ষ্মীটি বসো খানিক। রোববার কোন কাজ ত নেই। বসই না আরও কিছুক্ষণ। বিকেলে চা খেয়ে বেড়াতে বার হব একসঙ্গে।

—আমার আর একখানে এনগেজমেন্ট আছে প্রলয়। আর একদিন। প্রলয় অগত্যা ওকে গেট অবধি পৌঁছে দেয়। ও কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে শরীর দুলিয়ে ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে চলে যায়। প্রলয় ঘরে ফিরতে ফিরতে বারবার তাকায় ওর দিকে।

প্রলয়ের মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়। অথচ কিছুই করার নেই। কী করতে পারে প্রলয়!

একটা ক্লান্তি, শূন্যতা তাকে চেপে ধরে। কিছুক্ষণ আগেও এরকম ক্লান্তি দূরের কথা একটা বন্য হাতির বল ছিল ওর কব্জিতে কব্জিতে। সে কী না করতে পারত। আর এখন?

ঠিক এ অবস্থায়? ভাল লাগছে না তবু রেডিওটা চালিয়ে দিল।

প্রলয়ের চোখে জল এল। মুছে নিল রুমাল দিয়ে। ভাবল সুদেষ্ণাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে আর এভাবে তার কাছে না আসতে। কলম চলে না...লিখে প্রকাশ করতে পারে ০. মনের জট, মনে লুকিয়ে থাকে কিছু কীটপতঙ্গ। জোর করে কাগজ কলম নিয়ে আবার বসল।

প্রিয় সুদেষ্ণা,

আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রিক্ত করতে এভাবে আর এসো না। তুমি চলে গেলে আমি নিজেকে হারিয়ে শূন্য হয়ে যাই। কী করব ভেবে পাই না। তুমি এভাবে আর এসো না সুদেষ্ণা, প্লিজ।
ইতি প্রলয়।

প্রলয়ের সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে। যে কথাগুলো মুখেই বলতে পারে তার জন্য চিঠি! কী দরকার এ চিঠির। তবু ছিঁড়তে পারে না এ চিঠিখানা। নিজের অস্তিত্বের এক বাঙ্ময় কালি ও কলমের রূপ খামে পুরে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার লাল সূর্যরশ্মি তার কাছে কালো মনে হল। প্রলয় যেন মাতালের মত টলতে টলতে চলল চিঠিখানা পকেটে নিয়ে।

ইচ্ছা অনিচ্ছা

বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঝিমাচ্ছিল রমজান মিঞা। দুপুরের কড়া রোদ। গ্রীষ্মের উত্তাপের রেশ একটানা খরায় বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। খেতে কাজের তবু বিরাম নাই। ভোর হতে না হতেই বলদ দু'টো, লাঙল, মই, কোদাল — এ সকল নিয়ে সোজা জমিতে চলে যায় রমজান। দুপুরে কোনমতে সংক্ষেপে চান সেরে ভাত চারটে মুখে দেয়া। কোন কোন দিন তাও হয়ে ওঠে না, জিরোবার ফুরসৎ কোথায়? তাই এ বারান্দার আসর তার কাছে অনেকখানি। দক্ষিণ দিক খোলা। খেলানো ফুরফুর হাওয়া তন্দ্রার ভাব সৃষ্টি করে। আস্তে আস্তে পা দুটো ছেড়ে দেয় সামনের দিকে। কিন্তু মুরগির বাচ্চাদের ছুটোছুটিতে তন্দ্রার ভাবটা ছুটে যায় ঘনঘন।

রমজানের বড় দুঃখ তার কোন বেটা নেই তাই। দুই মেয়ে রমজানের। বড়টার বিয়ে হয়ে গেছে। সুখেই আছে ছেলেপুলে নিয়ে। নিজের সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, আব্বার খোঁজখবরও নিতে পারে না। ছোট মেয়ে রমিজা বড় আদরের। মা-হারা মেয়েটাকে জান কবুল করে ভালবাসে

রমজান। তার দুঃখ মেয়েটার বয়েস চৌদ্দ হল তবু বাপের ব্যথা বোঝে না। বড় চঞ্চল মেয়ে রমিজা। একটু আটক, একটু লজ্জা নেই। বে-আব্রু ঘুরে বেড়ায় পাড়া। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেবল খেলা আর আড্ডা। এটা রমজানের বিলকুল অপছন্দ।

রমজান হাইতুলে আড়মুড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসল। রমিজা ঘরে নেই। 'রমি, ও বেটি রমি'— ঘুমের আমেজ নিয়ে আস্তে আস্তে ডাকে রমজান।

কোন উত্তর নেই।

রমজান বারবার নিষেধ করেছে মেয়েটাকে পাড়া বেড়াতে। যা দিনকাল বংশে কালিমা লেপন করতে কতক্ষণ। রমজান বড় সাবধান। কথায় শাসনেরও শেষ নেই। তবে আদর আর শাসন দু'টো সমান সমান আছে বলেই রমিজাও তার আব্বাজানকে ভয়ও করে, ভালওবাসে।

—আব্বা ঘুমাইছ আইজ? উঠোনে পা দিয়েই বলে রমিজা।

রমজান ঠাণ্ডা মাথায় রাগটা কড়া করে প্রকাশ করতে পারল না। শুধু বলল— কই গেছিলি রমি, অত সময় আছিলি কই!

—আব্বা,আরানদাদের বাড়ি। ভয়ে ভয়ে বলে রমিজা।

—কতদিন না তরে মানা করছি, ওসব পুলা মাইয়াদের সঙ্গে মিলবি না—তবঅ আরানদাদের বাড়ি! হক কথা আর যেন না শুনি আরানদাদের বাড়ি গেছছ।

হারানের বাবা মহিম রায় ধনী মানী লোক। বেশ নামডাক আছে, গ্রামের আর দশ জনের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে ভাবেন। তবে ছেলেমেয়েরা খুব আধুনিক। প্রায়ই শহরে চলে যায় সিনেমা, নাটক দেখতে। চলাফেরায় মেয়েগুলো তো বেজায় ছটফটে। রমজান মহিমবাবুকে সম্মান করে। তবে ছেলেমেয়েদের বেশি বেশি বাবুগিরি আর ফড়ফড়ানি পছন্দ করে না। তাই চোখে চোখে রাখতে চায় রমিজাকে রমজান। তবু যেন পেরে উঠছে না। যুগের একটা দমকা হাওয়া তার সাধ আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে দিতে চায়।

রমজানের ছোট্ট সংসার। গুছানো তার পরিকল্পনা। ধানের জমিতে চাষবাসের কাজ বর্ষায়। চার পাঁচ কানি ধানী জমি রমজানের, চারা বিছরা মিলে দুকানির মতো। রবিশস্যের মরশুমে রমজানের জেদ চাপে কী করে ভাল ফসল ফলানো যায়। আলু, কপি, মুলোআগে আগে ফলানো চাই—ভালও হওয়া চাই। হয়ও তাই। গেল বছর ব্লক অপিস থেকে মোটা টাকা পুরস্কার পেয়েছে। রমজান এ নিয়ে বড়াই করে না। এটা তার শ্রমের ফল হিসেবেই ধরে নেয়। এ আসবেই, আসতে বাধ্য। যদি সে খেটে যেতে পারে। রমজান বিশ্বাস করে কব্জির জোর যদ্দিন আছে জমিতে ফসল তদ্দিন ফলবেই। কিন্তু কদ্দিন? জীবনের পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়ে রমজান হয়তো ভাবে এভাবে আর কদ্দিন। রমজান তবু ভাবে না অতশত। যা ঘটবার তা তো ঘট বেই। তবে হ্যাঁ, রমিজাকে নিয়েই তার যত দুর্ভাবনা।

সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে নিয়ে ঘরে এসে চাটাই পেতে বসে রমজান। রমিজাকে নিয়ে দিনের কাজের একটানা ফিরিস্তি দিয়ে যায়। বৃষ্টি হচ্ছে না নিয়ম মতো। ঠা ঠা রোদ একটানা। জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল পাশের দিনুচরণের জমি থেকে জল সেচে তুলতে হবে। তার জমি

দিনুচরণের জমির চেয়ে উঁচু। তাই আইল কেটে কাড়ান দিলে জল গড়িয়ে আসবে না। সুতরাং সেঁচেই তুলতে হবে জল।

তারপর হালের কাজ। এ সব কথায় মন দিতে পারে না রমিজা। তাই অন্যমনস্ক হয়ে ছটফট করতে থাকে। রমজান বারবার সতর্ক করে দেয় রমিজাকে এসব জেনে রাখতে। রমজানের স্পষ্ট উক্তি—বেটি যাইবে ত আর এক চাষার ঘরে। অত তিড়িং ফিড়িং করি সংসারে চলা যায় না রে বেটি।

রমিজা তার আদরের আব্বার কাছে এগিয়ে আসে।

—তামাউক টানবা আব্বা ! রমিজা বলে।

— দে এক কইল্কা (ছিলিম), টিক্কা দেড়খান দিছ, তামাউক কম। যা তুন্দ ছ্যা করি ধরে টান দিলে। কইলজা এক্কেবারে ফাঁক অই যায়গি। তাছাড়া, তামাউক খাওন একা একা অয় না রে বেটি—সঙ্গি লাগে দম ফিরানের লাগি।

সত্যি রমজানের নিজের হাতে ফলানো তামাক। ভাল চারা, এবার গ্রামসেবক বাবুর পরামর্শ মতো মাটি তৈরি করেছে নিজ হাতে। জল দিয়েছে বারবার... বালু আর পলিমাটি, ভালো তামাক তো ফলবেই। আব গোল গোল বড় পাতা না হলে কিসের তামাক! রমজান জানে যত্ন নিলে কিনা হয়।

ডাবায় (হুঁকায়) টান দিয়ে দিয়ে রমিজাকে নিষেধ করে রমজান এ পাড়া ওপাড়া না বেড়াতে।

রমিজা তার আব্বাব কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে—আব্বা, আমারে একটা সেমিজ কিনি দেওনা আব্বা। নানান রঙ-এর কত সুন্দর সুন্দর সেমিজ বাইর অইছে আইজ কাইল। আরানদার বইনরা কী সুন্দর সুন্দর সেমিজ গায় দেয়।

রমজান সব বুঝতে পারে। এটা যে দেখা দেখিতে শখ চেপেছে তা বুঝতে পারে। কিন্তু দেবে না এসব জিনিস। তাই বলে— ই সব আমাদের লাগি না রে বেটি। বাবুদের মানায়, আমরা চাষবাস করি। খেতের কাজ কইরাই কুলাইতে পারি না। আমাদের মাইযাদের একখান লাল নীল ধড়া অইলেই চলে।

ইচ্ছে করলে রমজান মেয়েকে ঝকঝকে পোশাক-আশাক, গয়না সব দিতে পারে। খুশি করতে পারে মেয়েকে। বেশি না থাকলেও এ সামর্থ্য তার রয়েছে। তবু করবে না তা, রমজান এসব পছন্দ করে না। নিজের আদর্শকে সে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারবে না। রমজান চোখের জল মোছে। মনে পড়ে যায় তার স্ত্রীব কথা। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বৌ রমজানের। বার বছরের মেয়ে এলো তার সংসারে বৌ হয়ে।

রমজানের কতো ইচ্ছে। কতো স্বপ্ন ওকে নিয়ে। নানা জিনিস এনে দিতে চায় বৌকে। কিন্তু পারে না বাবা-মার চোখ এড়িয়ে কিছু দিতে। একবার বারুণীর মেলা থেকে একটা ব্লাউজ দিয়েছিল এনে, তার জন্যে কতো যে বকুনি সহ্য করতে হয়েছে রমজানকে আব্বাজানের। নিজের বৌ-র ওপর এতটুকু স্বাধীন অধিকারও ছিলো সীমিত। জীবনটা ছিলো ছকবাঁধা। এসব কথাচিত্র ভাবতে কেমন লাগে রমজানের। আস্তে আস্তে রমজানের বয়েস বাড়ল। রমজানও

বুঝে নিল তার আব্বাজানের জীবন আদর্শ।

—ঠিকইত চাষার মাইয়া, চাষার বৌ তার আবার অত সব কিতা! রমজানের সাফ জবাব।

সারাদিন কাজকাম করতে করতে ঘাম—এ সকল সুন্দর পোশাক-আশাক পরবার ফুরসৎ কোথায়। এ সংসারটা আয়নার মত পরিষ্কার রমজানের কাছে। তাই তার কড়া নজর রমিজার ওপর।

রমিজা তার আব্বার কথা শুনতে শুনতে আনাজ কুটতে, বাটনা বাটতে লেগে যায়। মাঝে মাঝে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ে রমজান। উদাম ঘরের মেঝেতে বড় ভাল লাগে তার। পরিশ্রমের শরীর তাই তন্দ্রার ভাব শরীরকে আচ্ছন্ন করে দেয়। রান্নাবান্না হয়ে গেলে রমিজার ডাকে ঘুম ভাঙে রমজানের। খাওয়া হয়ে গেলে এক ছিলিম তামাক টানে রমজান পান চিবিয়ে চিবিয়ে। এরপর হাতমুখ ধুয়ে শেষ নামাজ পড়ে ঘুমোতে যায়। তার আগে হাঁস, মুরগি দেখে নেয়। শেয়ালের যা উপদ্রব! মাঝে মাঝে গরুর ঘাস ও কিছু দিয়ে আসে এ সময়। রমজান জানে হালের বলদের ঘাস খাওয়া চাই—দুধ পেতে গেলে গাইয়ের পেট ভরানো চাই।

রমিজা কোন কোন দিন আগে আগেই শুয়ে পড়ে। মশারিটাও টানায় না। রমজান মশারিটা ঝেড়ে চারদিক ভাল করে গুঁজে দিয়ে তবে এসে ঘুমায়। অবশ্যি মশারি বছরের সব সময় লাগেও না।

তবে বর্ষায় বেজায় মশা। চারদিকে পাটখেত। সন্ধ্যে হলেই প্যান প্যান করে এরা গান শোনাতে লেগে যায়। রমজান সে সময় লম্বা খড়ের বেণী আগুন ধরিয়ে রাখে বারান্দায়। তাতে ধোঁয়া হয় খুব—মশা চলে যায়।

রমিজা ধূপ কিনে আনতে বলে আব্বাকে মাঝে মাঝে। রমজান নিষেধ করে। নিজের হাত থাকতে পয়সা খরচ করে মশা তাড়ানো চলবে না। খড়ের বেণীই যথেষ্ট।

রাতের শেষ প্রহরেই জাগে রমজান। সর্বকিছু তদারকি করে দেখে নেয় এক পলক। চোরের উপদ্রব তত না রইলেও রমজান সব সময় সতর্ক। সে জানে— সাবধানের মার নেই। হালের বলদ দু'টোকে খড় দিয়ে আসে এবার।

ভোরে মাঠে চলে যাবার আগে মেয়েকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যায় রমজান। রমিজা উঠেই গোবর ছিটা দেয় উঠোনে। পাশের বাড়ির অনুকরণে এটা শিখেছে সে। তারপর ঘর উঠোন ঝাড় দেয়। বাসন বর্তন থালা কড়াই সব ঘসে মেজে ধুয়ে এনে রান্না চাপায় রমিজা। সকাল নটা-দশটা নাগাদ আব্বার খাবার নিয়ে মাঠে যায় রমিজা।

হাল থামিয়ে আইলে বসে রমজান। জোয়াল কাঁধে বলদ দু'টো দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্রাম নেয়। মাঝে মাঝে একটু এদিক ওদিক করতে চাইলে রমজান হাঁক ছাড়ে। রমিজাও পাশে বসে জলের গেলাস হাতে নিয়ে। গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাত। বিরুন ভাত হলে তো কথাই নেই। এ যেন সোনায় সোহাগা। রমজানের খুব প্রিয় বিরুন ভাত। আঠা আঠা লাশা আছে। নেশার ভাব করে। খিদে লাগে দেরিতে। তরকারি বা কলা হলেই তোফা লাগে খেতে। হাল বেশিক্ষণ এভাবে থামিয়ে রাখে না রমজান। তাই তাড়াতাড়ি সেরে নেয়। ডাবায় (হুঁকায়) বেহুঁশ ক'টান

দিয়ে আবার হাল ধরে। মেয়েটাকে বেশি সময় মাঠে আটকে রাখে না। ঘরের 'মাইয়া' মাঠে যাবে এটা ইজ্জতে বাঁধে রমজানের। তবু করতে হয় তাকে, আর এখানটাতেই রমজানের যতো দুঃখ, খেদ আল্লার ওপর। একটা বেটা ছেলে নেই যে তার বিশ্রামের একটু ফুরসৎ করে দিতে পারে। প্রথম প্রথম ভীষণ অভিমান হতো রমজানের খোদাতাল্লার ওপর। তাই রাগ করে নামাজও কামাই করেছে এক এক সময়। এখন আর এসব করে না —বয়েসের সাথে সাথে রক্ত ঘন হয়ে এসেছে। তাই এতসব অভিমান খাটে না। আর এই জন্যে জান থাকতে নামাজ পড়া বড় একটা বাদ দেয় না রমজান। তবে নসিবের দোহাই দিয়ে কাজের মাঝেই রমজানের যতো আনন্দ। মেয়েটাকেও মাঠে আসতে দিতে আর কিছু মনে করে না রমজান।

রমজান মাঝে মাঝে শুয়ে শুয়ে কীভাবে—রমিজা তা তলিয়ে দেখে না। এতো বুদ্ধি সুদ্ধি নেই ওর। নামাজ পড়ে রমজান। আর দু'হাত তুলে আল্লার কাছে দোয়ামাগে—যাতে মেয়েটাকে কোন মতে একটা ছেলের হাতে তুলে দিতে পারে।

রমজান জানে রমিজা চলে গেলে তার কষ্টের অবধি রইবে না। তবু রমজান রেহাই চায়। সংস্কারকে মেনে নিতে চায়। সংসারের দুঃখ কষ্টের মাঝেই সে একা পড়ে থাকতে চায়। একাই লড়াই করতে চায়। শুধু দেখতে চায় রমিজার এক নতুন সংসার। তাই তো দিনদুনিয়ার মালিককে হামেশাই বলে খোলা মনে—খোদা, রমির জীবন সুন্দর অউক। রমি সুখে থাকউক।

এ যেন এক চিরন্তন পিতৃহৃদয়ের জান কবুল করা ডাক খোদার কাছে। তবু তার শরীরের ঘন রক্তের স্রোতে কেমন এক আনচান। হয়তো সংশয় জড়িত এক বোবা প্রশ্ন তার মনে—রমিজা কি সত্যই তার আব্বার জীবনপথ মেনে নেবে?

মালতীলতা টি ইস্টল

—ইদিকে একটা ফাস্টো কেলাস চা দে বাবুকে। হরিদার চায়ের স্টলে বসতেই বলল হরিদা। হরিশংকর মজুমদারকে হরিদা বলেই ডাকতো সবাই। বেজায় রসিক মানুষ এই হরিদা। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে হরিদার ভাষার মধ্যে একটা মিশ্রণ ঘটেছিল। প্রায় মাসেক হল এখানকার গ্রামের বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে এলাম আমি। সেই থেকে পরিচয়। অবশ্যি আমার সহকর্মী সমরবাবু আমাকে প্রথম হরিদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। হরিদা আমাকে অনেকটা নিজের করে নিয়েছিল। সুখ দুঃখের কাহিনি বলে যেত হরিদা। আমিও মনে প্রাণে শুনতাম হরিদার অভিজ্ঞতার কথা। গল্পের আদলে প্রাণের কথা। হরিদা আমার পরামর্শ চাইতো কোন কোন ব্যাপারে। যদিও বয়সের দিক থেকে আমার চাইতে অনেক বড়। তবু হরিদা ঠিক অনেকটা বন্ধুর মতই ব্যবহার করত।

—এই-ই স্বপন্যা , ইদিকে একটা ফাস্‌টো কেলাস চা দিবি ত বাবুকে!

—থাক হরিদা। সকালবেলা ত একবার হয়েছে। এখন থাক আর দরকার নেই।

তা কি কইর‍্যা হয় মাখনবাবু। গরম গরম চা-য়ে চুমুক দিয়া দিয়া গল্প করুন। আরে মশায়! আপনি ত হইলেন গিয়া বইলতে গেলে ছেলে মানুষ। এক কাপ চা-র সঙ্গে বেশি অইলে একটা সিঙাড়া। আর ত কিছু দিতাছি না— আর খেম্‌তাই বা কত!

—আচ্ছা ঠিক আছে, শুধু এক কাপ চা হরিদা। আমি স্বীকৃতি দিলাম।

—আইচ্চা মাখনবাবু, মাঝে মাঝে এমন কিয়ের লাইগ্যা অয় বলেন ত...?

—কী হরিদা। ঔৎসুক্য আমার চোখে মুখে। লক্ষ করলাম হরিদার মধ্যে একটা উদাস ভাবান্তর। লুকানো অনেক কথা।

—এই-ই নানান চিন্তা আইস্যা মনডারে এক্কেবারে শেষ কইর‍্যা দিতে চায়। মেয়েডার কথা আর ভুলতামই পারি না।

—আপনার মেয়ের কথা বলছেন?

—হ মাখনবাবু, আমার মামণি। মালতী মা। এই বলতে বলতে চশমা খুলে মুছে নিল হরিদা।

— কী হয়েছিল তার? জানতে চাইলাম আমি ব্যগ্রভাবে।

—আর বইলবেন না মাখনবাবু। মাত্র সাতদিনের একটানা জ্বরে মালতী মা আমার চইল্যা গেল। আমার ডাইন হাতখানা যেন খইস্যা গেছে মাখনবাবু! আমি আমার মামণিরে বড় ভালবাসতাম। একটা মুউর্তও আমার মামণিকে ছাড়া রইতে পারতাম না। এই মাইয়াডাই ত আমার আয়ের পথ খুইল্যা দিছে মাখনবাবু।

আমি বুঝতে পারলাম হরিদা অত্যন্ত শোকাহত। মেয়ের শোকে সত্যি নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। আচ্চা হরিদা, মেয়েটার স্মৃতি মুছে ফেলতে যদিও কষ্ট হবে, তবু বলছি, সুখের একটা সুন্দর জগতে সে চলে গেছে এ রকম ভাবতে আরম্ভ করুন না।

—তা কী আর পারি মাখনবাবু! হরিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

—এদিকে দু'কাপ চা আর দু'টো সিঙাড়া? দু'নম্বর কেবিন থেকে জোরে শব্দটা এল। হরিদার কানে পৌঁছল বিশ্রী অথচ কর্কশ শব্দটা। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিদার পরিবর্তন লক্ষ করলাম।

—স্বপন্যা! ও স্বপন্যা! হরিদা গর্জে উঠল প্রায়।

আজ্ঞে এই যে বাবু ...যা—ই।

—হারামজাদা শোয়ার কোথাকার। বাবুরা কহন থাইক্যা বইস্যা রইছেন। বাবুদের কী কী লাগে আগে দিবি ত?

—বুঝলেন মাখনবাবু, এদের লইয়া আর পারলাম না। চোখে চোখে রাইখ্যা ও...

হরিদা আরও বলতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললাম, একেবারে ছেলে মানুষ, কিছুদিন গেলেই ট্রেনিং পেয়ে যাবে, তখন...

—আর অইছে। পাখা গজাইয়া উঠলেই ত চলি যাইবার পালা। ফুড়ুৎ... এরা পিন্‌জিরার পাহি মাখনবাবু—একবার ছাড়া পাইলেই...

—মানে? আমি বুঝতে পারলাম না, হরিদার কথা।

— মানে খুবই সহজ মাখনবাবু। মাখনবাবু, আপনাদেরও ছেলে মাইয়া দের লইয়া কারবার। আর আমাদেরও। তবে তপাতটা অইল কুথায় বুইঝলেন? এরা একটা আস্ত বান্দর।

যেই না কিছু কাজ শিখ্যা ফেইলল—অমনি খুঁজব আর কুন ইস্টলে বেশি মাইনা পাওয়ন যায়। আর কানমন্ত্র পাইলে ত কথাই নাই। অটাৎ দেইকবেন এখদিন পিন্‌জরা খালি! মানে চইল্যা গেছে।

—সব ত আর সমান নয় হরিদা।

— সব সমান মাখনবাবু, সব বেটা সমান। শুনেন— এ 'মালতীলতা টি ইস্টলে'র বয়স আফনাদের আশীর্ব্বাদে এগার অইতে চলছে। এই দীর্ঘ ক'বছরে কম কইর‍্যা ষাট টা ছেলেরে গইড়্যা পিট্যা তৈরি করলাম। কিন্তু ফল এক-হি—অটাৎ একদিন পাহি উদাও!

—একটা জিনিসের অভাব বোধহয় এরা বোধ করে হরিদা। আমার মনে হয়, এরা আপন করে নিতে পারে না স্টলকে, স্টলের জীবনকে। স্নেহ, আদর দিয়ে যদি এদের বুঝানো যায়, মাঝে মাঝে ছুটি দেওয়া যায়, তবে মনে হয়, এরা মনেপ্রাণে কাজ করবে। কী বলেন হরিদা?

—মাস্টর মানুষ আফনি। বাস্তব পৃথিবীর উপর আর একটা জগত তৈয়ার কইরতে অব্যস্ত আপনারা, বুইঝলেন মাখনবাবু? হরিদার যুক্তিটার মাঝে কিছুটা অভিজ্ঞতার গর্ব লক্ষ করলাম।

চেয়ে দেখলাম প্রায় ন'টা বাজে। আজ ওঠি হরিদা। বলে উঠতে চাইলাম আমি। হরিদা বাঁধা দিল। আরও কিচুখন বইস্যা যান, বলল হরিদা। রান্না বান্না ত শেষ কইর‍্যা আইছেন—তবে আর বেইস্ততার কি!

—তা আর রান্নাবান্না, ঘি, ভাত, সেদ্ধ আর দুধকলা। এই ত চলছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস।

—বাবু, চিনি শেষ অইয়া গেছে। আইনতে অইব।

—নিয়া আয় মনঅর বাবুর দোকান থেইক্যা। এই নে ছিলিপ। দেখিছ দেরি করিছ না, হরিদা স্লিপ লিখে দিল। স্বপন দৌড়ে চলে গেল।

—বুইঝলেন মাখনবাবু, জীবনে সব কিছুরই একটা সময়-গময় আছে মশায়। সিদ্দবাত আর ক'দিন। সংসার ধরম করেন। জীবনটারে ভোগ কইর‍্যা একটু দেহেন।

এ রকম প্রসঙ্গ হরিদা কোনদিন করেনি। তাই কথাগুলো শুনে প্রথমটায় লজ্জা লজ্জা বোধ হল। হরিদা লক্ষ করল আমার মনোভাব।

—মাখনবাবু, এতে লইজ্যার কিচ্ছু নাই, চাকরি বাকরি করত্যাছেন স্বাধীন জীবন, সব

কিছুরই ত প্রয়োজন জীবনে মাখনবাবু।

হরিদা কেবল ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকে না। জীবনে চলতে গিয়ে যেসব দিক অপরিহার্য, সে সবদিকে হরিদার সতর্ক দৃষ্টি আছে—এটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

সহসা হরিদা ক্যাশবাক্স খুলে কী যেন খুঁজতে লাগল।

—কী খুঁজছেন হরিদা? আমি জানতে চাইলাম হরিদার ব্যস্ততা লক্ষ করে।

—দিয়াশলাইটা পাইতাছি না মাখনবাবু। এই স্বপন্যা! দিয়াশলাইটা কই?

—না, আমি নেই নাই। ভেতর থেকে বলল স্বপন।

—তা অইলে গেল কুতায়। তা অইলে নিচ্চয় কেউ লইয়্যা গেছে।

এই-ই এক বদ্ অইববাস মানুষের মাখনবাবু। বিড়ি, সিগরেট ধরাইয়া ফিরত না দিয়াই পকিটে ঢুকায়—লইয়া যায়।

কেউ কেউ আবার জাইন্যা শুইন্যাই লইয়া যায় মাখনবাবু। বুইঝলেন এসব বড় বদ অইব্বাস। আইজ কাইলকার দিনকাল মাখনবাবু কেবল পরের মাথায় কাটল বাঙ্গন।

—ভুলেও ত কেউ নিয়ে যেতে পারে হরিদা। বললাম আমি।

—অ তাও অয়। অমন লোকও দেখছি—পরদিন আইন্যা দিয়া গেছে। কিন্তু এ রকম ক'জন মাখনবাবু..., আইজ কাইল ..?

আমি ওঠি হরিদা। দু'একটা কাপড় কাচতে হবে। তাছাড়া স্কুলেরও সময় ত হয়ে এল। এই বলে উঠে পড়লাম। কিছুদূর এসে শুনলাম হরিদার গলাব আওয়াজ। স্বপনকে কী নিয়ে বকাবকি করছে হরিদা। ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত কেবল ভাবতে লাগলাম হরিদার কথা আর বেচারা স্বপনের কথা।

সুখেন্দু দাস

সূদন সাব

প্রকৃতিগত কারণেই সব মানুষ সমান দায়িত্বশীল হয়ে জন্মায় না। প্রভাতেই যেমন দিনের আভাস মিলে, তেমনি শৈশবেই ভাবীকালের দায়িত্বশীল মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়। সততা, নিষ্ঠা এবং ধৈর্য এগুলো মানবিক গুণ। দায়িত্বশীল মানুষকে আশ্রয় করেই এ গুণগুলো বিকশিত হয়।

মানুষ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই সব কাজে খোঁজে দায়িত্বশীলের কাজের পরিধি বাড়ে। মানুষ একদিন অসাধারণ হয়ে ওঠে।

আমরা সমাজ পরিচালনায় যোগ্যলোক বাছাই করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে বসি। চলমান সমাজ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে থমকে দাঁড়ায়। সমাজ পরিচালনা বুদ্ধির খেলা নয়, সততা ও সহমর্মিতার জোরে মানব কল্যাণের পথ মসৃণ ও পুষ্পসজ্জিত করাই ব্যক্তির যোগ্যতার মাপকাঠি।

এমনই এক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ সূদন সাব (সাহেব)। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে তাঁর জন্ম ও শিক্ষা, স্বাধীনোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলাস্থিত ১৪ নং ইউনিয়ন বোর্ড, পাহাড়পুর তাঁর কর্মস্থল। তিনি প্রথমবারের মেয়াদ শেষ করে দ্বিতীয় বারের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন।

ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতার সূচনাপর্বে ব্রিটিশ শক্তির মদতে আর পশ্চিমী পাক শাসক গোষ্ঠীর প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে।

নোয়াখালির রাইয়ট পূর্ব পাকিস্তানের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। ভারতও এই কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণমুক্ত ছিল না। ইসলাম ধর্মী লোকও অনেকে ভারত থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকভূখণ্ডে চলে যায়।

এই টানাপোড়েনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সূদন সাব এক নজীর বিহীন নজির সৃষ্টি করেন। তিনি শিক্ষিত, দেখতে সুপুরুষ, তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বনেদী ঘরে তাঁর জন্ম, মৃদুভাষী, উচ্চতায় সাড়ে ছয় ফুটের মতো, চলনে-বলনে ভারিক্কি মেজাজের মানুষ; জনদরদী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণপ্রিয় পুরুষ।

নোয়াখালির পর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর এবং আরও কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গা সৃষ্টি হয়।

কুমিল্লা জেলায় যাতে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সূদন সাব নিরলস প্রচেষ্টা চালাতেন। এ ব্যাপারে ধামগড় ১১ নং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রবীণতম প্রেসিডেন্ট মোঃ উছিউদ্দিন সাব তাঁকে আন্তরিক সমর্থন করতেন। তাঁরা উভয়েই হিন্দুদের দেশত্যাগ না করার পরামর্শ দিতেন।

সূদন সাব প্রায়ই বলতেন, 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন' সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার মূল

চাবিকাঠি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের অধিকাংশ মানুষই শান্তি চায়। যুগ যুগ ধরে পূর্ব বাংলায় হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। দেশ বিভাগ আমাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে আমাদের মেরামত করিয়ে নিতে হবে।'

তিনি আরও বলতেন, 'দোষে গুণে সৃষ্টি, বানে তুফানে বৃষ্টি'—প্রকৃতির এই শাশ্বত অবদানকে কখনোই উপেক্ষা করা চলে না। অপরাধের লঘুত্ব, গুরুত্ব বিবেচনা করে সমাজের দোষীব্যক্তিকে যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করতে হয়। বিচারে জাতপাতের হিসাব বিবেচ্য নয়।

সমাজের অপরাধিরা ভালোমন্দের ফারাকটা অনুধাবন করতে শিখলে, ক্রমে ক্রমে তারাও সমাজের অনুকূলে ভালো কাজ করতে অভ্যস্ত হবে।'

১৯৫১ ইংরেজি সন। সূদন সাব নিজ বাসভবনের বৈঠকখানায় জনৈক গ্রামবাসীর জমি সংক্রান্ত একটি সমস্যার সমাধান কল্পে এলাকার মোড়লদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। এমন সময় কতিপয় অপরিচিত যুবক সরাসরি দরবার গৃহে এসে হাজির। সূদন সাব 'কী চাই?' বলতেই একজন যুবক উত্তর দেয়, 'আমরা ঢাকা থেকে এসেছি—আপনার সঙ্গে গোপনীয় কিছু কথা আছে।'

বলার ধরনটা শুনেই সূদন সাব স্থানীয় দুজন যুবককে বললেন, 'অন্দর মহলের বড়ো ঘরটায় ওদের বসার ব্যবস্থা কর, —আমি আসছি।'

সূদন সাব সবিনয়ে সভাস্থ মোড়লদের বললেন, 'আজকের সমস্যাটা সাতদিনেব মধ্যে মিটমাট করা হবে। আজ আর সময় দিতে পারছি না। সত্বরই আপনাদের নিয়ে আবার বসব।'

সকলেই একে একে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। হিন্দু মোড়লদের মুখে কুলুপ আঁটা।

সূদন সাবের বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে এসে তারা ফিস্ ফিস্ করে একে অপরকে বলাবলি করছে, ' এক সঙ্গে পঁচিশ জন যুবক ঢাকা থেকে এসেছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই বড়ো বড়ো ব্যাগ, দাঙ্গাবাজ নয় তো?'

সঙ্গি সাথিরা বলে, 'অসম্ভব নয়।'

আর একজন বলছে, ' নোয়াখালির রাইয়ট এখানেও ঘটতে চলেছে নাকি?'

সবাই নীরব।

পরে তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যায়।

সূদন সাব একজন জেলেকে ডাকিয়ে এনে পুকুর থেকে কাতল মাছ ধরে দিতে বললেন। অন্য এক যুবককে দশ কেজি খাসির মাংস জোগাড় করে আনতে নির্দেশ করলেন। সূদন সাবের ব্যক্তিগত সচিব সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। তিনি সর্বক্ষণ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। স্যুটশার্ট পরা সত্যনারায়ণবাবু যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক—একথা দাঙ্গাবাজ যুবকরা আন্দাজ করতে পারেনি।

ওর সামনেই হিন্দু প্রধান তিন গ্রামে রাতের বেলা যুবকরা দাঙ্গা করার আর্জি জানায়।

সাব বলেন, 'সন্ধ্যায় কথা হবে। খেয়েদেয়ে তোমরা বিশ্রাম কর।'

সত্যনারায়ণ বাবু সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরে গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে প্রতিটি গ্রামের

সমর্থ লোকদের পাহারা দেবার পরামর্শ দেন। বায়ু বেগে এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাত তখন বারোটা। গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে ভয়। ত্রাস বিরাজ করছে। সবার মুখে মুখে রাইয়টের কথা। আমাদের বাড়ির চাকর অর্জুন মিত্র আমাকে খবরটা জানায়। বয়স্করা লাঠি-সোটা নিয়ে গ্রামে টহলরত। হঠাৎ পার্শ্বগ্রাম—বাঁশকাইট থেকে শোরগোলের একটা শব্দ কানে আসতে থাকে। বৃদ্ধ ও নারীরা ভয়ে কাঁপছে। ঘরে শয্যাশায়ী রোগীদের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া।

শোরগোলের শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। গৃহের কর্তা ব্যক্তিগণ কান পেতে গোলমালের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করছেন।

আমার বয়স তখন এগারো বারো। আমি চুপি চুপি একটা শার্ট আর একটা প্যান্ট পুঁটলি বানিয়ে বগল দাবা করে বৈঠকখানার দরজার সামনের জাম গাছটার নিচে চুপ মেরে বসে আছি। আমার খালি গা, পরণে একটি হাফ প্যান্ট।

চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত মানুষের আনাগোনা ঠাহর করা যায়। বাঁশকাইট শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের বাস। গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ও আছে। গ্রামটি আমাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে।

আমি মনে মনে ভাবছি— দাঙ্গাবাজরা গ্রামের দিকে আসতে দেখলে—পূর্বদিকে কেবল দৌড়োতে থাকব, থামাথামি নেই। মাইলের পর মাইল দৌড়ে গেলেই সামনে পাব কস্‌বার রেললাইন। রেলরাস্তা পার হলেই ত্রিপুরা—নিরাপদ স্থান। তখনও প্রতিটা মুহূর্ত উৎকণ্ঠায় কাটছে। রাত তিনটার পর শোরগোলের শব্দ আস্তে আস্তে থেমে আসে।

ভোরে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল বাঁশকাইট গ্রামে একদল ডাকাত এসেছিল। পনেরো দিন আগেই গ্রামের চার গৃহকর্তাকে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতরা সতর্ক করে দেয়—ওরা যেন সোনা গয়না টাকা পয়সা নিয়ে প্রস্তুত থাকে। দিন সাতেক হলো একদল পালোয়ান যুবক সারারাত গ্রামপাহারা শুরু করেছে। এক বন্দুকধারী ডাকাতকে চারজন সুযোগ পেয়ে জাপটে ধরে। কোনক্রমে তাদের হাত ছাড়িয়ে ডাকাতদল একসঙ্গে পালিয়ে যায়। পরে দেখা গেল মান কচুর ডগায় রং করে ওরা খেলনা বন্দুক বানিয়ে ডাকাতি করতে এসেছে। এসব দেখেই উল্লাসে পাহারাদাররা দ্বিগুণ, তিনগুণ জোরে ভেতরে চিৎকার করতে থাকে। আর পাশের গ্রাম থেকে আমরা দাঙ্গার শব্দ মনে করে এক একজন আতঙ্ক আর ভয়ে কাঠ!

গুজব একটা অবাস্তব আশঙ্কা—ঘটতে পারে, নাও ঘটতে পারে, ঘটুক আর নাই ঘটুক—আতঙ্ক থেকে রেহাই নেই। এখানে ডাকাতির ঘটনা কাকতালীয় ভাবে দাঙ্গার আতঙ্ক সৃষ্টি করে হাজার হাজার মানুষকে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিশেহারা করে ফেলেছে।

১৯৭১ খৃঃ লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের সহায়তায় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করে। নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবর। তাঁকে চক্রান্তমূলক হত্যার পর অনেক বছর কেটে যায়।

অবশেষে মুজিব কন্যা বেগম হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমি আর একবার বাংলাদেশে পৈতৃক ভিটেমাটি দর্শনে যাই। সেখানেই আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী আব্দুল মতিনের সঙ্গে

সৌভাগ্য ক্রমে দেখা। আমি তাকে চিনতে পারিনি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হবে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। সে নিজে এসে পরিচয় দেয়, আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। উভয়ে অনেক আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে ১৯৫১ ইংরেজি সনের দাঙ্গাবাজ যুবকদের প্রসঙ্গ। যারা প্রেসিডেন্টের সম্মতি আদায় করতে ঢাকা থেকে এসেছিল সূদন সাব পঁচিশটি দাঙ্গাবাজ ছেলেকে কী শাস্তির বিধান করে ঢাকা শহরে ফেরত পাঠান—বন্ধুবর মতিন তা সবিস্তারে বর্ণনা দেয়। সে বলে, প্রেসিডেন্ট সাব দেড়শ যুবককে নিয়ে আমাদের বাড়িতেই মিটিংএ বসেছিলেন।

সভাতে তিনি বলেন, 'সূর্য ডোবার সাথে সাথে যুবকদের মাছ-মাংস দিয়ে পেট ভর্তি করে খাওয়াবে, তারপর বিশ্রাম করতে বলবে। ঘড়ির কাঁটায় রাত দশটা বাজলেই—গ্রুপ লিডার প্রত্যেকে একটি করে বেত হাতে নিয়ে ওদের ঘরে প্রবেশ করবে। একটি দরজা ছাড়া সব দরজা-জানালা থাকবে খিল মারা। খোলা দরজায় চারজন থাকবে পাহারাদার ওরা যেন একজনও বাইরে যেতে না পারে। লিডাররা প্রত্যেকে একের পর এক পঁচিশ জনকে পাঁচটি করে চাবুকের ন্যায় বেত্রাঘাত করবে। ওরা জীবনে আর দাঙ্গা করতে কোথাও যাবে না—ওদের থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি রাখবে।

ভোরে আমাদের গাড়ি দিয়ে দাউদকান্দি লঞ্চঘাটায় নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের টিকিট কেটে লঞ্চে উঠিয়ে দিবে। রওনা হবার আগে প্রত্যেককে একটি করে ব্যথার ট্যাবলেট খাওয়াতে যেন ভুল না হয়। আমার খবর কেউ জানতে চাইলে বলবে সাব দুই দিন হলো স্টেশনে নেই।'

মতিন বলে, 'এভাবে পঁচিশ জন দাঙ্গাবাজ যুবককে আমাদের ইউনিয়ন থেকে তুলোধুনো করে ফেরত পাঠান আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট। পরে তিনি আমাদের বলেছেন, 'ওরা এসেছিল সোনা-গয়না টাকা লুট করে সারা জীবনের পুঁজির সংস্থান করতে। দাঙ্গা একটি সহজলভ্য পন্থা। একজন দায়িত্বশীল প্রেসিডেন্ট কখনোই তা বরদাস্ত করতে পারে না। প্রশ্রয় দিলে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বিনষ্টের দায় প্রেসিডেন্টকেই নিতে হতো।'

ওনার অবদানেই কুমিল্লা জেলা এখনও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির পীঠস্থান।

আমি বললাম, 'বিমানে অনেক উঁচুতে ওঠার শিক্ষা ভালো জানা থাকলে, প্যারাসুট দিয়ে নিচে নেমে আসার কারিগরি বিদ্যাটাও সহজেই আয়ত্তে এসে যায়।'

খেয়ালি শিশুমন

শিশুমন ঘড়ির কাঁটা নয় যেন ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে স্লো-ফার্স্ট করা যায়। অত্যুৎসাহী এবং কিছু সংখ্যক অপরিণামদর্শী মাতাপিতা কিংবা অভিভাবক আজকাল শিশুমনকে নিরন্তর পীড়ন করে থেঁতলা বানিয়ে ছাড়ে। এমনই এক পীড়নের শিকার শিবশঙ্কর দাস।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। ছেলেটি সপ্তম শ্রেণিতে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা পর্ব শেষ। স্কুলে ফল বের করবার তোড়জোড় চলছে। স্কুলে পড়ুয়াদের আনাগোনা নেই। দু'চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা মার্কস লিস্ট নিয়ে টেবোলেশনের কাজে ব্যস্ত। অন্যেরা এটেণ্ডডেন্স দিয়ে কেউ কেউ ক্যারাম খেলছেন, কেউ বা বাড়ি চলে গেছেন।

আমি তখন প্রধানশিক্ষকের দায়িত্বে। চেম্বারে বসে আমি টুকটাক কাজ করছি। এমন সময় শিবশঙ্করের দুই বোন অনুশ্রী আর তনুশ্রী স্কুলে এসে হাজির। ওরা দু'জনেই আগরতলা এম বি বি কলেজে পড়াশোনা করছে। সপ্তাহখানেক আগেই কলেজে শীতকালীন ছুটি হয়েছে। ওদের পরিবারকে আগে থেকেই চিনি। শিবশঙ্করের বাবা সরকারি ডাক্তার, এল এম এফ পাশ। আমি ওদের স্কুলে আসার কারণ জানতে চাইলাম। কারণটা মনে মনে অনুমান করেছি। তবুও বললাম, 'কী জানতে চাও, বলো।'

অনুশ্রী বলল, 'স্যার, পরস্পর শুনেছি, শিবশঙ্কর নাকি হিন্দি পরীক্ষা দেয়নি। খবরটা কি সত্যি?'

আমি বললাম, 'সত্যি না হলে এমন একটা খবর লোক মুখে ছড়ায় কী করে?'

তনুশ্রী বলল, 'আমার ভাই তো পরীক্ষা দিয়েছে। মা নিজে তাকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়েছেন। একথা মাও স্বীকার করছেন।' আমি বললাম, 'স্কুলে এসেছে বলেই পরীক্ষায় এপিয়ার হয়েছে —এটেণ্ডডেন্স লিস্ট কিন্তু তা প্রমাণ করে না।'

অনুশ্রী—'ও পরীক্ষা না দিয়ে, আমাদের কাছে পরীক্ষায় বসেছে—এমন কথা বলতেই পারে না, স্যার।'

আমি বললাম, ' ও পরীক্ষা দিয়েছে বলে তোমাদের কাছে স্বীকার করেছে?'

তনুশ্রী— 'অবশ্যই, স্যার।'

'আমি নিশ্চিত বলছি— ও পরীক্ষা দিয়েছে আমার সামনে কখনোই স্বীকার করবে না, আমরা তাকে পড়াই,বিশেষ করে আমি তাকে ভালো করে চিনি।'

অনুশ্রী বলল, 'নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, স্যার।'

আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'কি জানি! স্বীকার করলে করতেও পারে!' মনে মনে ভাবলাম, ছেলেটা অভিভাবকের কথায় এতো বড়ো মিথ্যাটা প্রধানশিক্ষকের সামনে বলতে সাহস করবে! তারপর ওদের বললাম, 'শোন, শিবশঙ্কর একজন খেয়ালি মনের ছেলে। স্কুলে হয়তো এসেছে সত্যি, যেহেতু হিন্দি পরীক্ষা অনেক ছেলেমেয়ে ইচ্ছা করেই দিতে চায় না, প্রমোশন ওদের আটকায় না বলে।— সে কারণেই শিবশঙ্কর এপিয়ার হয়নি। এটাই বাস্তব।

যেহেতু সে ফার্স্ট হবার প্রতিযোগিতায় অনেকটা এগিয়ে, তার বেলায় প্লেস নিয়ে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। তার শিশুমন এই প্রতিবন্ধকতার কথাটা ভেবে উঠতে পারেনি। এটা মারাত্মক কোন দোষের ব্যাপার নয়। দায়ে পড়েই তোমাদের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।'

এরপর দুই বোন কোন কথা না বাড়িয়ে বাড়ি চলে যায়। তারপর থেকে হাওয়ায় ভাসছে নানা আজগুবি কথা। শিক্ষকরা নাকি অন্য এক ছাত্রকে ফার্স্ট করিয়ে দেবার জন্য মার্কসলিস্টে কারচুপি করছেন। শিবশঙ্করের নামে মিথ্যে অভিযোগ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন।

আসলে যিনি পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তিনি একজন সরকারি হিন্দি প্রচারক। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে আছেন। নাম শ্রীনিবাস কর্মকার। ঘটনা পুরোটাই তাঁর এক্তিয়ার ভুক্ত। স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকরা এতে কেউ জড়িত নেই। পরীক্ষার দিন তিনি নিজে আরও দুজন শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে সারা স্কুলে শিবশঙ্করকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন, কোথাও পাননি।

বিকেল তিনটের পর সেই শিক্ষক শিবশঙ্করকে মার্কসলিস্টে অনুপস্থিত দেখিয়ে তা অফিসে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরেন। অনুশ্রী, তনুশ্রী কলেজে পড়ুয়া মেয়ে, আধুনিকতার হাওয়ায় দিশেহারা। তাদের চলনে বলনে একটা আহামরিভাব। ভাই এর ওপর অন্ধবিশ্বাস রেখেই বাবাকে রাজি করিয়ে ঘটনাটা ওপর মহলে তদন্তের জন্য আর্জি জানায়। উদ্দেশ্য স্কুলকে হেস্তনেস্ত করা। সত্য যে আরও গভীরে তা তারা অনুমান করে উঠতে পারেনি।

বাড়িতে স্বীকারোক্তি দিলেও স্কুলে এসে শিবশঙ্কর তা বলতে সাহস করছে না। তার মনের দুর্বলতা ও অনুশোচনা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

একদিন ভাই-বোনদের তর্কবিতর্ক এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, শিবশঙ্কর বাধ্য হয়ে রাগ করে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়। তবুও সে স্কুলে গিয়ে মিথ্যা কথা বলতে রাজি হয়নি এবং লিখেও তা বোনদের কাছে জমা দেয়নি। সে বন্ধুর কাছে অকপটে স্বীকার করে, 'আমি পরীক্ষায় বসিনি অথচ প্রধানশিক্ষকের কাছে স্বীকার করতে হবে আমি পরীক্ষায় বসেছিলাম। দিদিরা ভালো করেই বুঝতে পেয়েছে, এতে আমার দোষ পুরোপুরি, তবুও কেন আমাকে পীড়াপীড়ি করছে। ওরা বাড়ি থেকে চলে গেলে তারপর বাড়ি যাব।'

এদিকে রটনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—প্রধান শিক্ষকেরও হেনস্তা হবার উপক্রম।

শিক্ষাঅধিকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক ঘটনার আদ্যোপান্ত জেনেও এসিস্ট্যান্ট পরিদর্শককে স্কুলে পাঠিয়ে একটি তদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। সহকারী পরিদর্শক তাঁর রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, ঘটনাটা সাজানো, শিবশঙ্কর হিন্দি পরীক্ষায় বসেনি। এটেণ্ডেন্স-লিস্টে 'A' লেখা। লোক পাঠিয়েও ছাত্রের কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়নি। সহকারী পরিদর্শকের রিপোর্টসহ বিদ্যালয় পরিদর্শক তার পিতার মতামত জানিয়ে অধিকর্তাকে পত্র পাঠান। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যায়।

অভিভাবকগণ তদন্ত রিপোর্ট জানার পর শিবশঙ্করকে আগরতলা এক নামী স্কুলে ভর্তি করে দেন। চার বছর পর হায়ার সেকেণ্ডারি (একাদশ শ্রেণির ফাইনাল) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে

শিবশঙ্কর পাশ করে। পিতার নিরলস চেষ্টায় শিবশঙ্কর মাইশূরে মেডিকেল পড়ার সুযোগ পায়।

সেখানেও পড়াশোনায় তার চরম গাফিলতি দেখা দেয়। বাবা জানতেও পারেননি। হাজার হাজার টাকা খরচ করার পর বাবা যখন নিঃস্বপ্রায়, তখন তার এক জুনিয়র শিক্ষার্থী থেকে তিনি জানতে পারেন, শিবশঙ্কর পরীক্ষার সময় প্রায়ই মুম্বাই-মাদ্রাজ ঘুরতে চলে যেতো।

খবর শুনে পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্রমেই তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই লোক পাঠিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়। আত্মীয়রা তাকে বি-এ প্রথম বর্ষে ভর্তি করে দেয়। চাকুরির চেষ্টাও চলতে থাকে। তিনমাসের মধ্যেই স্টেটব্যাঙ্ক থেকে একটি অফার আসে তার নামে। সেও যথারীতি চাকুরিতে যোগদান করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই তার বাবা মৃত্যু বরণ করেন।

খেয়ালি মন পছন্দসই কাজ না পেলে কোনদিন আপোস করতে চায় না। প্রেম-সুরাসক্তি পর্যন্ত খেয়ালিমনা মেয়ে-পুরুষের কাছে মুহূর্তেই পরিত্যাজ্য বোধ হয়। এমন শিশু কোটিতে গুটি।

চন্দ্রালোকে পরিভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জনের দুঃসাহস পৃথিবীতে ক'টি লোকে দেখাতে রাজি থাকে? সংখ্যায় এক দু'জন।

আমি এক দু'জন খেয়ালিমনা মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। সিনেমা দেখবে বলে আমাকে হলে নিয়ে যায়, পনেরো মিনিট পর বলে, 'তুমি ছবি দেখো, আমি আসছি।' পরে আর হলে ঢোকেনি। আর একদিন আগরতলা রওনা দিয়ে বড়মুড়ায় একটা মনোরাম স্থানে নামিয়ে দিতে ড্রাইভারকে বলে। আমি অবাক, কিছুতেই তাকে ঐ গাড়ি দিয়ে আগরতলা পৌছানো গেল না ।

ওঁর সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম। পরে বিকেল পাঁচটায় একটি গাড়িতে করে আগরতলা পৌছে যাই।

পিতার মৃত্যুর পর শিবশঙ্কর প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি এ পাশ করে। বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। চাকুরিতে সাফল্যের সঙ্গে চরম উন্নতি হয়েছে তার। যথেষ্ট যশ ও সুনামের অধিকারী।

ঘটনাচক্রে একদিন স্টেট ব্যাঙ্কে দেখা। সে আমাকে কোথায় বসাবে, কীভাবে আপ্যায়ন করলে আমি খুশি হব—সে যেন ভেবে পাচ্ছে না। আমাকে বলল, 'একটু চা খান, স্যার, আপনাকে পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না।'

তারপর মাথা নিচু করে বলে, 'স্কুল জীবনে একবার আপনাকে আমার পরিবারের লোকেরা অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু আমাকে ওরা মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করতে পারেনি।'

আমি বললাম, 'এই সত্যের জোরেই তোমার জীবনে আশাতীত উন্নতি, আর সর্বত্র তোমার সুখ্যাতি।'

উত্তরণ

মণিকুন্তলার বাবা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন—মেয়ে বেশ খোশ মেজাজেই আছে। মেয়ের বয়স সাত। পাশের বাড়ির এক অপরিচিতা বিধবা পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে মেয়েকে রেখে সুনয়নবাবু ব্যাঙ্কে তাঁর নিজের পেনশন ড্র করতে গিয়েছিলেন।

তিনমাস হলো মণির মা মারা গেছেন। মা-এর অবর্তমানে মেয়েকে কারোর কাছে রেখে তিনি আর কোনদিন ঘরের বাইরে যাননি। স্ত্রীর মৃত্যুর একমাস আগে সুনয়নবাবুর চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। স্ত্রী জীবিত থাকতে মেয়ের জন্য সুনয়নবাবুকে মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করতে হতো না। এসব কারণেই মেয়ের জন্য সুনয়নবাবুর এতো দুশ্চিন্তা।

ব্যাঙ্কে অবস্থানকালীন সময়টা সুনয়ন বাবুর উদ্বিগ্নতার মধ্যেই কাটে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শিশু-অপহরণ ঘটনার মতো কত অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা তাঁকে গ্রাস করেছিল। যে বিধবা মহিলার হেপাজতে মেয়েকে রেখে গিয়েছিলেন তার সঠিক পরিচয় সুনয়নবাবুর জানা ছিল না। আজকাল পরিচারিকার বেশে কত মেয়ে পাচারকারিণী সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিচারিকা বিধবাটিও পাশের বাড়িতে নবাগতা। এমন অপরিচিতার কাছে মেয়েকে সঁপে আসা সুনয়নবাবুর মোটেই ঠিক হয়নি। এসব চিন্তা যতই মনকে ভারাক্রান্ত করতে থাকে ততই তিনি মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। বাড়ি ফিরে মেয়েকে দেখে তাঁর যেন প্রাণবায়ু ফিরে পান।

তারপর ভাবেন এখনও চাকুরির মেয়াদ শেষ না হলে কী ভয়ঙ্কর অবস্থাই না হতো। চাকুরিও শেষ, স্ত্রীকেও হারালেন! বিধাতার কী নির্মম পরিহাস!

বাবাকে দেখেই মেয়ে বলছে, 'বাবা হাবলু এসেছিল। দু'জনে খেলা করছিলাম।'

সুনয়নবাবু বলেন, ' বেশ করেছো মা। ঝগড়া করোনি তো?'

'না বাবা, ঝগড়া করব কেন? কত গল্প করল, হাবলু।'মণি উত্তর দেয়।

'সুনয়নবাবু—কী সব গল্প হলো দুজন?'

'মণি—'ওর সব কথা বুঝিনি, বাবা। আর কোনদিন আসেনি তো! আস্তে আস্তে সব বুঝব।

একটু অপেক্ষা করে মণি আবার বলতে শুরু করে, হাবলু বলল, জান? তামুক খাইতে পারস? কী মজা! কী মজা!—

টিক্‌কা দিয়া তামুক খায় কীভাবে বাবা?'

মেয়ের কথা শুনে বাবার তো চক্ষুস্থির! তিনি ভাবছেন— এতোটুকু সময়ের মধ্যে মেয়ের মনে কত প্রশ্ন উঁকি মারছে! স্বতন্ত্র পরিবেশ, স্বতন্ত্র মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কিভাবে মানুষকে সহজেই পাল্টে দেয়।

মণি আবারও বলে, 'হাবলুর মা, হাবলুর বাবাকে কী বলছে জান? এই মরা মরলে গঙ্গায় ডুব দিয়া শুদ্ধ হইয়া বাঁচতাম। এসব কথা বুড়া মানুষকে কেউ বলে, বাবা?'

সুনয়নবাবু —'ছিঃ! এসব কথা বলা পাপ!' মণি বাবার কাছে জানতে চায়, ' তোমাকে

তো মা এসব কথা কোন দিন বলেনি, বাবা।' সুনয়নবাবু — 'তোমার মা লেখাপড়া জানতেন তো। হাবলুর মা কোন দিন স্কুলে যায়নি। লেখাপড়া না জানলে গুছিয়ে কেউ কথা বলতেই পারে না। এবার তোমার পড়ার ঘরে যাও, মা।' সুনয়নবাবু ভাবছেন—কতভাগ্যে তিনি সুনন্দাকে স্ত্রীরূপে পেয়েছিলেন। বিয়ের পর এতোগুলি বছর কেটে গেল, মুখে কোন দিন কোন চাহিদার কথা উচ্চারণ করেননি। কোন অভিযোগের সুর তার কল্পনায়ও ছিল বলে টের পাননি। আর হাবলুর মা, নিত্যদিন অভাব, অভিযোগ, ক্ষুধার তাড়না ভোগ করে চলেছে। পারিবারিক শান্তি সুখের বাতাবরণ তাদের পুড়ে ছারখার।

সন্তানের মা যখন দেখে স্বামীর উদাসীনতা আর অবহেলায় সন্তানরা ধ্বংসের মুখে, তখন কোন সন্তানের মা স্বামীকে ক্ষমা করতে চায় না। হাবলুর মা'র সে দশাই হয়েছে। সুনন্দার কথা মনে হলে সংসারের প্রতি তিনি আনমনা হয়ে যান। অবস্থার চাপে সুনন্দার কথাই তাঁর বারবার মনে পড়ছে। সুনন্দা অসামান্যা গৃহবধূ ছিলেন। ঘর গুছানো, উঠোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগানের গাছ-গাছালিগুলির গোড়ায় সার-জল-যত্ন সবকিছু নিজের হাতে জোগান দেওয়া ছিল তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। রান্নাবান্নার জন্য পরিচারিকার কথা বললে বিরক্তিবোধ করতেন। ঘরের প্রতিটা রুমে রুমে সে যেন আজও জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে রয়েছেন। সুনয়নবাবু ট্রেজারিতে চাকুরি করতেন। দায়িত্বশীল কাজ ছিল তাঁর। মাসে মাসে টাকা দিয়েই খালাস। হাট বাজার করানোর দায়িত্ব নিত স্ত্রী। ছোটখাট জিনিসের বাজার নিজেই করতেন। বিধাতা কেন যে অকালে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, একমাত্র তিনিই তা জানেন। সুনয়নবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

এমন সময় ঘরে আসে হাবলুর মা। তিনি তাকে একটা গোল টুলে বসতে বলেন। তারপর সুনয়নবাবু প্রশ্ন করে জানতে চান, সে তার স্বামী সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছে। সুনয়নবাবু— 'হাবলুর মা, তুমি তোমার ছেলের সামনে তোমার স্বামীকে কী বলেছিলে?'

হাবলুর মা নীরব থাকে, তারপরে তিনি বলেন যে তার ছেলের কল্যাণের জন্যই তিনি তা জানতে চেয়েছেন। হাবলুর মা—'স্বামীকে মৃত্যুর আগে খারাপ কথা কইছিলাম। দাদাবাবু, আপনি জানলেন কী কৈরা?'

সুনয়নবাবু— ' তোমার ছেলেই আমার মেয়ের কাছে এসব কথা বলেছে।'

হাবলুর মা—'দাদাবাবু, জ্বালা যন্ত্রণা কত সহ্য করুম। হাবলুরে দুইবার খাইতে দিতে পারি না। ইস্কুলের বই নাই। গা-গতরে খাইটা যা পায় শুধু মদ গিলে, আর রাঙা মাসির সঙ্গে রঙ্গরস কৈরা উড়ায়।' সুনয়নবাবু— 'রাঙা মাসিটা কে?'

'আমারই এক দূর সম্পর্কের বোন। অবিবাহিতা।' —বলে হাবলুর মা।

সুনয়ন বাবু—'তাকে সাবধান করনি?'

হাবলুর মা—'অনেকবার করছি, ফল হয় ঝাঁটার বাড়ি। ছেলেরেও রেহাই দেয় না। কতবার রাগ কৈরা বাপের বাড়ি গেছি। কোন ফল হয় না। রাইত বারটা বাজলে দেড় কেজি চাউল, এক টাকার কাঁচা মরিচ, পাঁচ টাকার সিঁদল লইয়া বাড়ি ফিরে। পাক কৈরা খাইতে খাইতে ঘুমাইবার সময় পাই না। ছয়মাস আগেই ডাক্তার সাবধান কৈরা বলছে, লিভার পইচা গেছে।

তখন থাইক্যা অন্যেরা কাজের সাহায্য কৈরা চালাইয়া রাখছে। সূর্য ডুবলেই ঐ সাঙ্গ পাঙ্গদের অর্ধেক টাকা বিলায় মদ খাওয়ার জন্য। কিছুদিন পরেই বিছানায় পড়ে, উইঠ্যা ভাত আর খুঁইট্যা খাইতে পারে নাই। তার পরেই তো শ্মশান যাত্রা।

রোগী ফালাইয়া কাজ করতে যাইতে পারিনা— দিনের পর দিন মা আব পোলা অনাহারে। তখন কৈ ছিলাম— মরা মরে না, মরলেই বাঁচতাম। আমার কী অপরাধ দাদাবাবু, (হাবলুর মা কাঁদতে থাকে)।

সুনয়নবাবু—'আমি তোমার অবস্থা সব বুঝতে পেরেছি। এখন তোমার ছেলেটাকে মানুষ করাই তোমার প্রধান কাজ। আমি তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করব। তুমি আমার গৃহেই পাশের বারান্দার ঘরে ছেলে নিয়ে থাকবে। রান্নাবান্না করবে। সকলে মিলিত ভাবে এক পরিবারের মতোই খাওয়া দাওয়া করব। ছেলেকে পড়ানোর সব দায়িত্ব আমার। মনে মনে সুনয়নবাবু ভাবছেন, আমাদের পুত্র কামনা পূর্ণ করল বিধাতা।

এমন সময় ঘরে আসে হাবলু। সুনয়নবাবু হাবলুর মাকে চলে যেতে বলেন।

সুনয়নবাবু— 'কীরে হাবলু, তুই নাকি তামাক খাস?'

হাবলু—'না কাকাবাবু, খামু কৈছিলাম।'

সুনয়নবাবু—'জানিস তামাক থেকে ক্যান্সার হয়?'

হাবলু—'জানি।'

সুনয়নবাবু— 'জেনেও তামাক খেতে বললি যে?'

হাবলু— 'আমার ভাল লাগে না। সবাই ইস্কুলে যায়। আমি বই এর জন্যে ইস্কুলে যাইতে পারি না। বাঁইচ্যা কী লাভ? আমি মৈরা যাইতে চাই!'

সুনয়নবাবু অবাক বিস্ময়ে হাবলুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন! তারপর আদরের দুলালী মণিকুন্তলাকে পড়ার ঘর থেকে ডাকিয়ে এনে হাবলুর পাশে দাঁড় করান।

সুনয়নবাবু —(উভয়কে বলেন) 'আজ থেকে তোমরা দু'জনেই আমার সন্তান। কাল থেকে দু'জনে ভাইবোনের মতোই স্কুলে যাবে, পড়াশোনা করবে।'

গোপাল বিশ্বাস

রইস্যাবাড়ির পথে

রইস্যাবাড়ি এক সময় অজ পাড়াগাঁ ছিল। এখন আর আগের মতো নেই। বদলে গেছে সব। মানুষের চাল চলন রীতিনীতির ব্যাপক পরিবর্তন। বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের—মরা কাঠে ফাগুন। পথঘাট কেমন ঝলমলে। সরকারি অফিস-ঘর, স্কুলবাড়ি রাস্তার পাশে হামেশাই দেখা যায়। গণ্ডাছড়া থেকে পাকা রাস্তা এলোমেলো ভাবে চলে গেছে—রইস্যাবাড়ি বাজার অবধি। রাস্তার দু'পাশে গাছ-গাছালির উষ্ণ অভিনন্দন। বিভিন্ন যানবাহন ও অটো প্রতিদিন গণ্ডাছড়া থেকে আসা যাওয়া করে। তবে রাতের বেলায় গাড়ি কম চলে। উগ্রপন্থীর দাপট কমলেও রাতে মানুষ চলাফেরা করতে ভয় পায়। অসুখ-বিসুখে আলাদা কথা। তখন ভয়কে অতিক্রম করে। এখন রইস্যাবাড়িকে মিনি শহরও বলা যায়। অনেকটা পাহাড়ি শহরে টাইপ। সমতলভূমি কম। আশেপাশে কয়েকটা জলাশয়ও আছে। কিছু মানুষ জলপথেও চলাচল করে। যার যেমন সুবিধা। টিলা-টাক্করে ঘেরা। সবুজের সমারোহে যেন উৎসবে মেতেছে। ফাগুনের বন ঋতু পরিবর্তনের বৈচিত্র্য এঁকে দেয়। কখনও লাল পলাশের বন, কখনও বা বাদল হাওয়ার রাত, বৃষ্টিমুখর সূর্যালোক। রাস্তার দু'পাশে শাল-সেগুনের বাগান। স্থানে স্থানে বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ে শালিকের ডাক, পাখির কিচিমিচি। বকেরা উড়ে যায় কোথায়? প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গণমিছিল, রূপের ঢল।

এই রাস্তায় প্রথম গাড়ি এলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উৎসুক হয়ে অদ্ভুত যন্ত্রটাকে দেখত। নেংটা উপজাতি ছেলেমেয়েরা খেলা বন্ধ করে গাড়ি দেখত। শিশুদের কান্না থেমে যেতো। সে সব দিন আজ অতীত। এ ডি সি এঁলাকা হওয়ার সুবাদে দ্রুত উন্নতি হলো। বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শিক্ষার আলো ক্রমশ গ্রামান্তরে প্রবেশ করছে। রইস্যাবাড়ি এক সময় গণ্ডাছড়া থানার অন্তর্গত ছিল। সেখান থেকে পুলিশেরা এলাকায় টহল দিত। উগ্রপন্থীরা তখন বেশ সক্রিয় ছিল। গোলাগুলি , হতাহতের খবর প্রায় সময়ই পেতাম। রক্তাক্ত দিন ক্রমশ কমে আসছে। মানুষ বুঝতে পারছে, সন্ত্রাস উন্নয়নের পথ নয়। কৃষকের কিডন্যাপের পর আর কোন কিডন্যাপ হয়নি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্ত্রাস মানুষের রক্তে মিশে গেছে। সমাজের কোষে কোষে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল। সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এদেরকে সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো স্বার্থান্বেষী কিছু লোক সদা প্রস্তুত। এরা প্রায় সময়ই রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। উঠতি নেতা গোছের অভিনেতা। মূল্যবোধ এদের নিকট অর্থহীন। বিবেককে এরা সাড়ে সাতবার বেঁচে। সমাজে এদেরই কদর বেশি।

রইস্যাবাড়িতে আগে পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। আধা সামরিক ফোর্স ছিল, এখনও আছে। পাঁচ বছর হলো স্থায়ীভাবে পুলিশ স্টেশন করা হয়েছে। বছরখানেক হলো মতিবাবু থানার ও সি হয়ে জয়েন করেছেন। শান্তিশৃঙ্খলা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।

কারণ, নতুন কোন ইনসিডেন্ট আর ঘটেনি। চারদিকে শান্ত পরিবেশ। অন্তত বাইরে থেকে তা বোঝা যায়। চোর ডাকাতের উপদ্রব কম। তবে অপরাধী একদম ভ্যানিশড—তা কিন্তু অবশ্যই বলা যাবে না। নোয়াবাড়ি ও জগবন্ধুবাড়ি রইস্যাবাড়ি থানার অন্তর্গত। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। বাঙালি হাতে গোনা কয়েক ঘর। সন্ত্রাসের কারণে অনেক বাঙালি পরিবার গ্রাম ছেড়েছে। জায়গা-সম্পদ, ঘরবাড়ি ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কেউ কেউ কাটা পড়েছে। কেউ অপহৃত, কেউ টাকার বিনিময়ে ফিরে এসেছে, কেউ নিখোঁজ, ফিরে আসেনি। অনেকের মৃত দেহ পাওয়া যায়নি। ভয়ে ভয়ে মানুষ দিন কাটাত। দাঙ্গায় বিপর্যস্ত গ্রামগুলি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো। অবশ্যই সকলের প্রয়াসে। বিশেষ করে থানার ও সি মতিবাবু এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সরকারি দায়িত্ব পালন করেই তিনি বসে থাকেননি। সামাজিক পরিবেশে মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করেন। দলিতের উন্নয়ন তিনি সব সময়ই চাইতেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথেও এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন। তবে কট্টর নেতাদের তিনি এড়িয়েই চলতেন। বেশ কয়েকটা শান্তির স্বপক্ষে মিটিং করেছেন। এতে ভাল ফল পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ শান্তিই চায়। অন্যদিকে মতিবাবু শক্ত মনের মানুষ। এলাকায় কড়া দারোগা হিসাবে পরিচিত। মানুষে যেমন শ্রদ্ধা করতো, তেমনি ভয়ও করতো অনেক বেশি। এই ভয়টাকে তিনি কাজে লাগিয়ে দেন। কেউ কেউ মতিবাবুর উল্টো পথে হেঁটেছে। সব যুবককে তিনি পথে আনতে পারেননি। যেমন র‍্যায়াল দেববর্মাকে তিনি বাগে আনতে পারেননি। সরকার ঘোষণা করেছে তাকে ধরে দিতে পারলে আড়াই লক্ষ টাকা পুরস্কার। তাকে ধরতে পারেননি। সেজন্য উগ্রপন্থীর একটা গ্রুপ এখনও জঙ্গলে সক্রিয়। মাঝে মাঝে ইনসিডেন্ট ঘটায়। রাজনৈতিক নেতাদের মদতে যার যার প্যায়ারের লোক দিয়ে খারাপ কাম করায়। সেজন্য সমাজ মাঝে মাঝে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। বারুদ জ্বলে ওঠে। এখন এতটা নেই। অপেক্ষাকৃত শান্ত। অনেক বাঙালি পরিবারও আগের বাস্তুভিটেতে ফিরে গেছে। জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে। পাড়া-প্রতিবেশিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। মানুষের বিবেকের বাঁধন আরও বিশ্বস্ত ও শক্ত হচ্ছে। হাতে হাতে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। এমনি পাহাড়ি গ্রাম্য পরিবেশে পাপড়ির জন্ম। যুবতী হয়ে ওঠার পাশে নানান রঙিন স্বপ্ন। পাশের নোয়াবাড়ি গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে।

পাপড়ি গৃহবধূ। মাত্র তিন বছর হলো শমিতের সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে নোয়াবাড়ি এসেছে। এখন পোয়াতি। মাঠে ঘাটে, পাহাড়ের উঁচু নিচু পথে ঘুরে বেড়ানো তার স্বভাব। যেন পর্বতকন্যা। বিয়ের আগে জুমে কাজ করতো। অবশ্য পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে। শরীর ও মন দুটোই মজবুত। সরল, পরমা সুন্দরী। সুঠাম শরীর। চোখ ফেরানো যায় না। অপরূপা। প্রকৃতির কোলে একটি রঙিন প্রজাপতি কলসি কাঁখে জল নিয়ে ঘরে যায়। বনফুল। লাবণ্যময়ী। গৌর অঙ্গ। সমগ্র শরীর যেন চন্দনের গন্ধে ভরপুর। রূপ ও রসের আঁধার। তিন মাসের প্রেগন্যান্ট। ওরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। শাঁখা-সিঁদুর পড়ে না। বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরনং গচ্[illegible] মন্ত্র জপ করেন। শাশুড়ি সন্ধ্যায় ধ্যান করেন। পাপড়ির স্বামী ত্রিপুরা সরকারের চতুর্থ শ্রে[illegible] কর্মচারী। পূর্ত বিভাগে। ধর্মনগরে পোস্টিং। শনিবারে বা ছুটিব দিনে বাড়ি আসে। পাপড়িও

স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে। অপেক্ষা করে। মনে মনে লজ্জিত...। শ্বশুরশাশুড়িকে খুব সেবা যত্ন করে। শ্বশুর তো বউমা বলতে অজ্ঞান। নিজের মেয়েও এত খাতির যত্ন করে না। শমিত এ মাসে বাড়ি আসতে পারবে না। অফিসে কী যেন কাজের ভীষণ চাপ।

বড় স্যার বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম আছে। কনফারেন্স বা মিটিং হবে হয়তো। তার কাজ তো শুধু ফাইফরমাস খাটা। কাজ করে শমিত ভীষণ আনন্দই পায়। ভাল লাগে। ফাঁকি বোঝে না। হৃদয়ে হাসির ফোয়ারা ছোটে। চোখে-মুখে তা ফুটে ওঠে। কখনো মোবাইলে ফোন করে। মোবাইলে কী সব কথা বলা যায়? যায় না। চিঠির ভাষা থেকেই শমিতের মুখ ভেসে আসে। চুমো খায়। আলিঙ্গন করে। শরীর ঘন হয়। পাপড়ি শিহরিত হয়। সারা শরীরে কী যেন গরম রক্তের স্রোত বয়ে যায়। অবশ-ঝিম-ঝিম ভাব। আগুন জ্বলে ওঠে কাঁচা শরীরে। এমন সময় উমাদেবী পাপড়িকে ডাক দিলেন।

—বউমা কী কর? তোমার বাপের বাড়ি থেকে খবর এসেছে। তোমাকে যেতে বলেছে। আমার শরীরটা তো ভাল যাচ্ছে না। বাতের জ্বালাটা বেড়েছে। তোমাকে কে নিয়ে যাবে? এ মাসে শমিত বাড়ি আসবে না। অফিসের কী যেন ঝামেলা। তোমার বাবার শরীরটাও ভালো নেই। প্রেসার বাড়তি। তাছাড়া আমাদের নিয়ম তোমার প্রথম সন্তান যেন তোমার বাপের বাড়িতেই জন্ম হয়। খরচাপাতি আমরাই সব দেবো। কিন্তু সেটা তো অনেক দেরি। আরও সাত আট মাস। পরে গেলেও তো হবে না। কী যে করি?

— না মা, কোন চিন্তা করবেন না। আমি একা একাই চলে যেতে পারব। বিয়ের আগে কত বার একা একা গেছি-আইছি। এ-তো আমার নিজের গ্রামের চেনা পথঘাট। মাত্র তো তিন - চার কিলোমিটার হবে। আমি কাল সকালেই চলে যাবো। রাস্তায় পরিচিত লোকজন অনেককেই পাওয়া যাবে। এলাকার মানুষকে আমি চিনি। সবাই আমার পরিচিত। দু'দিন থেকেই আবার চলে আসব।

—ঠিক আছে। যেও। দুটো পাকা পেঁপে, কয়েকটা কলা তোমার বাবার লাগি লইয়া যাইও। সুপারিও কয়েকটা দেমুনে।

—ঠিক আছে, নেমুনে।

—টম্পারে আমি কইয়্যা দেমু। তোমার যেন আগাইয়্যা দিয়া আয়। টিলাডা বড় টিলাডা পারইত পারতনা। রাস্তা ভালা না। সরু এবং ভীষণ উঁচু নিচু। ওখানে তোমারে নামাইয়া দিয়া আইব। সেখান থেকে তুমি সহজেই যেতে পারবা। দেখি, তোমার বাবারেনি খবর দেওন যায়। কয়েকদিন থাইক্যা আইঅ। শমিত বাড়ি আইলে—আনবনে গিয়া। তবে ওখানে গিয়া কিন্তু সাবধানে থাইককো। আমি তো ঠাম্মা হতে চাই। ছেলে বা মেয়ে যা-ই হোক, ওকে নিয়ে আমি সারাদিনই খেলব। শুধু কাঁদলে মাই খাইয়ে দিও। লজ্জায় পাপড়ির মুখমণ্ডল আরক্ত। মাতৃত্বের অভিব্যক্তি সারা শরীরে ফুটে ওঠে। আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। খুশি হয়। হাবভাবে শাশুড়িকে বুঝিয়ে দেয়— দেমুনে-দেমুনে..., ঠাম্মার কোল আলো করে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। নাতি-নাতনি। আমিও তো মা হতে চাই। আমার সন্তানকে আদর সোহাগে ভরে দিতে চাই। মনে

হয়—এসব স্বপ্ন। স্বপ্নে অনেক কথা ভাবনা ডালপালা মেলে অনেক দূরে চলে যায়। জীবন এগিয়ে যায় আশার প্রতিটি কোষে। সকালে টপ্পা ঠেলা লইয়া আসে। তাতে পাপড়ি পুঁটলি-পাঁটলা লইয়া বসে। টপ্পা ঠেলা লইয়া এগিয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে সেগুন-গামাইয়ের বাগান। সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির কোলে নাচতে ইচ্ছে হয়। পাপড়ি গুন গুন করে গান ধরে। টপ্পা নানান কথা বলে। রাস্তা উঁচু-নিচু। হেলেদুলে ওরা ভোলনপাড়ার পাশ দিয়ে চলে যায়। ভোলন বাজার এখন জলের নিচে। লোকজন নেই। ওরা মণিটিলার কাছাকাছি চলে এসেছে। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। রৌদ্রের তেজ কম। দু'একটা পাখি উড়ে উড়ে এ গাছ থেকে ও গাছে যায়। সামনে দিয়ে কয়েকটা বনমোরগও পেছন দিকে চেয়ে চলে গেল। পাপড়িকে দেখে হয়তো কথা বলতে চেয়েছিল। হয়তো কথাও হয়েছে, মানুষে-পাখিতে। টপ্পা এক সময় ঠেলা থামিয়ে বলে— পাপড়িবৌদি, আর ঠেলা লইযা যাওয়া যাবে না। সামনে ছড়া। এখন জলের স্রোত কম। ছড়াটা পেরোলেই তো জগবন্ধুবাড়ি। সামনের বাঁকটা পেরোলেই তোমার বাপের বাড়ির বড় বাঁশঝাড়টা দেখা যাবে। আধ ঘন্টা হাঁটলেই তুমি পৌঁছে যাবে। তুমি এখান থেকে একা একা যেতে পারবে তো? না আগাইয়া দিয়া আসুম?

—ধ্যুৎ বোকা। আমি আবার যেতে পারব না। বিয়ের আগে কতবার এ রাস্তায় আসা যাওয়া করেছি। এ পথ আমার শুধু জানাই নয়। পরম আপন। মেটোপথের ধুলোবালি যেন কথা কয়। নোয়াবাড়িও জগবন্ধুবাড়ি আমার রক্তে মেশানো গ্রাম। এদের পাহাড়ি বাতাস, বুনোছন্দ, আকাশ আমাকে সব সময়ে ডাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় এসব জঙ্গলে -গাছ -গাছালির বনের ফাঁকে হাবিয়ে যাই। বনপরি হতে ভীষণ ইচ্ছে হয়।

—বনপরি হওয়ার কাম নাই। শমিত দা পাগল হয়ে রাস্তা ঘাটে ঘুরবে।

—তখন তোর শমিতদাকে বনের মধ্যে ডেকে এনে আরও বেশি ভালবাসুম।

—শমিতদা বনের মধ্যে আসবেই না। ভূতবে সাংঘাতিক ভয় পায়। যাক গে, রাখ তোমার আবোলতাবোল কথা। আমি এখন আসি। টপ্পা ঠেলা লইয়া ঘুরে দাঁড়ায়। বাড়ি গিয়া মাটিকাম করুম।

—ঠিক আছে, যা। আমি যেতে পারব।

—কিন্তু এ দিকটা তো ঘন জঙ্গল। রাস্তাও সরু। ছন খেতে ভরা। হাঁটতে তোমার অসুবিধা হবে না তো? অসুবিধা হলে কও, তোমার ঘরে রাইখ্যা আই। ডরাও নাকি?

—না রে টপ্পা, আমার চান্দ। যেতে পারব। অত উতলা হইওনা! চোখে মুখে হাসির ফোয়ারা। পাপড়ি যেন বনদেবী। বন তাব আপন আলয়।

—ও দিকটা উঁচু-নিচু মেটো পথ। স্থানে স্থানে ঝোপঝাড়, যদি শেয়াল আসে? বনটুলা বা বাগদাস? তোমার তো...।

—যা-যা। আর পাকা পাকা লেকচার দিতে হবে না! ও-সব বুলি অন্য কোথাও ঝাড়িস! তোর কাম আছে না, গোবরগণেশ?

—অ-আছে। এজন্যই তো তোমার লগে যেতে পারলাম না। সাবধানে যেও। নির্জন পথ। যারা লাকড়ি বাঁশ সংগ্রহ করতে আসে তাদেব সঙ্গে তোমার দেখা হবেই। চেনা

লোকজনও পেতে পার।

টপ্পা ফিরে এলো। পাপড়ি ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে খুশি মনে হাঁটতে থাকে। মা বাবাকে অনেকদিন পর দেখবে। সংসারের নানান ঝামেলা। শমিত ওকে ধর্মনগরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পাপড়ি যায়নি। শাশুড়িমাকে ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে যেতে মন চায়নি। শমিতের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়, দেখাদেখি, প্রস্তাব, বিবাহ সব কথাই হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছে। ছবির মতো। ও মনে মনে হাসে। সামনে ছড়া। পেরোতে হবে। হাঁটুর ওপর জল। কোমর ছুঁই-ছুঁই। ভীষণ ঠাণ্ডা। কেউ কোথাও নেই। তাই পেরোতে কোন অসুবিধাই হয়নি। শরীরের নিম্নাংশ যত জলে ডুবে যায়, কাপড় তত ওপরে ওঠে। লজ্জা জলের নিচে ঢাকা পড়ে। ছড়া পেরোতেই খাড়া বাঁকা পথ ওপরে উঠে গেছে। একটু কষ্ট হলো রাস্তার ওপরে উঠে আসতে। তারপর পাহাড়ি সরু পথে হাঁটতে লাগল। সামনের দুটো বাঁক ও তিনটে টিলা পেরোলেই বাপের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। কত কথা জমে আছে। মাকে বলবে। সে এখন জগবন্ধুবাড়ির এলাকায় সবেমাত্র প্রবেশ করছে।

শমিত সাতদিন পর বাড়ি এসেই শুনল তার স্ত্রী পাপড়ি বাড়ি নেই। বাপের বাড়ি গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের জন্য মনটা উথাল-পাথাল। শরীরের ভেতর আগুনের কামড়া-কামড়ি। মায়ের সামনে প্রকাশ করে না। শমিত নির্লিপ্ত ও চুপ হয়ে যায়। উমা দেবী ব্যাপারটা বুঝতে পারে। এত বয়স হলো আর এই সামান্য বিষয় বুঝবে না? হতেই পারে না। ওদের বয়স তো তিনিও পেরিয়ে এসেছেন। স্নেহমাখা সুরেই বললেন, তুই যা শমিত, গিয়ে বউমাকে নিয়ে আয়। তুই তো অনেকদিন শ্বশুর বাড়িতে যাসনি। তোর শ্বশুর-শাশুড়ি খুশিই হবেন। ওদেরকে দেখে আসবি। আমি তো বউমাকে বলেছি—ও যেন দু-তিনদিন থেকেই চলে আসে। কিন্তু এক সপ্তাহ হয়ে গেল। আসল না। নাকি অসুখ বিসুখ করল? কে জানে! তবে অসুবিধা হলে তো নিশ্চয়ই খবর দিত। কী হয়েছে? ভগবানই জানেন। উমাদেবীর মনটা বিষাদে ভরে যায়। বউমার কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। যা বাবা, তুই এক্ষুনি রওনা দে। সাইকেলে গেলে আর কতক্ষণ। সন্ধ্যা হয়ে গেলে আজ আসিস্ না। আজ শনিবারও। একরাত থেকে কাল সকালে বউমাকে সঙ্গে নিয়ে আসিস।

শমিত সন্ধ্যার আগেই শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে যায়। বাড়িতে ঢোকার সময়ই শ্বশুর বোমেশবাবুর সঙ্গে দেখা। সাইকেলটা পাশে দাঁড় করিয়ে ওনাকে প্রণাম করে। বোমেশবাবু বললেন—থাক বাবা, থাক, তুমি একা কেন? পাপড়ি মা আসেনি? ওর খবরাখবর সব ভালো তো? শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল শমিত! শ্বশুরমশাই কী ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন? নাকি ভালবাসা পরখ করছেন? বুঝতে পারল না। কিন্তু তিনি তো এমন করার কথা নয়! মাথা খারাপ! শমিত ঘাবড়ে যায়। দেহে শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করে বলে, -না... মানে...। পাপড়ি তো এক সপ্তাহ আগেই আপনাদের বাড়িতে এসেছে। মা-তো সেই কথাই বললে। ঐ ছড়া পর্যন্ত টপ্পাও আগাইয়া দিয়া গেছে। তা হলে? গেল কোথায়? আপনি কি কোথাও গিয়েছিলেন নাকি? বোধ হয় আজই বাড়ি ফিরলেন! সব কিছু জানেন না। মা-কই? ডাকেন তো। বোমেশবাবুর মুখমণ্ডলে ভয়ের ছায়া। চারদিক যেন

অন্ধকার। সারা শরীরে ঘাম দিচ্ছে। তিনি মাটিতেই বসে পড়েন। ডাকেন, কই গো পাপড়ির মা, আরে... অ... কুসুম। এদিকে এস... শোন, শমিত কী বলে! কুসুম দ্রুত এসে শমিতকে দেখে বলেন, আ-রে...শমিত বাবা! কখন এলে? মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলে, কী হয়েছে বাবা? কোন খারাপ খবর? তোমার শ্বশুর মাটিতে কী করছে? ভয়ার্ত চেহারা!

—ভয়ের কথাই! পাপড়ি নাকি আপনাদের বাড়িতে আসেনি? কনছেন দেখি... সেটা কি সত্যি? মা-বলুন না, এটা মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা! পাপড়িকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলুন , আমি এসেছি...।

—কী বলছ—শমিত? তোমার শ্বশুরের কথাই তো ঠিক। পাপড়ি তো এখানে আসেনি। আমি মনে করেছি তোমার সঙ্গেই এসেছে। শমিত চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগল। সর্ষেফুল! একি দুর্ঘটনা? নাকি দুঃস্বপ্ন? শমিত কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বোমেশবাবু এক সময়ে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলতে থাকে, আমার মেয়ে .... আমার মেয়ের কী হলো...? নেই কেন?

চেঁচামেচি চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এল। ব্যাপারটা শুনে সকলে থ বুনে গেল। এক সপ্তাহ আগেই পাপড়ি নিখোঁজ। অথচ বাপের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাহলে কী হলো? এসব পথঘাট তো পাপড়ির একদম চেনা। নখদর্পণে। ভুল হওয়ার তো সম্ভাবনাই নেই। অথচ...। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও পাপড়ি যাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং ব্যাপারটা ঘোরতর সংকটময়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়ে গেল। কোথাও পাপড়িকে পাওয়া গেল না। একটা মানুষ 'নাই' হয়ে গেল! বাতাসে মিশে গেল! এ যেন মন বিশ্বাসই করতে চায় না।

সেদিন রাত আটটায় রইস্যাবাড়ি থানায় এফ আই আর করা হলো। নিখোঁজ-ডায়েরী। নিখোঁজের তারিখ, বার, সময়, বয়স, উচ্চতা এবং গায়ের রঙ সব লিপিবদ্ধ করা হলো। ও সি সাহেব মতিবাবু আশ্বাস দিলেন যে, তিনি নিজেই এই কেইসটা হ্যাণ্ডেল করবেন। অপরাধী যেই হোক না কেন, তিনি খুঁজে বের করবেনই। পরদিন সকালেই তিনি ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমেই মতিবাবু পাপড়ির শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির লোকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান নোট করেন। তদন্ত করেন। কিন্তু নিখোঁজের কোন ক্লু বের করতে পারেননি। অন্ধকারেই সাঁতার কাটেন। ইতিমধ্যে মতিবাবু চারবার এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু পাপড়িব নিখোঁজের কোন সূত্রপাত ঘটাতে পারেনি। নাকি কেউ মুখ খুলেনি! ভয়ে? অপরাধী কত গভীর জলে কে জানে। মতিবাবুর জেদ চেপে যায় মাথায়। পাপড়িকে খুঁজে বার করবেনই। মারা গেলেও লাশের হদিশ তাকে করতেই হবে। রহস্যের উন্মোচন তিনি করবেন। প্রতিদিনই থানাতে এসে পাপড়ির শাশুড়ি, মা, বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাপড়িকে পাওয়া গেল কিনা জানতে চায়। মতিবাবু কিভাবে ওদেরকে সান্ত্বনা দেবেন? শমিত আর অফিসে যায় না। খাওয়া-ঘুম নেই। স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। পাগল পাগল ভাব। উমাদেবী এসব শুনে চিৎকার করে কাঁদেন। শমিতের বাবা কথা বলতে পারে না। আকার ইঙ্গিতে সব বোঝে। চোখ থেকে গাল বেয়ে জল গড়ায়। ওরা কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। দুটো পরিবারেই বিষাদের ঘন ছায়া। ছন্দপতন ঘটে। বিঘ্নিত হয় গ্রহ -নক্ষত্রের

পরিক্রমা। তুফান ছুটে আসে। শমিতের বুকে ঘূর্ণি, জলোচ্ছ্বাসের লবণাক্ত জলের স্রোতে ভিজে যায় কপাল।

মতিবাবু বারবার তদন্তে গিয়ে ব্যর্থ। এবার তিনি একটা নতুন পথ মনে মনে স্থির করলেন। কাউকে আগে বলেননি। সন্দেহমূলক মানুষদের নাম তিনি নোট করে রেখেছেন। কে কী কাজ করে তাও জেনেছেন। অনেকের নৈতিক চরিত্রও জেনে নিয়েছেন। কারা অন্ধকারে চলে? তবে কে কে এই সন্দেহের তালিকায় আছে—তা অন্য কেউ জানে না। একদিন সন্ধ্যেবেলায় নোয়াবাড়ি এলাকায় একটা বস্তিতে কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে উঠলেন। রাতে থাকবেন। টি এস আর জোয়ানদের টহল দিতে বলা হয়েছে। মতিবাবু যখন আর্মফোর্স নিয়ে পৌছুলেন—তখন বেলা যায় যায়। রাত্রে ফিরতে পারবেন না। এম্বোশে থাকতে হবে। উগ্রপন্থীরাও আক্রমণ করতে পারে। কাজেই সাধু সাবধান। মতিবাবু টপ্পার সঙ্গে এবং এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষের সাথে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যও উঠে এসেছে। খুনি বা অপরাধী যে-ই হোক না কেন, ধরা তাকে পড়তেই হবে। অপরাধী কে হতে পারে, তিনি অনেকটা আঁচ করতে পারছেন। অপরাধী এক বা একাধিকও হতে পারে। জগবন্ধুবাড়ি এবং নোয়াবাড়ি এলাকাতে তাদের স্থায়ী বসবাস। এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তদন্তের স্বার্থে তিনি এক্ষুনি এ সব প্রকাশ করতে চান না। হয়তো আজই অপরাধী ধরা পড়বে। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে আসছে। ভোর হলেই আকাশ মেঘ মুক্ত হবে।

সেদিন রাত্রে মতিবাবু সুব্রতার বাড়িতেই আসর জমালেন। সুব্রতাকে ডেকে বললেন, আজ তোমার বাড়িতেই আনন্দ-ফূর্তি করবো। মদ খাব, শূকরকা মাংস খাব। তুমি খুশি মতো বাংলা চোলাইয়ের ব্যবসা করতে পারো। তোমাকে আর কেউ বাঁধা দেবে না। পুলিশ জ্বালাতন করবে না। তোমাদের তো বাঁচতে হবে? যে যেমনে পার বাঁচ। এই দুনিয়াতে সবার সমান অধিকার। আমি শালা বাধা দেবার কে? সুব্রতা খুশি হয়ে বলে- -স্যার, তাহলে তো খুবই আনন্দের কথা। গরিবের বাড়িতে আজ ভগবানের নৃত্য হোক, আজ আমি আপনাদের মদ, মাংস খাওয়াবো। ভবিষ্যতে আমাকে একটু দেখবেন, মানে. .. ইয়ে.. করবেন আর কি...।

—অবশ্যই... অবশ্যই... আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নাই। চালিয়ে যাও।

—তবে—তাই হোক।

—না, তা হবে না সুব্রতা। আজ যত মদ, মাংস লাগে তার সব দাম আমি দেব। তুমি অন্য একদিন দিও। তবে আর একটা কথা—এলাকার বেশ কয়েক জনকে আমাদের আমোদ আসরে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তুমি এক্ষুনি তাদেরকে বলে এস, থানার বড় বাবুর আহ্বান যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে। তৎক্ষণাৎ সুব্রতা চাকমা লিস্ট অনুযায়ী কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে এল।

রাত্র আটটার মধ্যেই আসর জমে উঠল। মাগনা মদ মাংস। খাওয়া দাওয়া, ফুর্তি আয়েশ। অনেকেই এসে ভিড় করে আনন্দে খেতে লাগল। প্রথমে কারও কারও একটু ভয় করছিল। পেটে তরল পদার্থ পড়ার পর ভয় টুটে গেল। সবাই রাজা ও নেতা হতে লাগল। রাত দশটা বেজে গেল, মতিবাবু যে লোকটাকে টার্গেট করেছেন, সে এখনও আসছে না কেন? সুব্রতাকে

জিগ্যেস করলেন, অনিল চাকমা আসবে না?

—নিশ্চয়ই আসবে, স্যার। আমি তো বলে এসেছি, আমার কথায় তো না এসে পারবেই না। মতিবাবু আগেই জেনে গেছেন...। সুব্রতার সঙ্গে অনিলের অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপার-স্যাপার। ওরা গভীর জলের মাছ। অনিল বিপত্নীক। একটা দশ বছরের ছেলে আছে। ছেলের প্রতি অনিলের বিশেষ নজর নেই। ছেলে কী খেল, কী পড়ল। স্কুলে গেল কি গেল না, এসব নিয়ে অনিল মাথায় ঘামায় না। সুব্রতার কথায় ওঠবস। সুব্রতা স্বামী পরিত্যক্তা। সুব্রতা এলাকার দুশ্চরিত্রা বলে পরিচিতা। অনেকেই এড়িয়ে চলে। অনিলের কিছু সমতল ভূমি আছে। ভাল চাষ হয়। জুম চাষও করে। এবছর ফসলের রমরমা। অবসর সময়ে ওরা জঙ্গল থেকে লাকড়ি-বাঁশ সংগ্রহ করে। নিজেদের কামে লাগায়। কখনও চুক্তিতে বিক্রি করে দেয়। এসব কাজে অনিলের পাশে সব সময় সুব্রতা থাকে। অনিয়ন্ত্রিত লিভ-টুগেদার। ও একটা ভিজে বেড়াল। মোছ তাউ দিয়ে হাসে। এবারে পঞ্চায়েত ইলেকশনে মেম্বারে দাঁড়াবার ইচ্ছে আছে। টাকা খরচ করলে ভোটে পাশ করা কোন ব্যাপারই না। যদি গ্রাম-প্রধানের পদটি পাওয়া যায়, কপালে সোনার হরিণ। জনগণ-টনগণ ওসব গৌণ ব্যাপার। এ কয়দিনে তার নামটা ইংরেজিতে সই করা শিখতে হবে। সে আর অশিক্ষিত হয়ে থাকতে চায় না। জনগণের চোখে গ্রামের বুকে সে আলো জ্বালাতে চায়। এসব তথ্য মতিবাবু ওর কাছের লোকদের জিগ্যেস করে জেনেছেন। অনিল এবং সুব্রতা কি সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দুতে? এ ব্যাপারে টপ্পাকে কাজে লাগিয়েছে। মতিবাবু অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

অনিল প্রায় রাত দশটার সময় আসে। তখন আসরে অনেকেই মদ খেতে খেতে বেহুঁশ। অনিল রাস্তা দিয়ে আসবার সময়ে আগেই নেশা করে এসেছে। মতিবাবুর পাল্লায় পড়ে নেশা আরও জমে উঠল। অনিল মতিবাবুকে মদ খাওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। রাত দুটো। শরাবি আসর তুঙ্গে। গ্লাসে গ্লাসে টুস, আঃ চিয়ার্স... চিয়ার্স...। বাঙলা চোলাই লাঙগি গলার নিচে ঢুকে যাচ্ছে। শেষে সুব্রতাও এসে আসরের সামিল হলো। সুব্রতা যে এত টানতে পারে মতিবাবু আগে ভাবতেই পারেননি! একে একে গ্লাস খতম করে ফিরিয়ে দেয়। আবার নেয়! এক সময় বস্ত্র খুলে ফেলে দেয়। থাকে শুধু শায়া, বুকে রিয়া। যৌবন কি ঢল ঢল! শরীর মসৃণ। গলায় একছড়া রুপোর টাকার মালা। মাঝে মাঝে লজ্জা অঙ্গ দেখা যায়। বড়ো বিশ্রি লাগে। মতিবাবু চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ওনার মনে তখন অন্য চিন্তা। কী করে পাপড়ির খুনিকে ধরা যায়। যদি আন্দাজ সঠিক হয়, তবে আজই...। ওরা একটা টংঘরের উঁচু মাচাতে বসেছিল। মতিবাবু গ্লাসভরা তরল মদ পেছন দিকে মাচার নিচে ফেলে দেয়। নেশা করেননি। মাতালের ভান করেছেন। অনিল-সুব্রতা এবং অন্যরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। মাতলামি করতে করতে এক সময় মতিবাবু বলে—বুঝছ অনিল, পাপড়ির খুনিকে আর ধরব না। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। আজ আমরা কী ফুর্তি করছি! হা... হা... কী আনন্দ! আমি আর এসব কাজে আসবই না। কাল থানাতে গিয়ে কেইস ডিসমিস করে দেব। লিখে দেব, নিখোঁজের কারণ জানা যাবে না। সামনে ইলেকশন, এসব বাজে কাজে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। পাপড়ি নিখোঁজ হয়েছে তা

আমি কী করতে পারি। নাকি অন্য লোকের সাথে পালিয়ে গেছে— কে জানে? মদের গ্লাসে মুখ ছোঁয়ায়। খায় না। ফেলে দেয়। মাতলামি আরও বাড়ায়। অনিলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়। অনিল ভাবে এই দারোগাবাবুকে নির্ভর করা যায়। সুব্রতা নেশায় চুর হয়ে গেছে। বোধ হয় প্রস্রাব করে ফেলেছে। সুব্রতা তার সুবৃহৎ নরম স্তন যুগল বারবার নাচায়। দারোগাবাবুকে আজ রাতে কিছু উপহার দিতে চায়। জ্বালা কমবে। সুব্রতা মতিবাবুর ' য়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। অনিল একটু বিরক্ত হয়েই বলে, তুমি খুনি ধরতে পারবে না রে, বন্ধু....। তবে পাপড়ি মেয়েটা ভীষণ ভালো ছিল। কী করবো? লোভ সামালতে দিতে পারে নাই। এতো দামি স্বর্ণের গয়না আনল কোথা থেকে...? শুধু কি ও পরলেই চলবে? সুব্রতাকেও তো পরতে হবে। মেয়েটা আবার চিনে ফেলেছে। কী করবো তাকে মরতেই হলো। সত্যি মেয়েটার জন্য বড়ো কষ্ট হয়! বড়ো কষ্ট! শেষ মুহূর্তটা কী অসহায় ছিল! আজ থেকে দারোগাবাবু মানে ও সি সাহেব আমার বন্ধু হলেন। আর কোন চিন্তা নাই। সাত খুন মাপ।

মদের নেশায় অনেক কথাই অনিলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। মতিবাবু বুঝতে পারলেন যে, পাপড়ির নিখোঁজ বা খুন হয়ে যাওয়ার পেছনে অনিল প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অন্যরাও যুক্ত থাকতে পারে। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে। মোরগ ডেকে উঠল। রিস্ট ওয়াচে তখন চারটে বাজে। মতিবাবু বাঁশি বাজালেন। কনস্টেবলরা ছুটে এল। একজন হাবিলদাব কাছে ছিলেন। মতিবাবু চিরাচরিত ভঙ্গিতেই নির্দেশ দিলেন—অ্যারেস্ট হিম। কনস্টেবল অনিলের হাত বেঁধে ফেলে। সুব্রতা চুপিচুপি সরে যাচ্ছিল। মতিবাবুর ইশারায় তাকেও অ্যারেস্ট করা হলো। নেশা তখনো তাদের কাটেনি। ওরা নেশার ঘোরেই বলছে, আপনি না আমাদের বন্ধু! বন্ধু হয়ে বন্ধুকে...। এমন কাজ করলেন কেন?

—আমি অবশ্যই তোমাদের বন্ধু। সকলের বন্ধু। দশ ও দেশের বন্ধু। মানুষের বন্ধু। খুনি অপরাধীর ভীষণ শত্রু। তোমরা যদি নির্দোষ হও, তবে তোমাদের কিছুই হবে না। এখন আমার সঙ্গে তোমাদেরকে থানায় যেতে হবে। প্রায় সাড়ে তিন মাইল হেঁটে আসতে হলো। সরু রাস্তা গাড়ি চলতে পারে না। পায়ে হাঁটার পথ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। বড় রাস্তায় জিপের কাছে আসতে।

ওদেরকে লক আপে ঢুকিয়ে মতিবাবু একটু বিশ্রাম নিলেন। চান করে খেয়েদেয়ে দুপুরে একটা ঘুম দিলেন। সন্ধের পর মতিবাবু ওদের জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করেন...। রাতে তিন-চার বার জেরা করা হয়েছে। শেষমেশ থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করায় অনিল গড় গড় করে সব বলে দিয়েছে। তবে পাপড়িকে অনিল খুন করেনি। সুব্রতাই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড করেছে। সুব্রতাকে এখন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে স্বীকারোক্তিতে বলেছে, সেদিন সুব্রতা অনিলের সঙ্গে জুম চাষে গিয়েছিল। টাকা পয়সা নিয়ে অনিলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। সুব্রতা একা একাই বকর বকর করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। নির্জন রাস্তার মুখে পাপড়িকে দেখে সুব্রতা এগিয়ে যায়। পাপড়ির গায়ে অনেক দামি স্বর্ণালঙ্কার জ্বল জ্বল করছিল। সুব্রতা লোভ সংবরণ করতে পারেনি। এত অলঙ্কার সে কখনও আগে দেখেনি। পাহাড়ি পরিবেশ। মাথাটা ঘুরে গেল। পাপড়ি ছড়া পেরিয়ে খাড়া রাস্তা উঠে একটু জিরোচ্ছিল। গাছতলায়। সামনে একটু তেরছা নামলেই

জগবন্ধুবাড়ির আঁকাবাঁকা পথ। সুব্রতাও তখন গাছতলায় এসে বসে। পাপড়ির স্বর্ণালঙ্কার দেখে অবাকও বিচলিত হয়। পাপড়ি তাকে বলে, পিসি কোথায় গিয়েছিলে? কেমন আছ?

—ঐ তো জুম খেতে। ভাল্ লাগে না। আইয়া পড়ছি। তুমি কই যাও?

—বাপেরবাড়ি যামু। দু'দিন থাইক্যা আইয়া পড়ুম। ও, এ সপ্তাহে আসতে পারবে না... তাই...।

—তুমি কি একাই যাও? সঙ্গে কেউ আসেনি?

—না, কেউ আসেনি। কতটুকু আর পথ। একাই যেতে পারব। এ কথা বলে পাপড়ি চুপ করে থাকে। কারণ সুব্রতার চাহনি তার পছন্দ হয়নি। অদ্ভুত! আমি চলি বলে পাপড়ি তেরছা রাস্তা নেমে যাচ্ছিল। পেছন থেকে সুব্রতা পাপড়িকে ঠেলা মেরে ফেলে দেয়। তারপর ভান করে পাপড়িকে উঠাতে গিয়ে পরনের শাড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। সুব্রতার সাহস ও শক্তি যে কোন পুরুষ অপেক্ষা কম নয়। পাপড়ি ছটফট করে নিথর হয়ে যায়। পেছনে অনিল এসে ঘটনা দেখে থ বুনে যায়। মুখ দিয়ে কোন কথাই সরে না। সারা শরীর যেন অবশ।

কিন্তু সুব্রতাই তাকে চুপ করে থাকতে বলে। ধমকে ওঠে। মৃতদেহ গুম করার কাজে অনিলই সর্বতোভাবে সুব্রতাকে সাহায্য করে। অনিলই টিলার পাশে মাটি খুঁড়ে পাপড়ির মৃতদেহ চাপা দেয়। সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার দু-ভাগ করে নিয়েছিল।

পাপড়ি হত্যা করার সময় সুব্রতার হাতের অষ্টধাতুর আংটিটা পড়ে গিয়েছিল। ভাবছে হারিয়ে গেছে। অনিলের টাক্কালটা ভুলে রাস্তার পাশে ফেলে গিয়েছিল।

এসবই পুলিশ সংগ্রহ করেছে। অনিল ও সুব্রতা স্বীকার করেছে যে, ওগুলো তাদেরই। ওদেরকে আবার গ্রামে নিয়ে আসে পুলিশের হেফাজতে। মৃতদেহ মাটির নিচ থেকে তুলে এনে সৎকার করা হয়। অনিলই মৃতদেহের হদিশ দেয়। শব দেহ চেনা যায়নি। কিছু কাপড়ও প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখে শনাক্ত করতে পেরেছে যে, ওটা পাপড়িরই মৃতদেহ। শ্বশুরশাশুড়ি এবং বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। শমিত পাগলামি শুরু করে। শোকের ছায়া নেমে আসে। মতিবাবু সুব্রতা এবং অনিলকে কোর্টে চালান করে দেন।

জীবন যেন ঝড়োশিস

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পূর্বাকাশে লাল আভাস। ঘুমন্ত শহর এক্ষুনি জেগে উঠবে। এমনি আলোআঁধারি সন্ধিক্ষণ। রাস্তায় মানুষ বেরোতে শুরু করেছে। অনেকেই ব্যায়াম-দৌড়াদৌড়ি করে স্বাস্থ্যকে সুস্থ ও সবল রাখতে চায়। প্রতিদিন সকালে অনেক লোকই হাঁটাহাঁটি করে। অম্পি চৌমুহনী গোলচক্করে একটা মেয়ে ওঠবস করছে। কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন যেন। শংকরদা প্রতিদিনের মতো ভোরে দলবল নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। ওপার চোখেই প্রথম ব্যাপারটা ধরা পড়ে। মেয়েটা অচেনা, অস্বাভাবিক। লাল চোখ, শরীর ক্লান্ত। বয়স ষোল কি সতের। অপূর্ব সুন্দরী, যৌবনের প্রথম সিঁড়ি। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার সংকেত! উদ্ধত বুক। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। মেয়েটা কী কোন ভুল করেছে? নাকি প্রেমিকের প্রলোভনে পড়েছে? পালিয়ে এসেছে রাতে? শংকরদা মেয়েদের সম্বন্ধে বইয়ে পড়েছেন—মানে গল্প-উপন্যাসে। নারী প্রকৃতির আচার-আচরণ বইয়ের চরিত্রের সঙ্গে মিলবে কি? ভয়ও আছে। পারতপক্ষে তিনি মেয়েদের কাছাকাছি যান না। এড়িয়ে চলেন। সাহস কম। শংকরদার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে বিয়ে করতে পারেনি। সম্বন্ধ এসেছে অনেক। ভেঙে দিয়েছেন। হয়তো আর বিয়েই করবেন না। আবার বলাও যায় না, শেষবেলা যদি বিয়ের ফুল ফোটে? যদি সামাল দিতে না পারেন। বিয়ে তো দিল্লিকা লাড্ডু। এ হেন শংকরদা আমাদের সকলের প্রিয়। তিনিও কৌতূহল দমন করে রাখতে পারেননি। এগিয়ে গেলেন মেয়েটির কাছে। মেয়েটি কি প্রোস্‌টিউট? কোন ব্রোথেল থেকে এসেছে? শেষ রাতে? কিন্তু হাবভাব চেহারা দেখে তো তা মনেই হয় না। তবে রতিপ্রিয় নারীদের সাথে কিছুটা মিলে যায়। শংকরদার বুদ্ধি সেদিন এলোমেলো হয়নি।

— কে গো মেয়ে তুমি? এত সকালে এখানে কী করছ? বলে—শংকরদা মেয়েটির দিকে উত্তরের আশায় চেয়ে থাকেন। মেয়েটি চোখও মাথা নামিয়ে নেয়। কথা বলে না। চুপ থাকে। শংকরদা আবার বলেন—এই মেয়ে, তোমার নাম কী?. কোথা থেকে এলে? কথা না বললে তোমার ভারী বিপদ হতে পারে। বোবা নাকি? হঠাৎ মেয়েটি রাগত স্বরেই বলে—তাতে আপনার কী? আমি কোথায় থেকে এলাম, কোথায় যাব, তা জেনে আপনার কী কাজ? শংকরদা একটু দমে যান। এ রকম উত্তর তিনি আশা করেননি। অন্যরা বলল, চলে আসুন শংকরদা, এসব মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে লাভ নেই। এত খোঁজ খবর নিয়ে আমাদের কাজ নেই। চলুন এগিয়ে যাই।

—তা ঠিক। কিন্তু .... খারাপ লোকের হাতে পড়লে কী হবে একবার ভেবে দেখ। যদি অস্পষ্ট আলোতে রেপট হয়? হওয়ার সম্ভাবনাই তো বেশি। ইতিমধ্যে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। লোকজন বেরিয়ে পড়ছে।

— এভাবে মেয়েটা বেশিক্ষণ থাকলে ক্ষতি হতে পারে। এক্ষুনি থানার বড়বাবুকে খবর দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ শংকরদা থানাতে গিয়ে সব জানালেন। যিনি ডিউটিতে ছিলেন, তিনি

দু'জন কনস্টেবল নিয়ে এলেন এবং মেয়েটিকে আপাতত থানায় নিয়ে এলেন। এরপর ঘটনাটা অন্যদিকে মোড় নেয়। মতিবাবু জাঁদরেল দারোগা। ওনার নাম শুনলেই সাধু সাবধান। অপরাধী কাপড় ভেজায়। কড়া পুলিশ অফিসার হিসাবে সুনাম ও দুর্নাম দুই জড়িয়ে আছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন ' অভিজ্ঞতা গভীর। মেয়েটি দারোগাবাবুকে চিনে না। চিনবেই বা কেমন করে। এই প্রথম মেয়েটি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে। মতিবাবু নানা প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয় জেনে নিলেন।

— তোমার নাম কী?

—সুপ্রভা।

— বাড়ি কোথায়?

— বাড়ি উত্তর কৃষ্ণপুর। উতলাবাড়ি।

—বাবার নাম কী?

— অরুণ ঘোষাল।

—কেন এখানে এভাবে এলে?

—বিমলের কথায়।

—বিমল কে?

—রামদেবের ছেলে। বিমলকে আমি ভালবাসি। সুপ্রভা চুপ করে থাকে।

মতিবাবু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করেন, হিসাব মেলান। মেলে না। কোথা যেন গোলমাল।

—কিন্তু তার জন্য তোমাকে ঘর ছাড়তে হলো কেন?

—ভোর রাতে তুমি কেমন করে এলে?

—খুব সম্ভব রাত তিনটা-চারটার সময় ঘর থেকে বের হই। আন্দাজ মতো। সঠিক বলতে পারব না।

—বিমলের বাড়ি কোথায়?

—আমাদের গ্রামেই। মাধ্যমিক পাশ। ক্যামেরাম্যান। স্টুডিও আছে। মাঝে মাঝে কন্ট্রাকটারিও করে। বড় ভাইয়ের মাছের ব্যবসা। নাম মৃদুল সেন।

— রামদেববাবু কী করেন?

—উনি বেঁচে নেই। শুনেছি রাজনীতি করতেন। আমরা বাঙালি। তখন আমি ছোট। মনে নেই।

—কিন্তু তুমি পালিয়ে এলে কেন? এমন কী ঘটেছে যে, তোমাকে ভাগতে হলো?. বিমলের কি পরে আসার কথা ছিল?

—না, বিমল আসবে না? আজ আমার বিয়ে। বাবা অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছেন। পাত্রের বাড়ি খোয়াই। শুনেছি অবস্থাপন্ন পরিবার।

—অঃ বুঝেছি। তোমার বাব' .তামার প্রেমের কথা জানেন না?

—না, জানেন না। মাও জানেন না। শুধু ছোট বোন সুপ্রিয়াকে বলে এসেছি। হয়তো সে বাবাকে বলে দিয়েছে।

—তুমি ভীষণ ভুল করেছো? বোকা মেয়ে। তোমার বিয়ে তোমার বাবার মতেই হওয়া উচিত ছিল।

—কিন্তু আমার বয়স তো আঠার হয়নি। আঠার নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ। আমি তো রাজিও নই। মতিবাবু বুঝলেন যে, এ সব কথাবার্তা প্রেমিক বিমল শিখিয়ে দিয়েছে। শেখানো বুলি। হায় রে বোকা মেয়ে! দারোগাবাবুরও সুপ্রভার মতো একটি মেয়ে আছে। সেও যদি অজান্তে এমন কিছু করে ফেলে? তিনি আঁতকে ওঠেন। মেয়েদের এ বয়সটা মারাত্মক। ঝড়ো-তুফান। মা-বাবা অভিভাবক সকলে এদের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। নইলে বিপদ হবে। নষ্ট হয়ে যাবে ওদের সমগ্র জীবন। ঝরে যাবে অকালে অসংখ্য ফু ল। ফল দেবার আগেই বিষক্রিয়ার ছোবলে ঝরে যাবে পাতা। বিবর্ণ ভবিষ্যতের উন্নয়নের সিঁড়ি। আসলে মেয়েরাই উপহার দিতে পারে—একটা সুন্দর—আদর্শ শোষণহীন বিদ্বেষহীন সমাজ। সত্যনিষ্ঠ শুভ্র ভালবাসা। সুপ্রভা কি যৌনতার শিকার? নানান দুশ্চিন্তা মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। মতিবাবু অস্থির। তিনি চার দেওয়ালের বাইরে কতটুকু সুপ্রভার জন্য করতে পারবেন?

আজ বুধবার বিয়ের দিন। মেয়ে বাড়িতে নেই। পালিয়ে গেছে। একা একা। শুধুমাত্র প্রেমিকের কথা বিশ্বাস করে। বিমল ওর কানে হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কের ভেতর কী মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে! প্রেম তো শুভ্রতার প্রতীক। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কই হল পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম স্থায়ী সুসম্পর্ক। শ্রীমতী রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে ছুটে আসতেন যমুনার তীরে—সর্বস্ব ত্যাগ করে। উন্মাদিনীর পার্থিব জ্ঞান লোপ। ভগবৎ প্রেমে মন-প্রাণ-দেহ সমার্পিতা। কিন্তু গরিব সুপ্রভা রাধিকা হয় কেমন করে! বিমল কলির দূত। মতিবাবু ভেবে অবাক হচ্ছেন, কী করে একটি গ্রামের মেয়ে এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে পারল! প্রেমের কী অসীম শক্তি! এত উচ্ছ্বাস! প্রেমের জন্য—প্রেমিকের জন্য মেয়েরা এখনও অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে। কারণ সুপ্রভার বিশ্বাসে কোন খাদ ছিল না। তা ছিল খাঁটিসোনা। আবের্গ ও স্বপ্নে ভরা সুডৌল যৌবন। যে প্রেমের আহ্বানে জেগে উঠছে। শরীর মন প্রাণে শুধু যৌবনের ডাক। প্রচণ্ড বর্ষায় নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে।

থানার সংলগ্নে আরও একটা অফিস রুম আছে, গোয়েন্দা বিভাগ। এখানে সবাই অন্য রকম কথা বলে। কেউ কেউ মুখোশ পরে থাকে। মুখোশের আড়ালে আসল মানুষ। এই দেখলাম—এই সেই! বাবুলবাবু ও প্রদীপবাবু গোয়েন্দা পুলিশ। সিভিল ড্রেস। অপরাধ জগতের অনেক গোপনতথ্য, খবর এঁদের হাতের মুঠোয়। সুপ্রভাকে যখন ওদের সামনে আনা হলো তখন আর কোন কিছুই গোপন থাকল না। গোপন কথা গোপন না থাকলে দুঃখ হয়, কখনও লজ্জা। বাবুল মতিবাবুর কাছ থেকেই জেনেছেন—মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আজ ওর বিয়ে। প্রদীপবাবু একটু দূরে অন্য একজনের সঙ্গে কী যেন বলছেন। বাবুলবাবু সুপ্রভাকে একা পেয়ে কিছু প্রশ্ন করেন—

— তোমার প্রেমিক বিমলের সঙ্গে কত দিনের জানা শোনা?

— প্রায় দু'বছর।

—তোমাকে বিমল কী বলেছে?

—বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে। ও আমাকে বিয়ে করবে যে!

— কোথায় যাবে?

—আগরতলা, যোগেন্দ্রনগর মাসির বাড়ি।

—তোমার তো বয়স আঠার হয়নি, পালালে কেন? সুপ্রভা নিশ্চুপ। কোন উত্তর দিতে পারেনি। শুধু বলল—বিমল যে বলল।

—বিমল যে তোমাকে বিয়ে করবে—তার কী কোন প্রমাণ আছে?

—না, প্রমাণ নেই। আমি বিশ্বাস করি ও আমাকে ঠগাবে না।

—তোমার বিশ্বাসে আগুন লেগেছে। কোন কিছুই করতে পারবে না। নিজের বিপদ তুমি নিজেই ডেকে এনেছ। ফড়িঙেরা আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে। এ কলঙ্ক মোছবার নয়। তোমার তো সে রকম সাহস, অর্থ, জনমত কিছুই নেই। অভিভাবকরাও তোমাকে থুতু দেবে। তুমি কি কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

—আমার এখন কী করা উচিত? কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাবুলবাবু বেশ কিছুক্ষণ গভীর ভাবে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, তুমি সোজা বিমলের বাড়ি চলে যাও। ঘরে ঢুকে বলবে, আমার বিয়ে ভেঙে গেছে। আজই যেন তোমাকে বিয়ে করে। যদি বিমল তোমাকে সত্যই ভালবাসে, তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না। ভাসিয়ে দেবে না সমুদ্রে।

মতিবাবু একটি পুলিশী জীপে সুপ্রভাকে তুলে— সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বাড়িতে বিয়ের আয়োজন সব তছনছ হয়ে গেছে। মঙ্গলদীপ নিভে গেছে। সামনে পোঁতা কলাগাছ কেটে ফেলা হয়েছে। বিয়ে বাড়ি যেন শ্মশান। বরের পক্ষ থেকে মঙ্গলাচরণ করতে এসেছিলেন। তাঁরা ফিরে গেছেন। ওদের বিয়ের দিনই মঙ্গলাচরণ হয়। বাবা-মায়ের কী যে লজ্জা! গ্রামের লজ্জা। মেয়ের বাবা অরুণবাবু বারবার অনুরোধ করেছেন, বিয়ে যেন ভেঙে না দেয়। মেয়ে ফিরে আসবে। ওরা শোনেনি। শুনবেই বা কেন? পালিয়ে গেছে প্রেমিকের কথায়। তাঁরা গ্রামে ঢুকেই খবরটা পেয়েছিল। খবরটা তিনগুণ হয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করে। সকলে ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। সুপ্রভার ইঙ্গিতেই গাড়ি থামল। একদম বাড়ির সামনে। গ্রাম হলেও জীপ যাতায়াত করতে পারে। ওয়ানওয়ে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে সেগুন ও গামাই এর সারি। আম, জাম, কলা, লিচু কতই না গাছ-গাছালি চোখে পড়ছে। একটি বিলও নজরে পড়ে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই পুকুর আছে। ছোট আকারের। জলাশয় বা ডোবা বললেই বেশি মানাবে। চারদিকে সবুজ খেত। মাথা তুলে নাচছে ধান-কিশোরী। সুপ্রভাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। বোকামির জন্য বকছে। বিকেলের সুর্যের রঙে শরতের আগেই যেন প্রকৃতি রানি সেজে আছে। সাদা মেঘ পেঁজাতুলোর মতো ভেসে যাচ্ছে। মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়ছে সুপ্রভার প্রেমের খবর। ভেঙে যাওয়া বিয়ের খবর। বাঙালি মেয়েদের লগ্নভ্রষ্ট হলে কী হয়? সুপ্রভা কি আত্মহননের পথ বেছে নেবে?

গাড়ি থেকে নামতেই সুপ্রভা বাবার মুখোমুখি। বাবা রাগে কাঁপছেন! আগুন। কী করবেন—বুঝে উঠতে পারছেন না। চোখ লাল। পাগলের মতো। কাঁচাপাকা চুল উসখোখুসকো। চোখ কোটরে। একদিনেই ওর বাবাকে চেনা যাচ্ছে না। যেন অপরিচিত কেউ। কী যে হয়ে গেল! সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। বর যাত্রীরা আসবে না। সুপ্রভার জীবনে কি বর সেজে কেউ আসবে কোনদিন? বরপক্ষের অভিভাবকরা ছেলেকে লগ্নভ্রষ্ট হতে দেয়নি। দলবলে ঝটপট বিয়ে ঠিক করে—ছেলেকে বিয়ে করায়। বউ নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। সব ঠিক থাকলে সুপ্রভাই বউ হয়ে যেতো। ওঁরা সুপ্রভাকে বউ করতে মোটেই রাজি নয়। সুপ্রভা মাথা নিচু করে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কিছুই বলতে পারছে না। যে মেয়েকে এত আদর যত্ন করে মানুষ করেছেন, সে আজ এই কাজ করল! ভাবতে গিয়ে বুক ভেঙে যায়। বুকে পাথর চাপা পড়ে। সুপ্রভা ও অরুণবাবুর চোখে জলের ধারা। দুঃখের নদী। সেজন্য অবশ্যই সুপ্রভা দায়ী। বালিকা মন কি এতটা আঁচ করতে পেরেছিল? মা-বাবার কি কোন দায়িত্ব ছিল না? কনস্টেবলটি হাতে বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আপনার মেয়েকে দিয়ে গেলাম। এখানে একটা সই করে ওকে রিসিভ করুন। আশেপাশের কিছু মানুষও জড়ো হচ্ছে। সুপ্রভা ফিরে এসেছে শুনে অনেকেই দেখতে এল। কত অকথা-কুকথা যে শোনা গেল। ইয়াত্তা নেই। গুষ্ঠী উদ্ধার করছে! যে মানুষ মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পেত না—আজ সুযোগ বুঝে তারাই একচোট ঝেড়ে নিল। অরুণবাবুকে সবই হজম করতে হল। কেউ কেউ দেখেই নাক সিঁটকে দূরে সরে গেল।

—পাপীকে দেখিস না—শরীরে পাপ লাগবে। অসতী কোথাকার! পুলিশেরা দেরি করেনি। গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল।

অরুণবাবু কোনদিন মেয়েকে বকাঝকা করেননি। কিন্তু আজ অরুণ বাবুর অশান্ত মন মদ না খেয়েও মাতাল। রাগ দমন করতে চেষ্টা করেও পারেননি।

—তুই দূর হ, পোড়ামুখি। আমার সামনে থেকে দূর হ! তোকে কেটে টুকরো করে খোয়াইয়ে ভাসাইয়া দেমু। ইয়াল-কুত্তা খাইবনে। এমন মেয়ে থাকন থাইক্যা—না থাকন ভালা। তুই আমার মাইয়া না। আমি তোর বাপ না। তুই অন্য বেডার মাইয়া। তুই আমার সর্বস্ব ডুবাইলি। আঃ আঃ রে! এই কথা বলে অরুণবাবু হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। এই কান্না যে কী ভয়ঙ্কর, বীভৎস—তা চোখে না দেখলে বোঝা যেত না। অনেকে ভাবছে, হয়তো অরুণবাবু পাগল হয়ে গেছেন। কারণ অরুণবাবুর মুখে এমন অশ্লীল বক্তব্য আগে কেউ কোনদিন শুনেনি। শান্তশিষ্ট মানুষটি আজ সামুদ্রিক তুফান। অরুণবাবুর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মানদা ঘর থেকে বেরিয়েই সুপ্রভাকে দেখে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে! ঘিয়ে আগুন। মুখে যা আসে তাই বলতে লাগলেন। অশ্লীল গালিগালাজ করতে করতে সুপ্রভাকে মারতে লাগলেন। চড়-থাপ্পড়, চুলের মুঠি ধরে পেটাতে শুরু করলেন। সুপ্রভা মা'কে কোন বাঁধা দেয়নি। পিটুক। এক সময় পরিশ্রান্ত হয়ে পেটানো বন্ধ করে বলে,

— কেন এসেছিস এখন? আমার বাড়িতে ঢুকলে জানে মেরে ফেলব। ভাদ্র- মাইয়া কুত্তী। সুপ্রভা অবাক হয়ে ভাবে, এরা কি সত্যই ওর মা-বাবা? ধন্ধ লাগে। মানদা মুখ ঘুরিয়ে কাঁদে। গর্ভের সন্তান তো! কিছুক্ষণ পরে রাগ একটু কমলে বলেন, যা মরে যা। মান-সম্মান সব গেল!

কিন্তু সুপ্রভা আর দাঁড়ায় না। সোজা বিমলের বাড়িতে চলে যায়। বড় ঘরের সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে। ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করে। এ বাড়িতে আগেও সুপ্রভা কয়েকবার এসেছে। বাড়ির বড়রা প্রথমে এতটা গুরুত্ব দেয়নি। তবে বিমলের সঙ্গে সুপ্রভার ভাব চলছে—তা লোকমুখে কিছুটা শুনেছে। আজ ওর বিয়ের দিন ছিল। ভেঙে গেছে জীবন। এসব নিয়ে আজ ওরা মাথা ঘামাতে পারছে না। কারণ আজ বিমলের ছোটবোন মিনতির বিয়ে। মিনতি সুপ্রভার বান্ধবী। হয়তো মিনতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সুপ্রভা ঘরের কোণাতে একটা পিঁড়িতে বসে আছে। ডুকরে কাঁদছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আর একটু পরেই মিনতির বর আসবে। সানাই বাজছে। বিয়ে হবে। বিমলের ভাতিজি। দশ বছরের পুট্টি। ঘরে ঢুকেই সুপ্রভাকে দেখে বলে, ওমা! সুপ্রভা পিসি যে, তোমার নাকি বিয়ে! তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল! কখন এলে? মিনতি পিসির বিয়েতে কিন্তু তোমাকে থাকতেই হবে।

—অ থাকুম নে। আমারও বিয়ে হবে।

—তাহলে খুব মজা হবে। বাঃ তোমারও বিয়ে?

—পুট্টি, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

—কও, পারুম না কেন?

– তোমার বিমল কাকুকে একটু ডেকে দাও।

—ঠিক আছে। বাড়িতেই কাজ করছে। আমি এক্ষুনি এনে হাজির করে দেই। পুট্টি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমল সুপ্রভাকে দেখেই হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, একি! তুমি এখানে কেন? তোমার কী হয়েছে? বাড়ি যাও। কেউ দেখে ফেলবে।

—আমি যেতে আসিনি। তোমার কথা মতো কাজ করে বিপদে পড়েছি। তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে— কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাও। মিনতির বিয়ের সঙ্গেই তুমি আমাকে বিয়ে কর। আজই বিয়ে করতে চাই। মান সম্মান হারিয়ে বসে আছি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আশা করি এতে তোমার অমত হওয়ার কারণ নেই। আমরা তো অনেক আগেই...।

—আজ আমার বোনের বিয়ে। কোন ঝামেলা করো না। মিনতির বিয়ে হয়ে যাক। তারপর ভেবেচিন্তে দাদাকে বলে দিনক্ষণ স্থির করবো। এখন তুমি বাড়ি যাও।

—কিন্তু আমি তো চলে এসেছি। একেবারে চলে এসেছি। আর তো ফিরে যাব না।

—কী আবোলতাবোল বকছ? তোমার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্কের কোন প্রমাণ নেই। কেউ বিশ্বাস করবে না।

— প্রমাণই কী সব? তুমি কিআমাকে ভালবাস না?

— তোমার মতো মেয়েকে ভালবাসতে আমার বয়েই গেছে। দুনিয়াতে যেন আর মেয়ে নেই। তোমাকে নিয়ে খেলেছি। তুমি একটা পাগলি। আদেশের সুরেই বিমল বলে—তুমি [illegible] থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। জাহান্নামে যাও। নইলে...। এ কোন পাগলা বিমল! সুপ্রভা কাঁদে [illegible] ভালবাসে? মাথায় বজ্রাঘাত। ঘরে-বাইরে, বুকের ভেতর সর্বত্র ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

এ জীবনে কি আর ঝড় থামবে? সুপ্রভার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। কিন্তু তাকে তো উঠে দাঁড়াতেই হবে। এইভাবে যে কত সুপ্রভা অকালে ঝরে যায়—তার কি হিসাব কেউ রাখে.? সুপ্রভা উন্মাদের মতো চিৎকার-চেঁচামেচি করে বলছে, ইতর—বেইমান—আমাকে ঠগিয়েছো। আমার সর্বস্ব লুঠ করছো। আমাকে নষ্ট করেছো। ভালবাসার নামে আমাকে ভোগ করেছো। আমি মহিলা কমিশনে যাব। বিচার চাইব।

—তুমি আমার ঘোড়ার ডিম করবে। কচু করবে। বিমল বুড়ো আঙুল দেখায়।

— এই তাহলে তোমার আসল রূপ। আমি এখন কী করবো? হায়—ভগবান! আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোনপথ খোলা নেই। সুপ্রভার সামনেই কারেন্টের বোর্ড সুইচ ছিল। মুহূর্তে সুইচ অন করে একটি তার ছিঁড়ে অ্যালুমিনিয়ামের সাদা অংশে মুঠো করে ধরে। সঙ্গে সঙ্গেই তড়িতাহিত। আর্তনাদ করে গুমড়ে ওঠে। মৃত্যুর শেষ পর্যায়! একি! একি করছো? বিমল সুপ্রভাকে ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো বিপদ হবে। দক্ষতার সহিত মেইন সুইচ অফ করে দিল। সুপ্রভা একটু সময় গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। এ যাত্রা বেঁচে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেল। বিমল ভাবতে পারেনি সুপ্রভা এমন কাণ্ড করে বসবে। এ মুহূর্তে সুপ্রভা সবই করতে পারে। বাড়ির অন্যরা দৌড়ে এল। ঘটনা দেখে তাজ্জব। সুপ্রভা ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে। শক্ খেয়েছে মাত্র। সবার সামনেই বলতে লাগল—বিমল তুমি আমাকে বিয়ে করতে হবে। আজই। এই রাতে। তোমার আমার মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন আমি আর অন্য কাউকে ভালবাসতে পারব না। আমার মরে গেলেই ভাল হতো।

ইতিমধ্যে বিমলের বড় ভাই মৃদুল কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সব শুনে বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। আঁচ করতে পারলেন—কোথাকার জল কোথায় গড়াতে শুরু করেছে। এই মেয়েটির রক্ত মাংসে ঘূর্ণিঝড় বয়ে চলেছে। দাবানল সমগ্র বনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। একে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। মৃদুল একটু দৃঢ় সুরেই বলেন—ঠিক আছে সুপ্রভা, বিমল যদি তোমাকে ভালবেসে কথা দিয়েই থাকে, তবে তোমাকেই আমরা বিমলের বউ করে ঘরে তুলব। আমি আছি না? আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। আজ মিনতির বিয়ে। যদি উল্টাপাল্টা কিছু করে বস—তাহলে মিনতির বিয়েটা ভেঙে যাবে। তাতে তোমারও দুর্নাম হবে। আমাদের পরিবারের দুর্নাম হোক—নিশ্চয়ই তুমি চাও না। সুপ্রভার সহজ সরল মন। অনেকটা শান্ত হল। বিয়ে ভাঙলে যে কী দুর্দশা—কী যে সামাজিক বিপত্তি তা সুপ্রভা ভালই বুঝতে পেরেছে। হাড়ে হাড়ে আজ টের পেয়েছে। প্রেমের জ্বালা ভীষণ জ্বালা। প্রেম দেহ-মনকে এত পোড়ায় কেন?

—আমি আর বাড়ি যাব না, বড়দা। আমি বাপের ঘর ভেঙে এসেছি। মাথায় কলঙ্কের বোঝা। বিমলের এক কথায় আমি সব ছেড়েছি...। আমি সব তছনছ করেছি। আমি বিমলকে চাই। ও আমার প্রাণ। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। দয়া করে আজই আমাদের বিয়ে দিন।

—আজ তোমার বিয়ে হবে না। আজ মিনতির বিয়ে। পরে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে দেব। তুমি এখন বাড়ি যাও। তোমাকে আমাদের পছন্দ।

—না, আমি যাব না। যতদিন বিয়ে না হয়—ততদিন আমি এ বাড়িতেই থাকব। এ ঘর

থেকে বের হব না।

শেষে পুরাণ বাজারের টি এস আর ক্যাম্পের শরণাপন্ন হল। মৃদুল নিজের টি এস আর প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে আলাদা আলাপ করল। হয়তো গোপন বোঝাপড়া। সঙ্গে সঙ্গেই চারজন টি এস আর ও হাবিলদার বন্টিদা মৃদুলের বাড়িতে এল। ক্যাম্পের জোওয়ানরা তাকে বন্টিদা বলেই ডাকে। বন্টিদা সুপ্রভার বাপের বয়সী। হাবিলদারবাবু সুপ্রভাকে গোটাকতক প্রশ্ন করে সব বিষয়ে জেনে নেন। বন্টিদা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, সুপ্রভাকে আজ এ বাড়িতে রাখা উচিত হবে না। ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। জোওয়ানরা তাকে জোর করেও তাড়িয়ে দিতে পারে। বিমলের সঙ্গে বিয়েও ভেঙে যেতে পারে। তখন সুপ্রভা সব হারাবে। কিন্তু সুপ্রভা তার সিদ্ধান্তে অনড়। হয় বিয়ে—না হয় মৃত্যু। আত্মহত্যা করবে। সুপ্রভা মনে মনে আরও শক্ত হয়। থানার বাবুলবাবুর নির্দেশ মনে পড়ে। সুপ্রভা এত কথা বলতে পারে, আগে কেউ বুঝেনি। বন্টিদাকে প্রায় ধমকের সুরেই বলে, এটা কি মগের মুল্লুক যে বিয়ে করবে না? আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। ফিরে আসা সম্ভব নয়। বিমল ধোঁকা দেবে ভাবতে পারিনি! কই বিমলকে ডাকুন? ও আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কত কিছুই করেছে। ও আসুক।

বন্টিদা একটু ঘাবড়ে গেলেন। কী করবেন, বুঝতে পারছেন না। ইতিমধ্যে মৃদুল গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে নিয়ে এলেন। কিছু লোক জড়ো হয়েছে পুলিশ দেখে। ঘটনাটা কী জানতে। বিয়ে বাড়িতে পুলিশ! কৌতূহল। মৃদুল বন্টিদাকে বললেন, উত্তেজিত না হয়ে বুঝিয়ে বলতে যাতে সুপ্রভা বাড়িতে চলে যায়। বিমল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চিন্তিত। মিনতির বিয়েটা মানে মানে হয়ে যাক। তারপর বোঝাবে কত ধানে চাল। বিমল কিছু বলতে যাচ্ছিল। মৃদুল ইশারায় বাঁধা দেয়। সে সরে যায়। বিমলের বিধবা মা কুন্তলা এসে বললেন, সুপ্রভা মা, আমার। তোমার কথা সব শুনেছি। বিমল তোমাকে ঠগাবে না। আমরা তা হতে দেব না। তোমাকে বউ করে ঘরে তুলবই। তুমি কোন চিন্তা করো না, মা। তোমাদের ভালোবাসা অমর করে রাখব। তবে আজ নয় মা। পরে দিন তারিখ ঠিক করবো। আজ তোমার ননদের বিয়ে। এতে বাড়তি ঝামেলা করো না। আমি তোমাকে পাক্কা কথা দিলাম। বন্টিদাও কথায় সায় দিলেন, চল সুপ্রভা, তোমাকে বাড়িতে রেখে আসি। তোমার মা-বাবা কিচ্ছু বলবেন না। বরং তাঁরা খুশিই হবেন। তোমাকে এ বাড়ির বউমা করে নেবে। সুপ্রভা আর না বলতে পারেনি।

—মা বাবা আমাকে মারবে না তো? যদি তাড়িয়ে দেয়?.

—না দেবে না। ওদেরকে আমি চিনি। আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলব।

এ কথা বলে কুন্তলাদেবী সুপ্রভার মাথায় হাত রেখে আঁতকে ওঠে—একি! তোমার মা জ্বর এসেছে। শরীর ভীষণ গরম। অষুধ কিনতে হবে। নাও মা, এই কয়টি টাকা তোমার কাছে রেখে দাও। তোমার বাবাকে চিকিৎসার জন্য কিছু দিয়ে আসব। হাবিলদার বন্টিদা, মৃদুল এবং কুন্তলাদেবী সুপ্রভাকে নিয়ে অরুণবাবুর বাড়ি হাজির। কুন্তলাদেবী ডাকেন—অরুণ বেয়াই, বাড়ি আছেন নি?

—অরুণ বেয়াই? অরুণবাবু ঘরে মাথা গুঁজে বসেছিলেন। সুপ্রভার জীবন নিয়ে আকাশ

পাতাল ভাবছিলেন। ঘর থেকে বের হতে হতে বলেন, কেডা ডাকে? কেডা?

—আমরা।

—হু আপনারা কেন এসেছেন? অনেকটা বিরক্ত।

—না, অরুণভাই রাগ করবেন না। ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যই করেন। আপনার মেয়েকেই বিমলের বউ করে নেব। মাত্র কয়েকদিন পর। এখন আমার ভাবি বউমা আপনার বাড়িতেই থাকুক। অরুণ পুলিশ দেখে একটু কেমন হয়ে যায়। পুলিশের সম্মুখে মা-বাবার হাতে মেয়েকে সমঝিয়ে দিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন—মেয়েটাকে চিকিৎসা করান, জ্বরে গা জ্বলে যাচ্ছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপনাব মেয়েকে বউমা করে নেব। কোন চিন্তা করবেন না। অরুণবাবু কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে মন অস্থির। মুখে বকলেও চারদিক রি-রি করলেও অন্তর থেকে চাইছিলেন মেয়ে যেন ঘরেই থাকে। রাগের মাথায় যা তা বলেছেন। সন্তানকে তো তার ভুলের জন্য ত্যাগ করতে পারেন না! কোন মাতাপিতাই তা করতে পারেন না। মানদাই বকেছেন বেশি। একটু কড়া। যদি কোন কিছু করে বসে। মনে সর্বদা একটা ভয় কাজ করছে। গরিব হওয়াতে আরও বেশি অসহায় লাগছে। গরিবকে হাসিঠাট্টা করতে মানুষের বিবেকে বাঁধে না। তার ওপর মুখে চুনকালি। টাকাপয়সা থাকলে হয়তো অন্যত্র নিয়ে বিয়ে দেওয়া যেত। অরুণবাবু বিমলের পরিবারের প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করে।

মাস দুয়েক অতিক্রান্ত। বিমলের বাড়ি থেকে কোন সুসংবাদ আসে না। কুন্তলাদেবী কি তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছেন? অতি সত্বর বউমা করে নেবেন। বিয়ের মাস তো পার হয় হয়। অনেকগুলো তারিখ চলে গেছে। অরুণবাবু মেয়ের বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। একদিন সকালে মৃদুলের সঙ্গে অরুণবাবুর রাস্তায় দেখা। মৃদুল মুখ ঘুরিয়ে—না দেখার ভান করে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। অরুণবাবুর ডাকেই মৃদুলকে দাঁড়াতে হল।

— কি হে মৃদুল বাবাজি? কোন খবর তো কইল্যা না? কোন তারিখ-টারিখ ঠিক করছ নি, বাবা? আমি তো খুব চিন্তিত। ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে গেলে—শান্তি পাব। তোমার মাও তো কথা দিয়েছেন। মৃদুল মাথা চুলকিয়ে—ইতিউতি করে বলে, যাক না কিছু দিন। টাকাপয়সা জোগাড় করুন। কলঙ্কিত মেয়ে। টিভি, সোফা, বাইক এবং নগদ ক্যাশ লাগবে। এসব ব্যবস্থা হলে খবর দেবেন। অরুণ আকাশ থেকে পড়ল। একি বলছ, মৃদুল? এসব আমি কী করে জোগাড় করবো? আমার তো...।

— তাহলে কী করবেন? ঘরে বসে আঙুল চুষে দিন কাটান। মেয়েকে কুমারী রেখে দিন। অরুণের বুকে যেন শক্তিশেল বিঁধে গেল। কে যেন হৃদয়ে শাবল দিয়ে পিটাচ্ছে। সেদিন অরুণবাবু মৃদুলের সঙ্গে আর কথা বলতে পারেনি। বুকে মধ্যে কান্না উথলে উঠছে। সামনে শুধু অন্ধকার। ঝড়ো-সমুদ্র।

এমনি বিভ্রান্ত অবস্থায় একদিন সুপ্রভার স্কুলের প্রধানশিক্ষক ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে অরুণের দেখা। ইন্দ্রজিৎবাবু সব শুনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। মেয়েরা যে কেন এত বোকা ও

সরল হয়। তাদের মনে এত বিশ্বাস! মেয়েরা তো সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রভা যেন স্ববিরোধী দৃষ্টান্ত। তিনি আপশোস করে বললেন, কী আর করবেন? সুপ্রভাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিন। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন স্কুলে আসুক। ঘরে বসে থাকলে মন খারাপ থাকবে। আমরা ওকে সাহায্য করবো। তাছাড়া ওতো ভাল ছাত্রী। সামনে টেস্ট পরীক্ষা। মাধ্যমিক পাশ করলে হয়তো একটা চাকরিও পেয়ে যেতে পারে।

পরদিন থেকেই সুপ্রভা আবার বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে। মানুষে আকথা-কুকথা বলে। কানে আসে। সুপ্রভাকে সব হজম করতে হয়। সে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ভূগোল পরীক্ষার দিন সুপ্রভা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। দু'ঘন্টা মাত্র লিখেছিল। গা- বমি বমি...। কেমন যেন আচ্ছন্ন...। ইন্দ্রজিৎবাবু নিজের বাইকে করে সুপ্রভাকে বাড়ি পৌঁছে দেন। পরের দিন তিনি ওকে বাড়ি থেকে এনে পরীক্ষায় বসান। ঘটনাটা গ্রামের মানুষেরা ভাল চোখে দেখেনি। একজন কালো মতো তেচাইল্যা বয়সের লোক ইন্দ্রজিৎবাবুকে মুচকি হেসে বলেন, স্যার, অখন থাইক্যা কি আপনিই ওকে নিয়ে আসা-যাওয়া করবেন? কথাটার মধ্যে সুপ্রভা সম্পর্কে ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতুক ও কটূক্তি ছিল। বাঁকা কথার শ্লেষ ছিল। রাগে ইন্দ্রজিৎবাবু কিছু বলতে পারেননি। শুধু 'হু' বলে চলে এসেছিলেন। পেছনে অনেকেরই অট্টহাসি শুনতে পেয়েছিলেন। লোকে আঙুল তুলে বলে, ঐ যে নষ্টা মেয়েটা যায়! মানুষেরা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। শুধু কি মেয়ে বলেই? কই বিমলকে তো কেউ নষ্ট পুরুষ বলে না? লম্পট চরিত্রহীন প্রতারক বলে না? সে দিব্যি আরামে খায় দায়, ঘুরে বেড়ায়। বাঁশি বাজায়। মেয়েদের সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির কবে পরিবর্তন হবে?

সুপ্রভা বিমলকে খবর পাঠায়। বাড়িতে যেন দেখা করে। বিমল পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় সুপ্রভাদের বাড়ি আসে। ভয়ে ভয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাড়িতে লোকজন নাই নাকি?

--সুপ্রভা ঘরে আছো? আছনি তুমি?

—অ-দরজাটা ভেজানোই আছে। ভিতরে এস। কারেন্ট নেই। হারিকেন জ্বালিয়েছি। এস, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা। কবে তুমি আমাকে ...?

—আ-রে কী যে বল, সুপ্রভা। মা দাদা তো কথা দিয়েই রেখেছেন। যে কোন দিন...।

— কিন্তু তোমার দাদা তো যৌতুক চায়। ক্যাশ টাকা চায়। বাবা তো এসব দিতে পারবে না। আমাদের কী হবে? সুপ্রভার চোখে জল টলমল করে।

ওসব তুমি ভেবো না। আমি সব ঠিক করে দেব। একটা পয়সাও তোমাদের লাগবে না। তোমার মা-বাবা যা পারে-তা দিয়েই অনুষ্ঠান হবে। আমাদের মিলনই হলো আসল কথা। তোমাকে ইহজীবনে পরজীবনে ছাড়ছি না গো, সুপ্রভা সুন্দরী। সুপ্রভা একটু লজ্জা পায়। চোখ নামিয়ে বলে--যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না! কবে যে মুক্তি পাব! আলো দেখব। বুঝতে পারছি না।

--বাড়ির অন্যরা কোথায়? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

—বাড়িতে আর কেউ নেই। বাবা মোহবছড়া বাজারে সবজি বেচতে গেছে। দেরি

হবে। মা আর ছোটবোন পাশের বাড়িতে কল্কিনারায়ণ পুজোতে গেছে।

বিমল সুপ্রভার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে বলে, অনেকদিন পর তোমার কাছে এলাম। ফিরিয়ে দেবে? অন্তত তোমার সোনালি গালে একটা চুমু খেয়ে যাই।

—না, তা হবে না। এখন সরে যাও।

—না বললে তো হবে না। দু'দিন পরেই তো তোমাকে...।

— তখন সবই হবে। শুধু চুম্বন নয়। সব কিছুই তোমার।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিমল সুপ্রভাকে জড়িয়ে ধরে। চুমু খেতে থাকে। সুপ্রভা আটকাতে পারেনি। এক সময় সুপ্রভা আত্মসমর্পণ করে।

—তুমি একি করলে আমাকে? কেন তুমি আমার সঙ্গে এসব করলে? বিমল পোশাক পড়ে হাসতে হাসতে বলে—এসব তো আমরা আগেও কয়েকবার করেছি। কই, কিছু হয়নি তো? কোন ভয় নেই। একমাসের মধ্যেই তোমাকে বিয়ে করছি। এটা আমার ফাইনাল কথা। এখন চলি কেউ দেখে ফেলবে। সুপ্রভা কিছু বলতে পারেনি। বিমল চলে যায়।

আড়াই মাস হলো। বিমলের খোঁজ নেই। বাড়িতে খবর নিয়ে জানা গেছে—বিমল বাড়ি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ বলে বাংলাদেশ, কেউ বলে আসাম। বিমল এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবে সুপ্রভা ভাবতে পারেনি। বিমলের ভাই ও মা'কে জিগ্যেস করলে বলেন, ছেলেই বাড়িতে নেই—আমরা কী করবো? কাকে বিয়ে করাব? বিমল বাড়ি আসুক। তারপর ভেবে দেখব। এদিকে চিন্তা করতে করতে অরুণবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। খাওয়ায় রুচি নেই। দুর্বল, মাথা চক্কর মারে। একদিন ভীষণ অসুস্থ হলে অরুণবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। টাকার অভাবে ঠিক মতো চিকিৎসা হয় না। ওষুধপত্র কিনতে পারে না। অবস্থায় অবনতি হয়। সুপ্রভার মা আগের চেয়ে আরও খিটখিটে-মেজাজে হয়ে গেছেন। উঠতে বসতে অশ্লীল গালিগালাজ। সুপ্রভা পাথরের মতো।

কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই। যেন সর্বস্ব লুণ্ঠিত। হয়তো মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। ইতিমধ্যে আরও একটা নতুন বিপদ দেখা দিল। দুমাস হয়ে গেল—সুপ্রভা পিরিয়ড মিস করতে থাকে। সকালে বমি বমি ভাব। কেন এমন হলো সুপ্রভা ভাল করেই জানে। ওর কাছে স্টাইপেণ্ডের পাঁচশ টাকা ছিল। তা থেকে বাবাকে কিছু ওষুধ ও পথ্য কিনে দেয়। সুপ্রভা দেড়শ টাকা দিয়ে প্রেগন্যান্সি টেস্ট করায়। কুমারী মেয়ের প্রেগন্যান্সি টেস্ট! পরের দিন সকালে রিপোর্টে পেয়েছে। প্রেগন্যান্সি-পজিটিভ। সুপ্রভা অন্তঃসত্ত্বা। সামনে শুধু অন্ধকার। সুনামির স্রোতে যেন ভেসে যাচ্ছে সব। ল্যাবরেটরির মেয়েটা মুচকি হেসে বলেছিল, এসব কিছুই নয়। এখানে অ্যাবোর্শনের সুব্যবস্থা আছে। সব কিছু গোপন থাকে। সুপ্রভা কী করবে? কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সে কি আর ফিরে আসবে? সুপ্রভার জী[illegible]ক [illegible]বয়ে হবে? কুমারী হয়ে কি বাচ্চার জন্ম দেবে? সুপ্রভার শরীরে শুধু বিয়ের বাতাস লেগেছিল। সে বাতাসে জীবন যেন ঝড়োশিস।

ডাকপিয়ন

এটা কৃষ্ণপুর গ্রামের পুরানো ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস। এলাকায় ছয়-সাত হাজার লোকের বসবাস। শচীন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে ভাড়া করা ঘর। মাসিক দু'শত টাকা ভাড়া। ছন বাঁশের ছাউনি। মাডওয়াল। নতুন বাজার সংলগ্ন। পোষ্ট অফিসের পাশেই শচীন্দ্রের দোকান। চা-পান বিড়ি বেচে। শুধু দোকানে সংসার চলে না। অবসর সময়ে চালায়। সন্ধ্যার পর ধনীর দুলাল দিলীপেরা আসে। দিলীপ কলেজে পড়ে। সব সময় স্টাইল করে চলে। ওরা চায়ের অর্ডার দেয়। সঙ্গে চানাচুর মুড়ি। কোন সময় বিলিতি খায়। তখন শচীন্দ্রদারও দু'এক পেগ গলায় ঢোকে। খেয়ে তৃপ্তিব হাসি হাসে। দিলীপ ও তাব সঙ্গোপাঙ্গবা মজা পায়। স্ফূর্তি করে। মুচকি হাসে। নেশায আয়েশ করে। শচীনদা বিনয়ে পেদা পেদা। শচীনদা পোষ্ট অফিসের রানার। ও প্রতিদিন তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশন্যাল পোষ্ট অফিসে একটি ডাকব্যাগ নিয়ে যায় ও অন্য একটি নিয়ে আসে। শচীন্দ্র এসব কাজ কবে খুবই মজা পায়। কখনও ক্লান্তি অনুভব করে না। বাই সাইকেলে আসা যাওযা করে। ডাকব্যাগ নিয়ে আসতে তিনটে-চাবটে বেজে যায়। সেদিন আর ব্যাগ খুলে না। পরের দিন দশটা অফিস খুললে, তখনই ডাক ব্যাগ খুলে। চিঠিপত্র পার্সেল অন্যান্য কাগজপত্র আলাদা করে। চিঠিপত্র বিলি করে। পার্সেল খুব একটা আসে না। মাঝে মাঝে সবকারি চিঠিপত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে, তহশিল অফিসে এবং প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে আসে। সেগুলো যথাসময়ে যোগেশ বিলি করে। কোন লেইট হয় না। চিঠিপত্র সঠিক স্থানে পৌঁছে দেওয়া তাব গুরুদায়িত্ব। কারও যদি ইন্টারভিউ বা চাকরির অফার আসে তা বিলি করে যোগেশের যে কী আনন্দ! সারাটা মুখে হাসি লেগেই থাকে। গর্বে বুকটা ভরে যায়। পঁচিশ বছরেব পুবানো বাই সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ অনেকেরই চেনা হযে গেছে। সাইকেলের শব্দ শুনে— না দেখেই বলে দিতে পাবে—ঐ ডাকপিযন যোগেশ আসে। যোগেশও সাইকেল চালাতে চালাতে মানুষকে ডেকে বলে, কাকা কেমন আছেন? জেঠা কেমন আছেন? ছোটদের নাম ধরে ডাকে। ছোটবড সবাই তাকে চেনে, ভালবাসে। তার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কোন অহংকার নেই। সাদামাটা সবল মানুষ। বয়স ছেচল্লিশে পডল। বিযে করেনি। মা-বাপ গত হয়েছেন অনেক আগেই। তখন যোগেশের বযস নয়- দশ বছর। দূব সম্পর্কের এক বিধবা মাসি তাকে লালনপালন করে। তিন বছর হলো মাসিও তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। যোগেশের আর কেউ রইল না। রইল শুধু চিঠি বিলি করা। চিঠি বিলিকে সে চাকুরি মনে করে না। এটা তার নেশা। একমাত্র বাঁচার অবলম্বন। যেদিন কোন চিঠি আসে না—সেদিন যোগেশের সারাটা দিন কষ্টে কাটে। মনমরা হয়ে বারান্দায় বসে থাকে। ঘোরাঘুরি করতে না পারায় সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করে। লোকে চিঠি না লিখলে যোগেশ তার কী করতে পারে!

মাঝে মাঝে যোগেশ সীমাদের বাড়িতে যায়। চিঠি আসলে যায়, না আসলেও যায়। সে বলে, সীমা তোমার চিঠি আছে। চিঠি দিতে দেরি করে না। খুব ব্যস্ততা। অনেক কাজ যেন।

আরও চিঠি বিলি করতে হবে। সময় কম। কাজটা যোগেশ সাংঘাতিক সিরিয়াস মনে করে। যদি কারও ইন্টারভিউ লেটার দেরি হয়ে যায়! তাহলে সর্বনাশ। সমস্ত দায়দায়িত্ব যোগেশেরই। আবার মনটা খারাপ থাকলেও সীমাদের বাড়িতে যায়। যোগেশ রাস্তা থেকেই ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢোকে, সীমা বাড়ি আছো? আরে-ও সীমা, কী যে হলো, কোন সাড়াশব্দ নেই! কিছুক্ষণ পরে সীমা ঘর থেকে বেরিয়েই বলে, কী হলো যোগেশদা? তুমি এতো ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? সীমা মুখ টিপে হাসে। কারণ যোগেশ শার্টটা উল্টো করে পরে আছে। সীমা বলে না। বুঝতে পেরে যোগেশ লজ্জিত হয়। আমতা আমতা করে বলে, খেয়াল করিনি। তোমার চিঠি আছে। এই নাও। ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে চিঠি খুঁজে পায় না। পকেটে হাতড়ায়, চিঠি পায় না।

—না,সীমা তোমার চিঠি পেলাম না। মনে হচ্ছিল তোমার চিঠি আছে। এখন দেখি নাই! তাহলে যাই—শার্টটা ঠিক করে ফেলি। আজ অনেক চিঠি বিলি করতে হবে। সাইকেলে বেল বাজিয়ে চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে সীমা ডাকে, দাঁড়াও যোগেশদা, চিঠি না দিয়ে যেতে পারবে না! এতক্ষণ তো খুব হৈ-চৈ করছিলে! যোগেশের হাসিমুখ বেজার হয়ে যায়। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, আসলে তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলে মনটা আনচান করছিল। এজন্যই বোধ হয়...। হাত দিয়ে মাথা চুলকায়। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। কেউ কথা বলেনি। তারপর সীমাই বলে, আইঅ, ঘরে আহঅ যোগেশদা। তোমার জন্য পিঠা বানাইছি। নতুন চালের চিতল পিঠা। তোমার পছন্দ। খাইয়া যাও! যোগেশের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়। দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে ঘরে ঢোকে।

যোগেশ পিঠা খেতে খেতে বলে, তোমার চিঠি আসলে লাভ, না আসলেও লাভ। খাওন ঠিক আছে। বাঃ স্বাদ তো অপূর্ব। আসলে আজ তোমার কোন চিঠিই আসেনি। কিসের টানে যে এসে পড়ি। ঠিক জানি না। বুঝতে পারি না। তোমাকে দেখলেই...।

—বুইঝ্যা আর কাম নাই। সময় পেলেই তুমি আমাদের বাড়িতে আইও। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে বলবে, চিঠি আছে। দিতে এসেছি। তাছাড়া তুমি তো আমাদের বাড়িতে নতুন আসছ না। সেই ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখছি। সে সময় আমাকে তুমি কত খেলা শেখাতে। তুমি বড় হয়েও ছোটদের সঙ্গে খেলতে। খেলাতে আমার জিত হলে আনন্দ পেতে সবচেয়ে বেশি। আর একটা পিঠা দিই? খাইয়া জল খাও।

—আমার তো তিনকুলে কেউ নেই। আমি একাই। একটা ছন্নছাড়া সংসার। মনটা যেদিন উথালপাতাল করে সেদিন তোমাদের বাড়ি চলে আসি। তোমার সঙ্গে দুইডা কথা কইলে মনটা একটু জুড়ায়। হাল্কা হয়। দুঃখ কমে। তোমার মা-বাবাও আমাকে খুব আদর করেন। ওরা আমার হারানো মা-বাবা যেন। কাকা-কাকি খুব ভাল মানুষ। তোমাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। অথচ তোমরাই আমার আপনজন।

—অত কথা কইতে হইব না। বিকালে আইঅ। নদীর ধারে বেড়াইতে যামু। পুলের ওপর বইয়্যা গল্প করুম। হাঁটুমনে।

—ঠিক আছে। আমুনে-আমুনে। অহন যাই। কয়েকটা চিঠি বিলাইতে হবে। আসলে চিঠি

না থাকলেও অনেক সময় যোগেশ বলে চিঠি বিলাইতে হবে, হয়তো মুদ্রাদোষ।

যোগেশ ঢক ঢক করে ঘটি থেকে জল খায়। সাইকেলে বেল বাজিয়ে চলে যায়। সীমা ওর পেছনের দিকে চেয়ে থাকে। যাওয়া দেখে। স্বপ্নের মধ্যে হেসে ওঠে।

গ্রামের সরু রাস্তা পেরিয়ে বড় পাকা রাস্তায় উঠছে। সাইকেলে বসে যোগেশ গুন গুন করে গান ধরে—

'এই দুনিয়াতে আপন কারো আপন হয় না
পর হয়ে যায় আপন
জীবন তরীর লক্ষ্য ঠিক না থাকলে
কারো কিছু হয় না
এই দুনিয়াতে...।

এটাই গ্রামের একমাত্র পাকা রাস্তা। শাখাপ্রশাখা রাস্তাও অনেক আছে। ইটসলিং। এ পথে গাড়ি ঘোড়া নিয়মিত চলে। খুশিমতো শহরে আসা যাওয়া করা যায়। বিপরীত দিক থেকে সন্তোষ বাইক চালিয়ে আসে। পেছনে সহদেব বসে আছে। এরা গ্রামের উঠতি যুবক। কে পি ক্লাবের সক্রিয় সদস্য। সন্তোষ নবনিযুক্ত ক্লাব সেক্রেটারি। কলেজে বি এ ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। গ্রাম্য রাজনীতি করে। অতি উৎসাহে সমাজসেবা করে। স্থানীয় নেতা দেবজিৎবাবুর নির্দেশে ওরা চলে। ওঠবস চেলা। ওনার কথাতেই অন্যের ঘরে আগুন পর্যন্ত লাগাতে পারে। পঞ্চায়েতে বেগার কাম করায়। কামায় ভাল। গ্রাম্য রাজনীতি অনেকটা মাফিয়া টাইপের সংমিশ্রণ। নেতারা আবোল তাবোল বলে। গরিবেরা বি পি এল কার্ড পায় না। অন্নপূর্ণা স্কিমের আওতায় আসে না। স্বচ্ছল পরিবারেরা এসব ভোগ করে। রাঘববোয়াল! গ্রাম্য রাজনীতি সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে—গ্রামকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষিত ও ভাল মানুষেরা এখন রাজনীতিতে আসে না কেন? ইমানদার মানুষের বড়ো প্রয়োজন। তবেই দেশের মঙ্গল। তা না হলে সমাজকে নষ্টামির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দলবাজি ও ঘৃণ্য রাজনীতি সমাজকে অবনতি ও সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অশিক্ষিত মানুষেরা বুঝতে পারে না। ভাগ্যের দোষ দেয়। বেগার খেটে মরে সারাজীবন। মাফিয়া নেতারা মজা লোটে।

যোগেশকে দেখেই ওরা বাইক থামিয়ে সাইড করে রাখে। সন্তোষ সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে হাওয়ায়।

—এই যোগেশদা, সাইকেলটা একটু থামাও তো। এদিকে আস। তোমার সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সন্তোষের ডাকটা নির্দেশের মতো শোনায়। যোগেশ ওদের ডাকে কাছে এসে বলে, কী বলবে বল? আমার তাড়া আছে। চিঠি বিলি করতে হবে। আমার তো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, ভাই। হঠাৎ সহদেব যোগেশের ঝোলাব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দেয়। খাকিশার্টের পকেটে পরখ করে দেখে—একটাও চিঠি নেই। রাগতস্বরেই সহদেব বলে—কোথা থেকে তুমি চিঠি বিলি করবে? একটাও তো চিঠি নেই। তুমি কাকে কী দেবে? পাগল কোথাকার! বান্‌ছুত! যোগেশ চিঠির কথা বলে ওদেরকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সন্তোষ আরও কৌতুক করে

বলে, ও পাগল নয়-রে সহদেব। ও একটা বনটুলা—ইতরের ছানা। যাগ্‌গে যে কথাটার জন্য তোমাকে দাঁড়া করিয়েছি। আমরা তো এ গ্রামেরই ছেলে, ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তো আমাদেরও আছে। তাই না—যোগেশদা?

— অ-তা- তো আছেই। তোমরা গ্রামের ছেলে। শিক্ষিত হইছ - লেখাপড়া শিখছ। দায়িত্ব তো থাকবেই। তোমরা গ্রামের ভাল না দেখলে—কে দেখবে? কিন্তু আমাকে হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? সন্তোষ যতটা সম্ভব সিরিয়াসও গম্ভীর হয়েই বলে, তুমি সীমাদের বাড়িতে এত আসা-যাওয়া কর কেন? এটা কি ভাল দেখায়? লোকে তো যা-তা বলে। চিঠির আছিলায় ঘন ঘন যাও, হাসাহাসি কর, গল্প কর। যোগেশ একটু অবাক হয়েই বলে, তাতে কী হয়েছে? আমি তো ওদের বাড়িতে আজ নতুন যাই না। তোমরাও জান। কবে সেই ছোটবেলা থেকেই ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করি। মাঝে মাঝে ভাতও খাই। কই কেউ তো কোনদিন এমন সন্দেহের কথা বলেনি! এ ব্যাপারে কেউ তো প্রশ্ন তোলেনি! আজই কেন হঠাৎ...!

—হঠাৎ নয় যোগেশদা—হঠাৎ নয়। ব্যাপারটা আমরা কয়েক মাস ধরেই লক্ষ করছি। চিঠির নাম করে তুমি সীমাদের বাড়িতে ঘন ঘন যাও। একান্তে ভালো মানুষ সেজে সীমার সঙ্গে কথা কও।

—অ-যাই তো। কথাও কই। কিন্তু এতে দোষের কী দেখলে? সীমা আমার ছোটবোনের মতো। ওর সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্কের কথা ভাবি নাই। ছোটবেলা থেকেই ওকে নিয়ে কোলে পিঠে করে খেলেছি। আমাকে দাদার মতোই দেখে। ভাইবোনের ভালবাসাকে তোমরা অপবিত্র করছো কেন?

—আয় রে আমার অতিকইল্যা বইন! বইন ডাইক্যা পীড়িত কর। কয় দিন পরে মাগি বানাইবা। খামচাইয়া খাইবা। আলার পুতের কথা শোন! সন্তোষ আরও একটা সিগারেট ধরায়। যোগেশের ঘ্যানর ঘ্যানর কথাবার্তা শুনে সহদেব উত্তেজিত হয়।

— দেখ যোগেশদা, তোমার বয়স আর সীমার বয়সের অনেক পার্থক্য। এ বয়সে প্রেম পীড়িত মানায় না। বয়স তো পাইক্যা বুট-বুটইট্যা হইছ। মেয়ে মানষের প্রতি তো আকর্ষণ কমেনি। ডুইব্যা ডুইব্যা জল খাও। অন্য মেয়ে বা বিধবা দেখে শাদি করলেই পার। চাঁদের দিকে হাত বাড়াইও না। যদি আর কোনদিন সীমাদের বাড়ি যাও, বিপদ হবে। যদি বাড়ির আশেপাশেও দেখি—তবে ঠ্যাংডি ভাইঙ্গা গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দেবো। পীড়িতি শিখাইয়া দেমু। অতএব সাধু সাবধান! সন্তোষ চোখ লাল করে বলে,' মনে রাখিস্ বানছুতির পুত্। অহন কি আর চিঠির যুগ আছে রে? অহন হলো মোবাইল—ফ্যাক্সের যুগ। তোর চিঠি এখন ডাস্টবিনে রে—ব্যাটনা মাগির ছাউ। যা, ভাগ্—এখন থেকে...।

নেশা করেছে নাকি। অশ্লীল গালিগালাজ! যোগেশ বিস্ময়ে হতবাক ও মর্মাহত হয়। যোগেশ যখন নবম শ্রেণিতে পড়ত তখন ওদের জন্ম। কত আদর করতো ওদের। একই গ্রামের ছেলে। আম, কুল, আমলকি কুঁড়িয়ে দিত। যোগেশের পেছনে পেছনে ঘুরত। অথচ ওরাই আজ তার সঙ্গে কী ব্যবহারটাই না করল। যোগেশ নবম শ্রেণিতে ফেল করার পর আর

পড়েনি। অবশ্য পড়াশোনার সুযোগও ছিল না। সবই কপাল। ওরা শিক্ষিত। আর যোগেশ অষ্টম মান উত্তীর্ণ। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। আনমনে সাইকেল চালাতে থাকে। পথে কমলের সঙ্গে দেখা।

—আরে যোগেশদা যে, কোথায় যাচ্ছ সাইকেল চালিয়ে? সাইকেলটা বদলাও। চল্লিশ বছরের পুরানো। কবে তুমি এটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হিসাবে কিনেছিলে? হয়তো তোমারই মনে নেই। চল, ফুটবল খেলা দেখে আসি। খুব মজা। একটু পরেই স্কুল মাঠে খেলা আরম্ভ হবে।

—না রে কমল, তুই যা। চিঠি আছে, বিলি করতে হবে। পোস্ট অফিসে যামু। ডাক আইছে কিনা খোঁজ নিয়ে আই। খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে আমি ডাকব্যাগ দেখলেই বুঝতে পারি। নাকে গন্ধ লাগে। যা তুই যা। পোলাপান মানুষ খেলাধূলা কর গিয়ে। কমল যোগেশের অনেক ছোট। সময় মতো বিয়ে করলে হয়তো কমলের মতো ছেলেও থাকত। কিন্তু যা হবার নয় তা তো ভাবলে চলে না। লোকে পাগল বলবে।

—তুমি একটা আজব মানুষ যোগেশ দা। চিঠি চিঠি করে পাগল হয়ে গেলে। চিঠিই তোমার সব, ধর্ম-কর্ম। বাস্তব সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই। অহন কি আর চিঠির যুগ আছে? মোবাইল-এস এম এস, ফ্যাক্স আরও কত কী। আর তুমি আছ...। এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

-- নারে কমল, এমন বলিস না। মনে বড়ো ব্যথা লাগে। আসলে প্রতিদিন গ্রামটাকে ঘুরতে বেশ মজা লাগে। রাত পোহালেই মেঠো পথগুলো আমায় ডাকে। ঘরে থাকতে পারি না। কারও চিঠি আসুক বা না আসুক—সমগ্র গ্রামটা একবাব চক্কর মারতেই হয়। নইলে...। কমল হবাক হয। বুঝতে পারে না।

— তোমারে বোধ হয় জিনে ধরছে। নইলে এমন কথা কও কেমনে? বর্তমানে চিঠির যুগ শেষ। আজ আর কেউ চিঠি লেখে নাকি? চিঠি লেখালেখি মানুষ একদম ভুলে গেছে। মানুষের জীবনে এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তুমি ডাকপিয়নের চাকরি ছেড়ে অন্য কাজ কর। এটা তো তোমার পার্মানেন্ট চাকুরি নয়। মাত্র বারোশ টাকা পাও। তা দিয়ে তো একজন মানুষেরও চলে না। যোগেশ কোন কথা কয় না। সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যায়। ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে ঢোকে। পোস্ট অফিস, চিঠি বিলি যেন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এসব কাজ করতে এত ভাল লাগে কেন?

পোস্টমাস্টার অবিনাশবাবু সবে মাত্র অফিস খুলে চেয়ারে বসেছেন। যোগেশ অফিসে ঢুকেই বলে, স্যার ডাকব্যাগ কি খুলেছেন?

—অ—খুলেছি। না, চিঠিপত্র একটাও আসেনি। শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট বি. ও. স্লিপ এসেছে।

—ভাল কইর‍্যা দেখছেন তো, স্যার? চিঠি কি একটাও নাই?

—না, নাই তো। তাতে তোমার কী? চিঠি না আসলে তো ঘোরাঘুরি কমে যায়। আরাম করে বসে থাকতে পার।

যোগেশ যেন কেমন হয়ে যায়। মলিনমুখে গালে হাত দিয়ে টুলে বসে থাকে। হয়তো কিছুই নয়। অবিনাশবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি মুচকি হেসে যোগেশকে কাছে

আসতে বলেন। যোগেশ অবিনাশবাবুর সামনে ধপাস করে বসে পড়ল। এমন সময় অবিনাশবাবুর মোবাইলটা বেজে ওঠে। হ্যালো, সহিষ্ণু—কী খবর? সব ভালো তো? পড়াশোনা কেমন চলছে? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি তিন হাজার টাকা পাঠিয়ে দেব। কোন চিন্তা করিস না, রাখি। মোবাইলটা রেখে বলেন— আমার ছেলে সহিষ্ণুর ফোন। টাকা পাঠাতে বলছে। বই কিনবে। আরও কী যেন প্রয়োজন। থার্ড ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং। দেরাদুন কলেজ।

তারপর তোমাকে যে কথাটা বলছিলাম, এই ডাকপিয়নের কাজটা তুমি ছেড়ে দাও। এখানে কোন কাম নাই। চিঠিপত্র আসে না। সরকারি চিঠিপত্র গ্রামে আসে না। অফিসের কাজ মোবাইলে ফ্যাক্সে সেরে নেয়। সদর পোস্টঅফিসে বিশেষ কোন কাজ থাকলে আমার মোবাইল নম্বরে ডায়াল করে জেনে নেন। কাগজপত্র লেখেন না। দিন পাল্টে গেছে হে। যোগেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অবিনাশবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে এবং বলে—আমি তো স্যার অন্য কোন কাম জানি না। কী কাম করুম? আমারে কেডা দিব?

— কেন? ব্যবসা কর। ছোটখাটো মুদির দোকানও দিতে পার। নতুবা পোলট্রি ফার্ম কর। গরু-ছাগল পাল। এদের ঘাস জল খাওয়াতেই সারাদিন কেটে যাবে। আয়ও হবে। আমি যা বললাম, ভেবে দেখতে পার। আজ কোন কাজ নেই। বাড়ি যাও।

যোগেশ অবাক। আজ একটাও চিঠি আসেনি। সদর পোস্টঅফিসে একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়? নাকি তারা ভুলে ব্যাগে চিঠি দেয়নি। হয়তো চিঠি ছিল! মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়— আগামীকাল একবার সদর পোস্টঅফিসে ঘুরে আসবে। আট-দশ বছর আগেও কত চিঠি আসত। যোগেশ সারাদিন ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করতো। কত আনন্দ হতো। কত মানুষ তাকে আদর যত্ন করে বসাতো। কত কিছু খাওয়াতো। কারও চিঠি পড়ে শোনাত। কত সম্মান ছিল তার। সে সব দিনের কথা মনে হলে...। যোগেশ ডাকঘর থেকে বের হয়ে সাইকেল নিয়ে বেল না বাজিয়ে চলতে থাকে। বেজার মুখ। মনে সাংঘাতিক ব্যথা। কী যেন কষ্ট অনুভব করে।

বিকেলে সীমাদের বাড়িতে যায়। যোগেশকে দেখেই সীমা বলে—কী যোগেশদা, এত তাড়াতাড়ি চলে আইছ? আমি তো বলছিলাম রোদটা একটু পড়লে আইঅ। আর তুমি...। বলেই সীমা হাসতে থাকে। যোগেশ হাসে। মনটা মুহূর্তে ভাল হয়ে যায়। সীমার সঙ্গে কথা বললেই যোগেশের মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আলো ঝলমল করে ওঠে। কিভাবে যে মন ভাল হয়ে যায়, যোগেশ বোঝে না।

—তুমি তো কইছল্যা—নদীর ধারে বেড়াইতা যাইবা। পুলে বইয়্যা গল্প করবা। এর লাইগ্যা একটু তাড়াতাড়ি আইছি।

—ঠিক আছে চল।

সীমা যোগেশের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। একটু হাঁটাহাঁটি গল্প-টল্প করে। তারপর পুলের রেলিঙে বসে দুনিয়ার আজেবাজে কথা। আড্ডা জমায়। ছোটবেলার কথা বলে। সন্ধ্যা হলে সীমাকে বাড়িতে দিয়ে যোগেশ চলে যায়। নিজের ঘরে। এটা কিন্তু নতুন ঘটনা নয়। সীমা যখন অনেক ছোট একদম দুধের শিশু ছিল—তখন থেকেই যোগেশ সীমাকে নিয়ে বেড়াত। সীমা বড়ো

হলেও সে অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারেনি। সাধারণ নিত্য ঘটনা। এসব বিষয় নিয়ে কেউ কোনদিন প্রশ্ন তোলেনি। কেউ সন্দেহের চোখেও দেখেনি। গ্রামের মানুষ সীমা যোগেশের মেলামেশা, ঘোরাঘুরিকে মন্দচোখে দেখেনি। পবিত্র-নির্মল সম্পর্ক হিসাবে দেখছে। অন্যচিন্তা কারও মনেই আসেনি। এটা কী ভালবাসার লক্ষণ? যোগেশ বুঝ'তে পারে না। সীমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না।

সেদিন সীমাও যোগেশ পুলের রেলিঙে বসে গল্প করছে। হাসি-তামাশার কত কথাই না বলছে। ওরা দু 'জনেই যেন দুইশ'। এক সময় সীমা বলে যোগেশদা, তুমি ডাকপিয়নের চাকরি ছেড়ে দাও। এতে তোমার পোষাবে না। ভবিষ্যতে তো একা থাকবে না। চিঠিপত্র আসবে না। কেউ কাউকে চিঠিও লিখবে না। এখন মোবাইল, ফ্যাক্সে কাম সারে। মুহূর্তে কত খবরাখবর পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যায়। চিঠি ডাকে পৌঁছতে সে সময় লাগে—তা বর্তমান যুগে যুক্তিহীন—অবৈজ্ঞানিক।

—কিন্তু সীমা আমি তো অন্য কাম জানি না। অন্য কাম গায়ে গছে না। আমি কী পাকুম? মানুষের কাছে চিঠি পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার নেশা, আসলে পেশা নয়।

-- ব্যবসা কর। যে কোন কাম কর। তবু চিঠি বিলানি ছেড়ে দাও। চিঠি তুমি পাবেই না। তুমি যদি চাও— বাবাকে বলে যে কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পাবি। বর্গাচাষ করলেও লাভ হবে। অন্তত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পাববে। মাটিকে না তুমি খুব ভালবাস!

– দেখি, কী কবা যায়। চল বাড়ি যাই। তোমাকে পৌঁছে দেই ।

–তবে যোগেশদা তোমাকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি। সারাদিন কর্মে ব্যস্ত থাকতে পারবে। সীমা মুচকি মুচকি হাসে।

— সেটা কী রকম?

- -তুমি শহরে গিয়ে গ্রামের সবার নামে চিঠি পোস্ট করে দাও। প্রত্যেকের নামে চিঠি আসবে। সিল দেবে। সেই চিঠি প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। তাতে সারাদিনই তোমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। প্রেরকেব নাম ঠিকানা দেবে না।

—বাঃ, সীমা বাঃ! তুমি তো বেশ বলেছ। তোমার মাথায় এত ঘিলু! এ কাজটা তো আমাকে করতেই হবে। গ্রামের প্রত্যেকের নামে চিঠি আসবে, আর আমি সে সব চিঠি বিলাব। বাঃ, খুব মজা হবে! খুব আনন্দ হবে। সীমা তোমাকে ধন্যবাদ। আগে কত চিঠি বিলি করতাম! এতে হয়তো অতীতের কয়েকটা দিন ফিরে পাব।

কথা বলতে বলতে ওরা সীমাদেব বাড়িতে চলে আসে। দীপেশবাবু দাওয়ায় বসে চা পান করছেন। সামনে মুড়ির বাটি। অল্প অল্প খাচ্ছেন। অন্ধকার হয়ে আসছে।

—সীমা এলি মা? ঘরে যা, তোর মা ডাকছে। যোগেশ তুমি এখানে বও। সারাদিন কোথায় থাক। এখন তো আর চিঠিপত্রের হিড়িক নেই। মোবাইলে সব কাম-কাইজ হয়। শোন, যোগেশ— তুমি পিয়নগিরি ছেড়ে দাও। অন্য কাজ কর। যে কোন কাজ। এমন কি চাষাবাদ কর। কাজ না করে করে— আর কতদিন কাটাবে। বয়স তো আর কম হলো না।

—ঠিক আছে কাকু। ভেবে দেখব। তবে আমি তো অন্য কাম জানি না। করছিও না কোনদিন। পারুমনি? নাকি লোক হাসামু?

—পারবা, নিশ্চয় পারবা। আমি শিখাইয়া দেমু।

সীমা ঘর থেকেই হাঁক দেয়, যোগেশদা, তোমাকে মা ডাকছে। ঘরে আইঅ। যোগেশ দীপেশবাবুর দিকে তাকায়। কিচ্ছু বলে না। অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে।

—যাও, তোমার কাকীমা ডাকছেন। ঘরে যাও। যোগেশ উঠে ঘরে যায়। খাটে বিছানো বেডশিটের ওপর পা তুলে বসে। সীমার মা কাকলি দেবী লুচিও হালুয়ার প্লেট সামনে রেখে বলে, নাও যোগেশ, খাও। গরম গরম, এখনই ভাজছি। যোগেশ ঘটির জল দিয়ে হাল্কাভাবে হাত-মুখ ধোয়। গপাগপ্ খেতে আরম্ভ করে। খাওয়া প্রায় শেষ।

কাকলি দেবী বলেন, তোমাকে বাবা একটা কথা বলি—কলকাতা থেকে খবর এসেছে। তোমার কাকার বন্ধু শম্ভুনাথবাবুর ছেলের সাথে সীমার বিয়ের পাকা কথা হয়েছে। ফাগুনের ষোল তারিখ বিয়ে। বিশ-পঁচিশ দিন বাকি। খুব বড় লোক। দোতলা দালান বাড়ি। নিজস্ব গাড়ি। অনেক টাকা পয়সা। সীমার বড় ঘরে বিয়ে হয়—সেটা তো তুমিও চাও বাবা। নাকি?

—তা চাইব না কেন? অবশ্যই চাই।

সেদিন যোগেশ দশটার আগেই অফিসে গিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে বসে আছে। দশটা বেজে গেল। স্যার এখনও আসছেন না। উত্তেজনায় ছটফট। এমন সময় অবিনাশবাবু অফিসে ঢুকে বলে, আরে যোগেশ, এত তাড়াতাড়ি কেন? অবশ্য তুমি সর্বদাই পাঙ্কচুয়াল। কিন্তু চিঠিপত্র না আসলে তো তোমার কোন কাম নাই। অযথা সময় নষ্ট। কী যে নেশা!

—আমার মন বলছে স্যার, আজ অনেক চিঠি আসবে। ব্যাগ খুলুন স্যার। অবিনাশবাবু কৌতূহল প্রকাশ করে না। তিনি জানেন— আজকাল মানুষ চিঠি লেখে না। তবু বলে তুমি গণক নাকি? অবিনাশবাবুর মোছের তলায় মুচকি হাসি। কিন্তু ব্যাগ খুলে তিনি তো অবাক! এত চিঠি কোথা থেকে এলো? এমন তো হয় না! এ যেন বিশ বছর আগের দিনকেও ছাড়িয়ে গেল। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকের নামেই চিঠি। অবিনাশবাবুর চিন্তাও কূল পায় না। কাকে সন্দেহ করবেন? যোগেশের যে কী আনন্দ! খুশিতে মুখ চোখ যেন ফেটে পড়ছে। পোস্টঅফিসের সিল মারতে লেগে গেল। সিল মারার আওয়াজটাই কী মধুর! আনন্দে যোগেশ সমগ্র শরীর দিয়ে হাসছে।

সারাদিন সমগ্র গ্রাম ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করে। যার কোন আত্মীয়স্বজন দূরে নেই। তিন কুলে কেউ নেই—তারও চিঠি এল! আজব কাণ্ড! প্রেরকের নাম, ঠিকানা নেই। চা দোকানের বাদলের নামেও চিঠি এল। যোগেশ তার হাতে চিঠি দিয়ে বলে, এই যে বাদল, তোমার চিঠি। বাদল চিঠি হাতে নিয়ে অবাক। উল্টে পাল্টে বলে, এ তো আমার চিঠি নয়। আমাকে আবার চিঠি লিখবে কে? চিঠি লেখাবার মতো আমার তো কোন আত্মীয়স্বজন নেই। ভূতুরে কাণ্ড। যোগেশদা তুমি ভুলে হয়তো অন্যের চিঠি দিলে।

—আরে বেকুব, এটা তোমারই চিঠি। তোমার নাম, ঠিকানা লেখা আছে না? তা দেখেই তো দিলাম। প্রেরকের নাম, ঠিকানা নাই—তাতে আমি কী করুম? মনে কইর‍্যা দেখ, শহরে বা অন্য

কোথাও আত্মীয়স্বজন থাকতে পারে। হয়তো তুমি চেন না। তাঁরাই লিখছেন। আমার কাজ চিঠি ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়া--আমি তা করলাম। আরও অনেক চিঠি আছে, দিতে হবে। গেলাম, এখন কথা বলার সময় একদম নাই। যোগেশ সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে চলে যায়। দু-তিনদিন যোগেশ খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠি বিলি করে। গ্রামের সবার নামের চিঠি বিলির কাজ শেষ।

চা দোকানে, মুদির দোকানে, ননীর টঙে যত্র তত্র একই আলাপ—কে গ্রামের সবাইকে লিখেছে? সব সাদা চিঠি। কোন লেখা নেই, সাদা কাগজ! খামের উপরে নাম ঠিকানা লেখা। কৃষ্ণপুর গ্রামের প্রায় সবাই এরকম সাদা চিঠি পেল। সবার একই প্রশ্ন, কে লিখল? কে লিখতে পারে? কোন উত্তর নেই। আলাপ আলোচনা সমালোচনা করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, নিশ্চয়ই এটা কোন উগ্রপন্থীর কাজ।

ডাকাত দলও হতে পারে। যে কোন দিন উগ্রপন্থীরা গ্রামকে আক্রমণ করতে পারে। এটা একটা বড় ধরনের হুমকি স্বরূপ চিঠি। কখন যে কোন দিকে ঘটনা ঘটবে কেউ বলতে পারবে না। তবে কিছু যে একটা অশুভ দুর্ঘটনা ঘটবে-- এ ধারণা গ্রামের মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সমস্ত গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রমণটা সন্ধ্যার দিকে বা গভীর রাতেও হতে পারে। যদি বড় লুণ্ঠার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সে সময়েও একটা উড়ো চিঠি এসেছিল গ্রামপ্রধানের নামে। তবে সাদা নয়। তাতে লেখা ছিল, প্রতিশোধ নেব। রক্তের বদলে রক্ত। ১৪ই আগস্ট ২০০৪ ইং সাল, একুশটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিল সন্ত্রাসবাদীরা। খাঁচার ভেতর পাখি ছটফট করছে! কী যে করবে! মানুষ হতবুদ্ধি। গ্রামপ্রধানকে নিয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত হয় যে, সবাই মিলে সন্ধ্যার পর থেকে পাহারা দেবে। সঙ্গে লাঠি, বল্লম ইত্যাদি থাকবে। থানাকে সাদা চিঠির ঘটনাটা জানানো হল। টি এস আর ক্যাম্পে খবর দেওয়া হল। টি এস আর জওয়ানরা ডিউটিতে আরও বেশি নিযুক্ত হল। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হল। হঠাৎ আক্রমণ হলে কিভাবে বাঁচতে হবে— সে সম্পর্কে নানা বুদ্ধি আলোচনা চলছে। এ কে ফরটি সেভেনের সামনে কোন বুদ্ধিই ঠিকমতো কাজ করে না। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের ঝাঁপ পড়ে যায়। গ্রাম্যহাট বন্ধ হয়ে যায়। ক্রেতা-বিক্রেতা যে যার ঘরে চলে যায়। অজানা আতঙ্ক রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। মানুষ অকারণেই হাট বাজারে বসে থাকে না। তাস খেলে না। সন্ধ্যার পরই হাটে অন্ধকার নেমে আসে। রাস্তাঘাট শুনশান। চলাফেরা আনন্দ উৎসব বন্ধ। সাপ্তাহিক হরিসেবা কল্কি-নারায়ণও বন্ধ। আতঙ্কে দিন কাটায় মানুষ। কখন যে কী হয়! অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। সন্ধ্যার পর অন্য নিরাপদস্থানে চলে যায়। প্রাণের ভয় তো সবারই আছে। গ্রামপ্রধান অবিনাশবাবুকে প্রশ্ন করেন, এসব চিঠি কোথা থেকে আসে? খামের ভেতর সাদা চিঠি! ব্যাপার কী? তিনিও কিছু বলতে পারেন নি, কারণ চিঠিগুলো শহরের বিভিন্ন পোস্টঅফিসে ড্রপ করা। এক জায়গায় থেকে আসেনি। অবিনাশবাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমোলে অস্পষ্ট রহস্যময় মনে হয়। তিনিও কিছুটা ঘাবড়ে যান। যা দিন পড়েছে...। অবিনাশবাবুও ভাবছেন, গ্রামের জমিজমা কিছু বিক্রি করে শহরে চলে যাবেন কিনা। কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। এলোমেলো চিন্তাভাবনা।

যোগেশ সীমাদের বাড়িতে যায়। সীমাকে একান্তে পেয়ে সমস্ত ঘটনা বলল— আতঙ্ক ছড়িয়েছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। গ্রামের সবার মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। আতঙ্কের বলিরেখা। কখন যে কী ঘটে যায়। রাত্রি হলেই গ্রামকে বিভীষিকা গ্রাস করে। সীমা গম্ভীর হয়ে বলে, এখন এসব যেন প্রকাশ করতে যেও না। তাহলেই সর্বনাশ। চিঠি লেখকের নাম যেন প্রকাশ না হয়। যদি কোন কারণে প্রকাশ হয়, তবে পিডা মুড়া খাইতে খাইতে শরীরের চামড়া খসে পড়বে। চাঁদমুখ বাঁকা হয়ে ভোঁতা হয়ে যাবে। দাঁত পড়ে যাবে। দু'একটা ঝুলে থাকবে। অতএব চুপচাপ। সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। যোগেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কী যে করবে? ভেবে পায় না। কাকলি দেবী ঘরেই ছিলেন।

—সীমা এদিকে আয় তো। কে এসেছে রে?

— আইয়ি, যোগেশদা।

— যোগেশকে ঘরে আসতে বল।

—আচ্ছা।

যোগেশ ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে। কাকলি দেবী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলে, গ্রামে যে কী আরম্ভ হয়েছে! উগ্রপন্থীরা নাকি চিঠি দিয়েছে। নাকি চাঁদার নোটিশ! সন্দেহ হয়। এমন কাজ কারা করতে পারে? তোমার কী মনে হয়?

—আমি আর কী বলব। সীমা তো সবই জানে...। ওর কথাতেই।

—সীমা জানে? মানে? বল কি যোগেশ?

—না, না, কাকিমা সীমা জানবে কেন? কেউ জানে না। আমিও জানি না। এ কাজটা নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীরা করেছে। সবাই তো তাই বলে। আমি বলছিলাম যে, আতঙ্কের ব্যাপারটা সীমা জানে।

—ও,তাই বল। এটা তো সবাই জানে।

— যে ব্যাপারে তোমাকে ডাকছি। সীমার বিয়ে আগামী শুক্রবারেই। গ্রামের আতঙ্ক ও সাদা চিঠির কারণেই বর পক্ষের লোকজন এ গ্রামে আসতে রাজি নয়। আগামীকালই সীমাকে তার জেঠু মশাইয়ের বাড়ি কলকাতা পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকেই বিয়ে হবে। আমিও তোমার কাকু চলে যাব। বিয়ে শেষে গ্রামে ফিরে আসব। সন্ত্রাসী আক্রমণের সম্ভাবনার কারণেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব ভাল ছেলে পাওয়া গেছে। এ সম্বন্ধ কোনমতেই ভেঙে দিতে পারি না। সীমার কপাল খুব ভাল। সোনার টুকরো ছেলে। লাখেও একটি পাওয়া দুষ্কর। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যাও—খুবই ভাল হয়। খুব ছোটবেলা থেকেই তো তুমি ওর দাদার মতো। বন্ধুর মতো। সারাদিনই শুধু যোগেশদা-যোগেশদা করে। এখনও ছেলেমানুষী গেল না।

—না কাকিমা, আমি যাবো না। আপনারা যান। বড় ঘরে সীমার বিয়ে হলে সত্যিই আমি খুব আনন্দিত হব। সর্বদাই ওর মঙ্গল প্রার্থনা করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ও যেন চিরসুখী হয়।

সাদা চিঠির আতঙ্ক অনেকটা স্তিমিত। ভয়টা একটু কমে আসছে। বুকে সাহস বাড়ছে। হাট

বাজারে এ বিষয়ে এখনো আলোচনা হয়। সন্ধ্যার পর এখনও রাস্তাঘাটে লোকজন কম চলাচল করে। সতর্ক থাকে। এখন আর সাদা চিঠি আসে না। যোগেশও পোস্টঅফিসে আর সব সময়ে বসে থাকে না। দু তিনদিন পর পর অফিসে যায়। মনমরা। অবিনাশবাবু কিছু জিগ্যেস করলে হু-হ্যাঁ করে উত্তর দেয়। বেশি কথা বলে না। হাসিখুশি ভাব নেই। জীবন যেন লুকিয়ে গেছে। মার খাওয়া কুকুরের মতো। ইদানীং তাকে অসহায় নগ্ন নির্জন লাগে। কে যেন তার বাড়িঘর, ধনসম্পদ সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। যোগেশ জীবনে কিছুই করতে পারেনি। ব্যর্থ। নিজের সম্পদকে এমনকি নিজেকেও রক্ষা করতে শিখেনি। ব্রাঞ্চ পোস্টঅফিসে এমন কী কাজ আছে। চিঠিপত্র তো আসেই না। অবিনাশবাবু ডাকব্যাগ খুলে অ্যাকাউন্ট স্লিপ বের করেন। হিসাবপত্র দেখেন। আজ একটি চিঠি এসেছে। অবিনাশবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে এবং ঠিকানা দেখে অবাক। যোগেশের নামে চিঠি! সাদা চিঠি নয়তো? তিনি শচীন্দ্রকে ডেকে এনে বলেন, দেখ কাণ্ড, যোগেশের নামে চিঠি! ওতে কী লেখা আছে, কে জানে? যে সারাজীবন মানুষের চিঠি বিলাল। আজ তার নামে চিঠি! বিশ বছরেও তো যোগেশের নামে কোন চিঠি আসেনি। আজ...হঠাৎ! বড়ো অবাক লাগে।-শচীন্দ্র —চিঠিটা তুমি যোগেশকে দিয়ে এস। ও হয়তো আজ অফিসেই আসবে না।

—ঠিক আছে ? দেন, আমি দিয়া আই।

যোগেশকে খোঁজে পেতে দেরি হল। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। পথে কমলের সঙ্গে দেখা হতেই বলল, যোগেশদা এই রোদেই পুলের রেলিঙে একা একা বসে আছে। কী যেন ভাবছে। বোধ হয় মন খারাপ। আমি বললাম, চল ফুটবল খেলা দেখে আসি। যোগেশদা কিছুতেই রাজি হল না। অথচ কাজকর্ম কিছুই নেই। উল্টো আমাকে ধমকে দিল। আজব মানুষ। আস্ত পাগল।

শচীন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে, আরে যোগেশ ভাই, তুমি এখানে কী কর? রোদ লাগে না? আইঅ এদিকে তোমার নামে একটা চিঠি আছে।

নাও, যোগেশকে চিঠি দেয়।

-আমার চিঠি! হতেই পারে না। অন্য কারও হবে হয়তো। গায়ে লাগায় না।

তুমি তো আজ অফিসেই যাওনি। তাই স্যার আমাকে দিয়েই পাঠালেন। তোমার নাম ঠিকানা সব লেখা আছে।

—আমারে কেডা চিঠি লিখব? আমার তো আগে পেছনে কেউ নেই। জীবনে কখনও কারও কাছ থেকে কোনদিন কোন চিঠি পাইনি। বড়ো অবাক কাণ্ড! জীবনে প্রথম পাওয়া কোন চিঠি। কৌতূহলে চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে ঃ

প্রিয় যোগেশদা,

আমার খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ি খুবই ভাল। মেয়ের মতো আদর করে। আমার স্বামীর নাম অনিমেশ। দেবতুল্য। আমাকে খুব ভালবাসেন। কোন জিনিসেরই অভাব নেই। আমার মতো মেয়ের এমন ভাগ্য হবে ভাবতেই পারিনি। তবে তোমার কথা মনে হলেই

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। তুমি কাছে না থেকেও যেন আমার সঙ্গেই আছ। এমন কেন মনে হয়? বিশেষ করে আমার বর যখন অফিসে থাকে।

আমি প্রতিদিন তোমাকে একটা করে চিঠি লিখব। ডাকব্যাগ খুললেই কমপক্ষে একটা চিঠি পাবেই। চিঠি পেলে তুমি যে কী আনন্দ পাও, তা চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারি। খুশির জোয়ার বয়ে যায় তোমার চোখে মুখে মনে। অন্যে না বুঝলেও আমি তো বুঝি!

সারাটা জীবন চিঠি চিঠি করে নষ্ট করে দিও না। ডাকপিয়নের কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করতে চেষ্টা করো। এটা আদেশ নয়। অনুরোধ। ব্যবসা করো। বাবাকে বললে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। নিষ্ঠা এবং ইচ্ছা থাকলে সবই হবে। শুধু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি। দেখবে একদিন তুমি দাঁড়িয়ে যাবেই। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আর একটা কথা তুমি বিয়ে করে সংসারী হও। তোমাকে সুখী দেখতে চাই। তাহলে আমিও শান্তিতে থাকতে পারব। মাকে মেয়ে দেখতে বলে এসেছি। তুমি না করো না। সাদা চিঠি আর কাউকে লিখো না যেন। এতে ক্ষতির পরিমাণই বেশি। যে সমস্ত অতীত বর্তমানকে বিঘ্নিত বা অস্থির করে তুলে, সেসব অতীতকে মনে রাখার কোন মানেই হয় না। আশা করি বুঝতে পারছ। ভাল থেকো।

ইতি
তোমার আদরের বোন
সীমা।

প্রহ্লাদ দাস

শাশুড়ির সাউকারি

— কেডা গো যায়? রুমার-মা দিদি নাকি?

—হগো, বেলার-মা দিদি।

—আইওনা, একটা পান খাইয়া যাও।

— বেলা বাড়ি অইতাছে, অহন আর আ-ই না দিদি।

—তুরু ইডা কি আর অয়? তুমি আমার বাড়ির কাছ দিয়া যাইবা আর তোমারে ডাইক্কা একটা পান খাওয়াইতাম পারতাম না, ইডা কেমুন কথা।

-তবে বেশিক্ষণ দিরং করতাম না, দিদি।

বেলার মা-এর ডাকে ও আপ্যায়নে রুমার মা আর না করতে পারল না। বেলার মা তখন বৈকালিক পান চিবুতেই ঘরের বারান্দায় বসেছিল। দুই প্রতিবেশি তখন পান খেতে বসলো। পান খেতে খেতেই সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। রুমার মা উঠতে যাবে এমন সময় বেলার মা রুমার মাকে বলল, কৈ গেছিলা দিদি?

—আর কৈও না, শম্ভুর মা দিদির কাছে গেছ্‌লাম একটা কামে। গিয়াঐ তারার হাউরি বউ -এর কাইজ্জার মইধ্যে পাইড়া গেলাম।

– তোমার কাম্‌ডা অইলো?

—আর কেমনে অইব? শম্ভুর বৌ, তার হাউরিরে চুলাইয়া কথা কয় আর হাউরিও বৌ-এর মা বাপ তুইল্লা বকাবকি করে। হাউরি-বৌ এর তুমুল কাইজ্জা আর কি! হাউরিও বৌ-এরে ছাইড়া কথা কয় না আর বৌঅ হাউরিরে বাদ বাহে না। কাইজ্জা দেইখ্যা আমি আইয়া পড়তাম চাইছিলাম। কিন্তুক্ শম্ভুর মা আমারে দেইখ্যা কইল,ওলো রুমার মা, যাস্ কৈ? দেইখ্যা যা আমার সোনার চান বৌ এরে। কেমুন কাইজ্জাখুইবা বৌ আনাইছি ঘরে!

শাশুড়ির কথায় বৌ-এর আর সহ্য হল না। তাই সে বলল, নিজে কত বালা আ, জানা আছে! রুমার মা তখন বৌকে বল্‌ল, আল বৌ, একটু চুপ্ করস্ না, মা লক্ষ্মী আমার, হাউরির মুখে মুখে কথা কউন নাই, পাপ অয়।

— দেহেন ছে মাসিমা, আপনে কেমুন কইরা কথা কন্! আর আমার হাউরি কেমুন কইরা কথা কয়! কথায় কথায় আমার বাপ-মা তুইল্লা কথা কয়, বাপ-মারে লইয়া কথা কইলে কার মনে না লাগব? কন্‌ছে মাসিমা?

এবার রুমার মা শম্ভুর মাকে বললে, ঠিকঅই তো দিদি। বৌ অইলো আর একজনের মাইয়া। আর একজনের মাইয়া অইলে অ নিজের মাইয়ার মতনই তারে দেখুন লাগে। তবে এনে বৌ হাউরিরে নিজের মা'র মতন দেখবো! সম্মান করবো!

—আমি কী আর কম্ বালা-বাই তাইরে, না কম্ আদর করি। নিজে না খাইয়া তাইরে খাওয়াই। হিডা কী আর আমার পোলার বৌ মনঅ রাহে?

ছেলের বৌ এবার আর ঠিক থাকতে পারলো না। তাই সে বললে, ঠিকঅই কইছেন, ঠি-ক্অই কইছেন! মূলার তরকারি বান্দা অইলে কেমনে খাইবেন, আপনের যে আবার পেডে গ্যাস অয়? পেড্ বেদনা করে। পেড্-বেদনায় কষ্ট পান। তখন এই মূলার তরকারিডা আমারে দিবেন। আগের দিনের ডাইল থাকলে, বাসি ডাইলডা আমারে দিবেন। আমারে দিবেন বাসি ডাইল-ভাত। আর কইবেন, বৌ জিনিস লোকসান করুন নাই। জিনিস লোকসান করলে ইডা অয় অলক্ষ্মীর চিহ্ন। আর নিজে খাইবেন তরতাজা ডাইল-ভাত। আর মাইনসের কাছে কইবেন নিজে না খাইয়া আমারে খাওয়ান!

—হুনছস্ রুমার মা? শয়তানের বাচচা কেমুন মিছা কথা কয়?

এবার রুমার মা শম্ভুর বৌকে বলল, চুপ কর মা, চুপ কর। হাউরি অইলো গুরুজন, পূজনীয়।

—অ্যাঃ এ-এ পূজনীয়! আপনার মতন হাউরি পাইলে পূজাঅই করতাম।

শম্ভুর মা রুমার মাকে বলল, দেখছস রুমার মা, বজ্জাত্নীর মাইয়ার কথাডা হুন্‌ছস! কেমুন তেছরা তেছরা কথা কয় তাই।

রুমার মা শম্ভুর মাকে বলল, ও দিদি চুপ করেন ছে। বড়রা সহ্য কইরা অই থাকুন লাগে। বড়র বড় গুণ অইল সহ্য কইরা থাকুন।

—মানলাম তর কথা। তবে এই বাইট্টাইল্লা বেলা তর কামডা করতাম পারলাম না বইন্। মনে কিছু কষ্ট পাইস না, কেমুন?

—কিছু অইত না। আর একদিন আমুনে দিদি।

—আইচ্ছা বইন্।

এভাবে শম্ভুর মা আর শম্ভুর বৌ এর ঝগড়ার সব কথাই বেলার মা-এর কাছে রুমার মা বর্ণনা করলো। এবং আরও বলল, শম্ভুর-মা দিদির বাড়ি থাইক্কা যখন আমরার বাড়িত যাইতাছিলাম তখনই তুমি আমারে ডাক দিছ।

—অ-অ-অ। আমি ত এই ঘটনা জানি না। শম্ভুর বৌ এমুন নি কাইজ্জাখুইরা, বইন!

—এমুন হেমুন বুঝি না দিদি। দুই জনই চোপা খুইরা। কেওর থেইক্যা কেওই কম না।

—কী জানি দিদি। আমার পোলাডারে অত বিয়া করাইছি না। কেমুন জানি বৌ আইয়ে আমার কপালে কোন্ ইতরনীর মাইয়া জানি আমার কপালে পোলার বৌ অইয়া আইয়ে।

—দিদি গো, ইডা যার যার কপাল। তবে একটা কথার কথা আছে, নিজে বালা অইলে জগৎ বালা।

ঠিকই কইছ দিদি।

—অহন্ আমি যাই দিদি। সইন্ধ্যা ত অইয়াই গেছে। আমার পোলার বৌডা ঘরে ধূপবাতি দিছেনি জানি, কেডা জানে!

—আইচ্ছা যাও। আর একদিন আইও কিন্তুক।

—আইচ্ছা দিদি, আসুনে।

রুমার মা বেলার মা-এর সাথে বসে পান খেয়ে, অন্যের বাড়ির কেচ্ছা কাহিনি বলে কয়ে নিজরে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

এক সময় রুমার মা নিজের বাড়িতে পৌঁছলো। বাড়ির উঠোনে পা রেখেই রুমার মা তার স্বভাবসিদ্ধ সুরে হাঁক ছাড়লো, ওলো শাকচুন্নির মাইয়া, এই সইন্ধ্যাবেলা ঘরদোয়ারে জলপানি পড়ছেনি লো? আর ধূপ ধুনা দিছসনি? ধূপের গন্ধ দেখি পাইটাই না!

ছেলের বৌ ঘর থেকেই উত্তর করলো, হ মা, ঘর ঝাড়ু দিছি, উডান ঝাড়ু দিছি। আর ঘরে ধূপধুনাও দিছি।

—হাছা-ঐ?

কথাটা বলেই রুমার মা বাডির উঠোনে পা রেখেই ছেলের বৌকে উদ্দেশ করে বলল, হ - অ-অ, তা-ই উডান ঝাড় দিছে! হিয়ান কিছু ঝাড়ুর দাগ, ইয়ান কিছু ঝাড়ুর দাগ। তাইন উডান ঝাড়ু দিছে! আবার উচ্চস্বরেই বৌকে বলল, আলঅ লুলার ঝি, তর হাত কি লুলায় ধরছে, না বাতে ধরছে.? উডানের এইখানের মাডিগুলি বুঝি ঝাড়ুর আগা দিয়া অন্যখানে নিওন যাইত না? আল্অ কী-ঈ-ঈ তুই, দেবাংসীর ঝি! একটু বাইরসন না! বাইরঅইয়া দেখস না, আমি ঠিক কইতাছিনি?

তখন ছেলের বৌ সান্ধ্য কাজ টাজ সেরে? হাতমুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়াতে আয়নার সামনে বসেছিল। এটা তার নিত্য স্বভাব, যা সকল ঝি-বৌরাই সান্ধ্য কাজ টাজ সেরে করে থাকে। একটু শারীরিক মানসিক ফ্রেস হয়ে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে যার যার বাড়ির সামনাটায় দাঁড়িয়েই পাশের বাড়ির ঝি-বৌদের সাথে একটু আলাপচারিতা করে থাকে আর কি।

ঘর থেকে ছেলের বৌ বের হচ্ছে না বলে ছেলের বৌ এর ঘরের দিকে একটু উঁকি দিয়ে দেখলো-- ছেলের বৌ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে। আর কী কথা আছে! অমনি রুমার মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো এবং তাচ্ছিল্যের সুরেই বলল, আলো হাজুরির ঘরের হাজুরি, আয়নায় মুখ দেইখ্যা সুনো পাউডার মাখলে অয়ই কী আর সংসার চলবো? নাকি রাইতের ভাত রান্দুনের লাইগ্যা চাইল বাছবি?

—মাগো, রাইতের ভাত রান্দুনের চাইল বাইচ্ছাঅই লাইছি।

—বাচ্ছা লাইছস? ঠিকঅই? কেমনু বাইচ্ছা লাইছস্ দেখি? চাইলগুলি আনত দেখি কেমুন বাছাঅইছে?

রাতে ভাত রান্না করার জন্য ছেলে-বৌ রেশনের যে চাল বেছেছিল, সে চালগুলি রুমার মা একটি কুলার মধ্যে নিয়ে আঙুল দিয়ে উল্টেপাল্টেদেখছিল আর মুখ ভ্যাংছিয়ে বলতে লাগলো, আলো ছিনাল্নীর ঝি ছিনালনী! তুই না কইছস্, চাল বাইচ্ছা লাইছস্? তবে এই ধানগুলি কই থেইক্যা বাইর অইল!

—মা-আ-আ, আমারে বহেন টহেন্ যা-ইচ্ছা তা করেন। আমি তা সহ্য কইরা লমু। কিন্তু আমার মা আপনারে কী করছিল? মারে যে বক্তাছেন?

—কী কইলি, হারামজাদী? কাম্‌কাইজ থুইয় হাজতি বইছস? আবার বড় বড় কথা কস্? তর লাজ লইজ্যা নাই? আয়, তরে বালা কইরা হাজন দেখাই! এই বলেই রুমার মা ছেলে বৌ-এর আঁচড়ানো মাথার চুল টেনে হেঁচড়ে এলোমেলো করে দিয়ে কাজল দেওয়ার কৌটা থেকে আঙুল দিয়ে কাজল নিয়ে ছেলেবৌ-এর মুখে গালে কপালে ঘষে মেখে দিল।

এক মুঠো ভাত

সিদ্ধেশ্বর দাস। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক। তাঁকে সকলেই সিধুবাবু বলে জানে। এই সিধুবাবু বিদ্যালয়ে টিফিন পিরিয়ডে বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা আলু ভাজা ও শুকনো রুটিই খেতেন। আর স্থানীয় একটি চায়ের দোকান থেকে আনিয়ে এক কাপ লাল চা পান করতেন। টিফিন খাওয়ার পর বাড়ি থেকেই আনা একটি পান ও একটা বিড়ি খেতেন।

পান খেতে খেতে বিড়ি টানছেন আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন। তিনি দেখলেন দরজার বাইরে একটি লাল রং এর অর্থাৎ কিছু লালচে বাদামী রং এর নেড়ে কুকুরী চুপ করে বসে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। সিধুবাবুর কেমন খারাপ লাগলো। আর মনে মনে ভাবলেন আর একটু আগেই কুকুরীটাকে দেখলে তো তাঁর টিফিন থেকেই একটু রুটি ছিঁড়ে দিতে পারতেন। চেয়ার থেকে উঠে এসে কুকুরীটার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কুকুরীটাকে বললেন, যা—যাতো মা, এখন চলে যা, কাল আবার এমন সময় আসিস্ তোকেও খেতে দেব।

কুকুরীটা কী বুঝলো বোঝা গেল না। তবে কুকুরীটা চট্ করে উঠলো আর উঠেই সিধুবাবুর দিকে একবার তাকালো ও সিধুবাবুকে একবার জিভ দিয়ে চাট্‌তে চেষ্টা করলো। সিধুবাবু একটু সরে দাঁড়ালেন, কুকরীটা সামনের পা দুটি সটান সোজা মাটির সমান্তরাল করে মাটিতে রেখে, পেছনের পা দুটো উঁচু করে মাথাটা ও ঘাড়টা সামনের সমান্তরাল পা দুটোর ওপর রেখে পিঠটাকে টান টান করে কু-উ-উ শব্দ করে সোজা চোখের অন্তরালে চলে গেল।

পরদিন টিফিন পিরিয়ডে সিধুবাবু যখন টিফিন করার জন্য রুটি আলু ভাজা বের করছেন এবং দরজার দিকে তাকাচ্ছেন, দেখলেন কুকুরীটা দরজার কাছে নেই। তিনি ভেবেছেন হয়তো কুকুরীটা আজকে আসে নাই। তাই রুটি ছিঁড়ে আলু ভাজা সহ যেই মুখে দেবেন অমনি দেখেন কুকুরীটা দরজার কাছে এসে লেজ নাড়ছে আর অস্পষ্ট স্বরে গুঙড়াচ্ছে। তিনি তা লক্ষ করলেন এবং তাঁর টিফিন থেকে আস্ত একটা রুটি কুকুরীটাকে খেতে দিলেন। কুকুরীটা মুখে ও দু'পায়ে রুটিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো করে খেতে লাগলো। সিধুবাবু তা দেখে

পরম তৃপ্তি পেলেন। সিধুবাবুর খাওয়াও শেষ কুকুরীটার খাওয়াও শেষ। সে খাওয়া শেষ করেই সিধুবাবুর দিকে তাকালো ও লেজ নাড়তে লাগলো। তিনি তখন কুকুরীটাকে বললেন, কাল আবার আসিস তোকে রুটি দেব। সে কী বুঝলো সিধুবাবু বুঝলেন না। কুকুরীটা অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে গেল।

এভাবে প্রতিদিন কুকুরীটা আসে এবং সিধুবাবুর দেওয়া রুটি খেয়ে চলে যায়। একদিন সিধুবাবু স্কুল ছুটি হওয়ার পর বাড়ি ফিরছেন। বাড়ি যেতে যেতে কুকুরীটার কথাই ভাবছেন। হঠাৎ তাঁর পেছনে কিসের শব্দ পেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন সেই কুকুরীটাই তাঁর পেছনে পেছনে আসছে। সিধুবাবু কুকুরীটাকে সোহাগ ভরে বললেন, আমার বাড়ি যাবি? চল তবে।

কুকুরীটা সিধুবাবুর বাড়ি গেল এবং বারান্দায় উঠে তারই এক কোণায় প্রথম বসলো। তারপর শুয়ে পড়লো। সিধুবাবু হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলেন বৈকালিক চা-পান করবেন বলে। কুকুরীটি সিধুবাবুর পাশে এসে বসলো। সিধুবাবু বিস্কুট সহযোগে চা পান করছেন, কুকুরীটিকে একটি বিস্কুট দিলেন। কুকুরীটি সিধুবাবুর পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিস্কুট খেল।

সিধুবাবুর দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেরা বড়। মেয়েটি ছোট। কুকুরীটিকে বাবার অনুরক্ত দেখে ছেলেরা বলল, বাবা, এই কুকুরীটাকে কোথা থেকে এনেছো? বাবা সবিস্তারে কুকুরীটার কথা ছেলেমেয়েকে বললেন। হঠাৎ মেয়েটি বলল, বাবা এটাকে আমি বাড়িতেই রেখে দেব। আর নাম রাখবো লালি।

— বেশ তো, ওর গায়ের রং যখন লাল, ওর নাম লালিই রাখিস। আর বাড়িতে যখন এসেছে এমনিতেই থাকবে। আদর যত্ন পেলে কোথাও যাবে না।

—আমি ওকে আদর করবো।

—শুধু আদর করলেই তো চলবে না! ওকে যত্ন করতেও হবে, খেতেও দিতে হবে।

দুই ছেলে একসাথেই বলে উঠলো, আমরা ওকে যত্নও করবো খেতেও দেব।

— বেশি দিতে হবে না। নিজের ভাত খাওয়ার সময় ওর জন্য প্রত্যেকে তরিতরকারি মিশিয়ে দুটো ভাত জড়ো করে ঐ ভাতের জড়াগুলি একসঙ্গে দিলেই ও পেট ভরে খেতে পারবে। এতে কারুরই কমও পড়বে না।

—আমরা সকলেই তা-ই করবো, বাবা।

— বেশ, শুনে ভাল লাগলো।

প্রত্যেকেই ভাত-খাওয়ার পর লালিকে খেতে দেয়। এতে লালি খু-উ-ব ভালই আছে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। বাড়ির সদর ঘাটলায় প্রহরীর মত শুয়ে বা বসে কাটায়। অন্য সব কুকুর আসলে তাড়িয়ে দেয়। আর অপরিচিত লোক আসলে ঘেউ ঘেউ করে ধাওয়া করে। তবে কাউকেই কামড়ায় না, শুধু ভয় দেখায়।

সিধুবাবুকে স্কুলে যাওয়ার সময় স্কুলের কাছে এগিয়ে দিয়ে আসে। সিধুবাবু বাড়িতে আসার সময় হলে প্রায় স্কুলের কাছ থেকে গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসে। বাড়িতে সিধুবাবু

আসলে ঘেউ ঘেউ করে সকলকে জানান দেয় যে, মাষ্টারমশাই বাড়িতে এসেছেন।

এভাবে দিন পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর ঘুরে আসে। লালিও সিধুবাবুর পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেছে। ঘরে খাওয়া দাওয়ার জন্য নতুন কিছু আনা হলে লালিকে না দিয়ে পরিবারের কেউ কিছু খায় না। মাষ্টারমশাইয়ের থাকার ঘরের বারান্দায়ই লালির থাকার স্থান করে দেয়া হয়েছে।

সিধুবাবুর উঠোনের দু'দিকে দুটি মাটির দেয়ালযুক্ত ছন-বাঁশ দিয়ে তৈরি ঘর। একটি উঠোনের উত্তর দিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। উত্তর দিকের ঘরটিতে মাষ্টারমশাই ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন। সাথেই একটি একচালা মাটির দেয়ালযুক্ত রান্নাঘর। পশ্চিমের ঘরটাতে আত্মীয়স্বজন আসলে থাকেন। নতুবা বসার ঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। উত্তর দিকে—প্রায় রান্নাঘরের কাছেই— একটি চাপাকল (টিউবওয়েল) আছে। এটাই একমাত্র বাড়ির জলের উৎস। দক্ষিণ দিক বাড়িতে বাতাস খেলার জন্য খোলা রাখা হয়েছে। তবে বাড়ির চারিদিক বাঁশের ট্যাংরা বেড়া দিয়ে পরিবেষ্টিত। লালি এখন বাড়ির বাইরে খুব কম যাওয়া আসা করে। প্রায় সময়ই বাড়ির ঘাটলায় শুয়ে বা বসে কাটায়। লালি নিজের ইচ্ছায়ই এখন পশ্চিমের ঘরটাতে থাকে। এতে রোদ বৃষ্টির আঁচ লাগে না। একদিন লালি মা হলো, তাই লালি মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা সারাবাড়ি ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে যায়।

একদিন যখন লালি বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছিল, লালি দেখে থাকার ঘরের ছনের চালে আগুন। তখন আর লালির বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানো হলো না। দৌড়ে এসে গলার যত জোর আছে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলো এবং থাকার ঘরের দরজায় পা দিয়ে থাবা মারতে লাগলো। ঘেউ ঘেউ করেও বলতে চাইছে যে, ঘরে আগুন লেগেছে। তখন লালির আর বাচ্চাদের দিকে মোটেও খেয়াল ছিল না, শুধু থাকার ঘরের চারিদিকে পাগলের মত ঘুরতে লাগলো আর যেখানে জানালা পেয়েছে সেখানেই লাফ দিয়ে থাবা মারতে চেষ্টা করছে। প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করতে করতে লালির গলা ভেঙে গেছে। তবু ভাঙা গলায়ই আপ্রাণ চেষ্টা করছে মালিককে বাড়ির এই দুরবস্থার কথা জানাতে।

এদিকে আগুন ছনের ঘরের চালের প্রায় সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সিধুবাবু লালির আর্তচিৎকারে দরজা খুলে বাইরে আসলেন এবং ঘরে আগুন দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত হয়ে রইলেন। পরক্ষণই ঘরে ঢুকে ছেলেমেয়েদের হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসলেন। ততক্ষণে সম্পূর্ণ ঘরে আগুন ছড়িয়ে গেছে। কালটা ছিল শীতকাল। শীতে লেপ মুড়ি দিয়ে শোয়াতে লালির আর্তচিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। সকলেই তখন দূরে দাঁড়িয়ে আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে। সিধুবাবুদের চিৎকার শুনে পাড়া-প্রতিবেশিরা দৌড়ে ছুটে আসলো এবং বালতি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে কলতলায় গেল। কিন্তু দেখা গেল কে বা কারা চাপাকলের বডিটা খুলে রেখে দিয়েছে। তাই আগুন নেভানোর কোন সুবিধাই পাওয়া গেল না। চোখের সামনে আস্ত ঘরটা ঘরের আসবাব পত্র শুদ্ধ পুড়ে

যেতে লাগলো। এই হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির মধ্যেও ছেলে দুটো যা পারছে অগ্নিদগ্ধ ঘর থেকে বের করে এনে একটু দূরে রাখছে।

আর অন্যদিকে লালিও ছেলেদের সাথে যোগ দিয়ে একটা বালিশ কামড়ে হেঁচড়ে উঠোনের এক পাশে রেখে আবার অন্য কিছু আনতে অগ্নিদগ্ধ ঘরে ঢুকল।

ঠিক সেই সময়ই ঘরের চাল থেকে একটা জ্বলন্ত চালের কিছু অংশ লালির ওপর পড়ে একেবারে লালিকে ঢেকে দিল! জ্বলন্ত চালের নিচ থেকে লালিকে আর বের করা সম্ভব হলো না।

বড়র বড় গুণ

—আপনার নাম কি সুমন দাস?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—আপনি তো ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হতে পাববেন না।

—কেন? কী হয়েছে?

– আপনার পি আব সি অর্থাৎ পারমানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ইনভেলিড হয়ে গেছে।

— তার মানে?

--তাব মানে অতি সহজ' এখন ছয় মাস পেরিয়ে গেলেই ঐ সার্টিফিকেট ইনভেলিড্ হয়ে যায়। আপনার পি আর সি তো বেশ কয়েক বছর আগের।

—তা আগামীকাল দিলে হবে তো?

—মোটেও না। আজকেই ভর্তি হওয়ার শেষ তারিখ।

-- দেখুন, অনেক বছর শিক্ষকতা করার পব একটা বেটাব সুযোগ পেয়েছি। দেখুন না, কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিনা?

—আমি অনন্যোপায়। রেজিস্ট্রারের কড়া নির্দেশ আছে। সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস সহ কাগজপত্র না থাকলে দরখাস্ত জমা না রাখার।

— দেখুন না, একটু পারা যায় কিনা।

—আমি কী করে ওপরের অর্ডার অমান্য করি বলুন? আজকে হল ভর্তি হওয়ার শেষ তারিখ। পত্রিকায় দেখেননি? আরও আগে আসতে পারলেন না? ক'দিন ধরেই তো ভর্তি চলছে।

— সেটাই তো আমার ভুল হয়ে গেছে।

—তবে এটুকু আপনার জন্য করতে পারি বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। আজকে আমি আরও আগেই চলে যেতাম। আজকের মধ্যেই

কিন্তু আপনার পি আর সি-টা জমা দিতে হবে।

— দেখি কী করতে পারি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

—হ্যাঁ, দেখুন।

ইউনির্ভাসিটির করণিকমশায়ের কাছ থেকে একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজ কাগজ নিয়ে ওখানে বসেই আমাদের মৌজার এস ডি সি-কে সম্বোধন করে আমার পি আর সি পাওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত লিখলাম। আমার স্থায়ী ঠিকানা ছিল বিশালগড় মৌজায়। তাই তৎক্ষণাৎ বিশালগড় চলে গেলাম। অফিস আরম্ভ হওয়ার আগে এস ডি সি সাহেব বিশালগড় থানার কাছে বাজারের মধ্যে একটা জুয়েলারি দোকানে প্রায়ই বসেন। আর ঐ দোকানে গেলাম এবং বণিকবাবুকে এস ডি সি সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বণিকবাবু আমাদের বিশালগড় মৌজার এস ডি সি সাহেব তো আপনার দোকানে আসেন? আজকে এসেছিলেন কি?

—হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন তো। এইমাত্র আগরতলায় ওনার অফিসে চলে গেছেন। এখন আপনিও যদি আগরতলায় যান তবে হয়তো ওনাকে তাঁর চেম্বারেই পেয়ে যেতে পারেন।

—তাহলে এখন যাই, বণিকবাবু। আমার আবার আজকেই একটা পি আর সি পেতে হবে।

—আচ্ছা আসুন।

আমি তখনই অন্য একটি জীপ গাড়িতে উঠলাম এবং আগরতলা এস ডি ও অফিসে গেলাম। আমাদের এলাকার এস ডি সি সাহেব মিষ্টার এন চক্রবর্তীর চেম্বারে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, তিনি চেম্বারেই আছেন। সাথে তাঁর সমকক্ষ আরও কয়েকজন অফিসারও আছেন।

—স্যার, ভিতরে আসতে পারি?

—কী দরকার?

— আপনার কাছেই এসেছিলাম।

—বলুন।

—স্যার, আমার একটি পি আর সি আজকেই দরকার। যদি দয়া করে আজকেই এই সার্টিফিকেটটা দিয়ে দেন তবে আমার ভীষণ উপকার হয়।

—দরখাস্ত এনেছেন.?

—হ্যাঁ, স্যার।

—দরখাস্তটা অফিসের রিসিভ সেকশানে জমা দিয়ে দিন।

— স্যার, রিসিভ সেকশানে দরখাস্তটা জমা দিলে তো আপনার কাছে কবে বা কখন আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

—তা আমি কী করতে পারি?

—স্যার! আজকেই যে আমার পি আর সিটা একান্ত প্রয়োজন। আজকের মধ্যেই এই সার্টিফিকেটটা ইউনির্ভাসিটিতে জমা দিতে হবে। আজকে যদি না পাই এবং তা অফিসে জমা না দিতে পারি। ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হতে পারবো না, স্যার।

—তারজন্য কী আমি দায়ী?

—তা নয়, স্যার। তবে কি স্যার আপনিও একজন এমপ্লয়ী আর আমিও একজন এমপ্লয়ী। আপনি যদি আমার দুঃখ না বোঝেন তবে আর কে বুঝবে বলুন, স্যার।

—আপনারা নাকের ডগায় লাগিয়ে কাজ নিয়ে আসেন কেন?

—স্যার, আমি জানতাম না ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হওয়ার শেষ তারিখ।

—এতসব কিছু বোঝার আমার সময়ও নেই প্রয়োজনও নেই। অফিসের রিসিভ সেকশানে জমা দিয়ে দিন। যখন আমার কাছে আসবে তখনই তা পেয়ে যাবেন। এবার আপনি আসুন।

—তখন আমার ভীষণ রাগ হলো মনে। রাগের বসেই আমি এস ডি সি সাহেবকে বলে বসলাম, আমার পি আর সি টা আজকেই নিয়ে যাব।

—তবে আর আমার কাছে এসেছেন কেন?

—এটাই তো আমি ভুল করেছি।

রাগের বশে বলেছি তো ঠিকই, কিন্তু কীভাবে সার্টিফিকেট ম্যানেজ করবো সে চিন্তায়ই আমি তখন অস্থির।

সে সময় আরও কয়েকজন এস ডিসি সাহেবের চেম্বারে বসা ছিলেন। আমি রাগের বসে তৎক্ষণাৎ এস ডি সি সাহেবের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই ডিপার্টমেন্টেরই একজন পুরোনো অভিজ্ঞ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বা পিয়নকে খুঁজছি। অফিসের চারপাশে একটু ঘোরাঘুরি করতেই সেই পুরোনো পিয়নকে খুঁজে পেলাম এবং ওনাকে আমাদের মৌজার এস ডি সি সাহেবের ব্যবহারটা ও আমার পি আর সি পাওয়ার প্রয়োজনটা বললাম।

পিয়ন দাদা মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলি শুনলেন এবং বললেন, বিশালগড় মৌজার এস ডি সি সাহেব তো মিঃ এন চক্রবর্তী।

—ঠিক তাই।

—আপনার সাথে এ ব্যবহারটা করা তাঁর ঠিক হয় নাই। তবে আপনি এক কাজ করেন স্যার, আপনি বড়সাহেবের কাছে যান। এস ডি ও সাহেবের নাম জে সি বোস। তিনি খু-উ-ব ভাল মানুষ। আপনার কাজ অইব।

—আপনি সত্যিই বলছেন?

— হ্যাঁ স্যার, আমি তো তাঁরে চিনি।

—এস ডি ও সাহেব কোন কোঠায় বসেন?

পিয়নদাদা আঙুল দিয়ে এস ডি ও সাহেবের চেম্বারটা দেখিয়ে দিলেন এবং চোখের ঈশারায় আমাকে ওনার চেম্বারে যেতে বললেন।

আমি সাহেবের কোঠার দরজায় গেলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম দরজায় সামনে একজন লোক ঠাঁয় বসে আছে, চতুর্থ শ্রেণির লোক বলেও ওকে আমার মনে হলো। ওকে কিছু না বলেই স্যারের কোঠায় যেতে চাইছিলাম। অমনি সেই লোকটি আমাকে বাধা দিলেন এবং বললেন, ভিতরে যাইবেন না। স্যার অহন ব্যস্ত আছেন। আমার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তখন একটার ওপরে বাজে। আমার পাঁচটার আগেই ইউনির্ভাসিটিতে যেতে হবে।

তাই একটু রেগে হাত নাড়া দিয়ে বললাম, আমাকে যেতে দিন, আমার ভীষণ দরকার। অমনি ওর বসা সেই টেবিল সহ ওর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমি তাকে পড়তে না দিয়ে ধরে ফেললাম এবং চট করে ভিতরে ঢুকে গেলাম। বললাম, স্যার আসতে পারি?'

—ঢুকেই তো গেছেন। আসুন। কীজন্য এসেছেন?

— স্যার, ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হওয়ার আজকেই শেষ তারিখ। আমার ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের মধ্যে আমার পি আর সি টি-র নাকি ভেলিডিটি নেই। তাই যদি দয়া করে আজকেই একটি পি আর সি মঞ্জুর করেন আমার উপকার হয়।

—নিশ্চয়ই পাবেন এবং এখনই যাতে আপনার পি আর সি টা পান আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব।

আনন্দে আমার বুকটা ভরে গেল। স্যারকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আমি আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাকে আর উনি কিছু বলার সময় দিলেন না। কলিং বেল টিপলেন। অমনি ঐ টেবিলে বসা দপ্তরি এসে হাজির। স্যার দপ্তরিকে বললেন, শোন, মাষ্টারমশাই-এর দরখাস্তটায় আমি নোট দিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেকশানে গিয়ে এই দরখাস্তটা সেকশানের বাবুকে দেবে এবং বলবে কালবিলম্ব না করে যেন এখনই ওনার পি আর সি-টা তৈরি করে আমার কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়ে নেন।

—আচ্ছা, স্যার।

আমি স্যারকে অনুনয় করে বললাম, স্যার আমি আর একটি কথা বলবো?

—নির্দ্বিধায় বলুন।

এই সময়টুকুর মধ্যে আমাদের মৌজার এস ডি সি সাহেব আমার সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা সবিস্তারে স্যারের কাছে বললাম। এই সময় স্যারের চেম্বারে কয়েকজন বিভিন্ন মৌজার এস ডি সি অফিসারও ছিলেন। যাদের দু-একজন তখন আমাদের এস ডি সি সাহেবের কোঠায়ও বসা ছিলেন। আমার কথা-শুনে এস ডি ও সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বিভিন্ন মৌজার এস ডি সি অফিসারের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আচ্ছা বলুন তো, লোকের উপকার না করে তাদের হয়রানি করতে আপনারা এত আনন্দ পান কেন?

লড়াই

আমরা কয়েকজনে বন্ধু মিলে চিত্রকথা সিনেমা হলে সিনেমা দেখবো বলে ইভিনিং শো এর টিকিট কাটলাম। শো আরম্ভ হতে তখনও কিছু দেরি ছিল। তাই সিনেমা হলের কিছু দূরে হরিগঙ্গা বসাক রোডের পাশেই আমরা গল্প করছিলাম। হঠাৎ দেখি কে আমার প্যান্ট টানছে আর বলছে, দশটা পয়সা দেন না বাবু, ও বাবু দশটা পয়সা দেন না। প্যান্টে টান পড়তেই চেয়ে দেখি লাঠিতে ভর দিয়ে এক পা খোঁড়া একটা ভিখিরি ছেলে আমার প্যান্ট ধরে টানছে আর পয়সা চাইছে। আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললাম, এই ছেলে, আমার প্যান্ট টানছিস কেন? ছাড়্! অন্যদিকে যা।

—দেন না বাবু। দেন না দশটা পয়সা। দশটা পয়সা এ-নে দিবেন।

—এই ব্যাটা, তোর কি আমার কাছে পয়সা পাওনা আছে?

—ধুরু! আমি আবার আর একখানে যামু। আমারে দিরং কইরেন না।

—বলছি তো, তুই এখন যা। অন্য কোথায় যাবি বলছিস, সেখানেই যা।

—অইছে বুজঝি, পয়সাটা দিয়ালান্। আর গুরাইয়েন না।

আমি তখন ভিখিরি ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললাম, তোকে চলে যেতে বলছি না? যাঃ, অন্য জায়গায় যা।

—দেখছেন, কেমুন নমুনা করতাছে। দিয়ালাইলেই ত চলে।

—একটা থাপ্পড় দেব কিন্তু। যা বলছি।

—তুরু! আর নমুনা কইরেন না! দিয়াএনা লাইবেন!

এবার আর সহ্য হলো না। তাই প্রচণ্ড ধমকের সুরে বললাম, দাঁড়া, দেখাচ্ছি! নমুনা করছি কিনা, এখনই দেখাচ্ছি।

এই কথা বলে যেই মাত্র প্রচণ্ড রাগ দেখিয়ে সত্যি সত্যিই ওকে একটা চড় মারতে গেছি; অমনি সে আমাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল।

বেশ কয়েক বছর পর আবার একদিন আমি ও আমার এক বন্ধু স্থানীয় সিনেমা হল সূর্যঘরে একটা বাংলা সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমা হলে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। টিকিট কাউন্টারে টিকিট নেই। তাই সিনেমা হলের এক পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করবো! এমন সময় সেই এক পা খোঁড়া ছেলেটা একটা লাঠিতে ভর দিয়ে আমার কাছে এসে বলল, টিকিট লাগবো বাবু? বেলকনি, না ফাসক্লোস? যি ডা চান হিডা -ই আছে। আমি ওকে দেখে তাজ্জবই হয়ে গেলাম। আর আমাকে দেখে সেও বোধ হয় চিনতে পেরেছিল তাই চলে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম, এই ছেলে, শোন? আমার ডাকে সে ফিরলো এবং বলল, আমারে ডাকতাছেন বাবু? যেন আমাকে চিনতেই পারেনি সে।

—হ্যাঁ, তোকেই।

—কন্ কী কইবেন?

—তুই এখন কি ব্ল্যাকে সিনেমার টিকিট বিক্রি করিস?

—হ! কী অইছে? অহন্ আর ভিক্ষা করি না। বলেই লাঠিতে ভর দিয়ে সে চলে যেতে লাগল। ওর চলার পথে আমার অবাক-দৃষ্টি বন্দি হয়ে রইল।

অনুভব

আমি তখন কলেজে পড়ি। এম বি বি কলেজে। কলেজের কাছাকাছিই এক বসাক বাড়িতে ভাড়া থাকি। আমি আর আমার ছোট ভাই। সেও কলেজে পড়ে। খুব সম্ভব ১৯৬৫ ইং কি ১৯৬৬ ইং সন হবে। দুবেলাই টিউশনি করি। তা দিয়েই দু'ভাই-এর পড়াশোনা ও অন্যান্য খরচ ও জীবন ধারণের খরচ চালাই। মাসোহারা যা পাই তা দিয়ে দু'ভাই এর যাবতীয় খরচ চালাতে কষ্টই হয়। তবুও একদিকে কলেজ করা অন্যদিকে টিউশনি তাই সময়ে কুলোতে পারি না বলে, যে পাড়ায় থাকি সে পাড়ার এক দিদি যিনি লোকের রান্না করে তার নিজের খরচাপত্র চালান তাকেই আমাদের রান্না করতে রাখলাম। মাসোহারা দিতাম মাত্র দশ টাকা। এতেই দিদি খুশি। এক বেলা রান্না করেই চলে যেতেন। রাত্রিবেলা শুধু ভাত রান্না করে ও অন্যান্য তরিতরকারি গরম করে খেতাম।

একদিন দিদি আসেননি। কেন তিনি কাজে আসেননি তা দেখতে গিয়ে দেখলাম দিদির ভীষণ জ্বর! বিছানা থেকে উঠতেই পারছেন না। আমাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় উঠতেই পারছেন না। আমি তখন দিদিকে বললাম, তোমার ছেলে কোথায়? তুমি বিছানা ছেড়ে ওঠো না।

—পোলাডা অষুধ আনতো গেছে, ভাই।

—জ্বরটা কখন উঠলো?

— শেষ রাইতে। তখন বাইরে যামু আর যাইতে পারি না। কাঁপুনি দিয়া শরীলে জ্বর আইল। কোন মতে বাইরে থেইক্যা আইয়া এই যে খেতা লইয়া পড়লাম, আর কইতে পারি না। আমার জ্বর দেইখ্যা পোলাডাও চিন্তাত পইড়া গেছে। হে জানে আমার জ্বর অইলে আমি খু-উ-ব কষ্ট পাই। হে লাইগ্যা ঘুম থেইক্যা উইডাই ডাক্তারের কাছে গেছে। হে ডাক্তার আবার আমরার গরিব মানুষেরই ডাক্তার। বেশি টেকা পইসা রাহে না।

—আচ্ছা দিদি, সে ওষুধপত্র আনলে ঠিকমত ও সময়মত খেয়ো। এবার বাসায় যাই, দিদি। দেখি গিয়ে কী করতে পারি?

—ভাইগো, আইওগা। তোমরার ত আজগা খুবই কষ্ট অইব।

—কী আর করা যাবে, তুমি তো আর ইচ্ছা করে অসুস্থ হওনি। ও হ্যাঁ, তোমার যদি বেশি কিছু অসুবিধা হয় আমাকে জানাইও।

— তোমরাই কত কষ্ট কইরা চলতাছ। আবার তোমরারে বিরক্ত করমু কেন ভাই?

—ঠিক আছে রাত্রে আবার আসবোখন।

রাত্র তখন আটটা বাজে বোধ হয়। আমি টিউশনির বাড়ি থেকে একটু আগেই বাসায় ফিরছি। ফেরার সময় হঠাৎ মনে হলো উত্তমকুমার অভিনীত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ ছবিটা স্থানীয় সূর্যঘর প্রেক্ষাগৃহে চলছে। পোস্টারে লেখা আছে আজকেই 'শেষ রজনী'। তাছাড়া অনেকদিন সিনেমাও দেখি না এবং সময়ও পাই না। টিউশনি করে ফিরতেই রাত হয়ে যায়। আজকে যখন একটু আগেই বেরিয়েছি, তখন নাইট্ শোতে গৃহদাহ বইটা দেখেই যাই।

সিনেমা হলের কাছে গেছি। কাউন্টারে তেমন ভিড় নেই। তাছাড়া বাংলা বই অনেকেই দেখতে চায় না। টিকিট কাউন্টারে হাত ঢুকিয়ে বললাম, দাদা আমাকে একাট ফার্স্টক্লাসের টিকিট দিন। বলেই যেইমাত্র টিকিটের জন্য টাকা দিতে গেছি অমনি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমার মাথায় অনেক কিছু চিন্তার বেড়াজাল এসে ঢুকলো। প্রথমত সিনেমা ভাঙতে রাত্র বাবটা বাজবে। ছোট ভাই চিন্তা করবে, দাদা টিউশনি সেরে ফিরছে না কেন? সে তখন মহা দুর্ভাবনায় পড়বে। তাছাড়া আমি না গেলে রাত্রির ভাতটা রান্না করবে কে? দ্বিতীয়ত যে এক টাকা (তখন ফার্স্টক্লাসের টিকিট ছিল এক টাকা) দিয়ে সিনেমা দেখবো তা দিয়ে আলু কিনে নিলে আমাদের বেশ কয়েক দিন আলুসেদ্ধ চলবে। তৃতীয়ত টিউশনিতে আসার সময় কাজের দিদিকে অসুস্থ দেখে এসেছি। শুনেছি খাওয়াতে মুখে নাকি রুচি নেই, তাই একহালি কমলা নিয়ে দিদিকে দিলে দিদির মুখে রুচি আসবে।

এই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কাউন্টারের ভেতর 'থেকে হাতটা বের করে হন্ হন্ করে চলে এসেছি। আসার পথে শুনতে পেলাম কাউন্টারের ভেতর থেকে বলছে, কেমন লোকের পাল্লায় পড়লাম, টিকিট ছিঁড়ালাম অথচ টিকিটটা না নিয়েই চলে গেল। পাগল নাকি লোকটা! ওসবে আমি তখন আর কান দেইনি। আমি একবারে চলে এলাম ফলের দোকানে। সেখান থেকে একহালি কমলা কিনে এক্কেবারে কাজের দিদির বাড়িতে। দিদি তখন ঘুমোচ্ছে। দরজায় ধাক্কা দিতেই দিদির ছেলে অরুণ দরজা খুলে আমাকে দেখে বলল, মামা দেখি!

—দিদি কি ঘুমিয়েছে রে, অরুণ?

—একটু আগে বার্লি খাওয়াইয়া, ওষুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইছি। মারে ডাক দিমু?

—না থাক্। আমি বরং কাল সকলেই একবার আসবো।

আমাদের কথোপকথন শুনে দিদি জেগে গেল এবং ছেলেকে বলল, কেডা আইছে রে অরুণ?

—মামা আইছে মা, মামা। কলেজে পড়ে হেই মামা।

—আমারে ডাকছস্ না কে রে?

—মামাঅই না করছে আর কইছে কালকা সকালে নাকি আইব মামা।

দিদি উঠে বসল এবং ছেলেকে ডেকে বলল, অরুণ তর মামারে একটা পিঁড়ি দে বইত। আবার আমাকে ডেকে বলল, ভাই আইঅ ঘরে আইঅ। এত রাইতে আবার আইছ কেন? ভাই বার্লি খাইছি, অষুধ খাইছি। অহনে জ্বরটা একটু কম। রাইতটা ভালা কাডাইতে পারলেঅই কালকা সকালে তোমার এইখানে যামু।

—দিদি, আমি সে জন্য আসিনি, তোমার জন্য একহালি কমলা এনেছি। তাই দিতে এলাম। জ্বরের মুখে কমলা খেলে মুখে রুচি আসবে।

—আবার কমলা আনতা গেলা কেন্? তোমরাইত চলতা পার না। আমারে কমলা দিওন লাগত না। তোমরাঅই দুইভাইয়ে খাইয়া লাইঅ।

—তোমার জন্য এনেছি তুমিই খাবে। কমলা খেলে মুখে ঠিকই রুচি আসবে।

—তাঅইলে দুইডা দেও আর দুইডা তোমরা দুইভাই খাইও।

—ঠিক আছে, তোমার যেমন ইচ্ছে।

দিদির শরীর ভাল হতে হতে দুই তিনদিন লেগে গেল। এরই মধ্যে আমি দুই বেলা গিয়ে দেখে আসতাম। কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করতাম।

কাজের দিদি আসতে পারেনি বলে আমি কলতলায় বসে থালা বাসন, ডেগ কড়াই ধুচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি দিদি এসে উপস্থিত। দিদি আমাকে কলতলায় এঁটো বাসন ধুতে দেখেই বলল, ভাই তুমি উইড্ডা যাও। আমিই আইছি। আমিই অহন সব করুম। তুমি গিয়া পড়তা বউ।

—দিদি তোমার শরীর ভাল হয়েছে তো?

—হ-অ-অ। আমরা এমনই থাকুম। তুমি গিয়া ভাই পড়াশোনা কর। আমিই ত অহন আইছি। এই কয়দিন ত বালাঅই কষ্ট করছো। একদিগে রান্নাবান্না, পড়াশোনা আবার টিউশনি ও আবার কলেজেও গেছ। কত কষ্টঅই না করছো ভাই। আর করন লাগদো না। এইবার পড়গা, যাও।

আমি পড়তে বসেছি। কিছুক্ষণ পড়াশোনা করার পরই সাথে সাথে লিখি। এটাই আমার অভ্যাস। তাই কিছু একটা লিখতে বসে মন দিয়ে লিখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘরের সামনে উঠোনে কী একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো, শব্দটা বেশ ভারি বলেই মনে হলো। তাই পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠোনের দিকে তাকাতে তাকাতে বের হলাম। দেখি, দিদি একটা মাটির কলসি কোলে নিয়ে উঠোনে বসে আছে। আমি দিদিকে তৎক্ষণাৎ জিগ্যেস করলাম, দিদি, তুমি কলসিটা নিয়ে পড়ে গেছ নাকি?

—হ-অ-অ ভাই, এই ইট্টার মধ্যে পাওডা লাইগ্যা তাওড়াইয়া পইড়া যাইতাছিলাম। কলসটা পইড়া ভাইঙা যাইব মনে কইরা তাড়াতাড়ি কলসটা কোলে লইয়াই বইয়া গেলাম।

কলসটা ভাঙছে না ভাই। একটা কলসের ত আর দাম কম না!

—দিদি যে কী বলো! একটি কলসি কি আর আনা যেত না। তুমি যে ব্যথা পেলে! তোমার ব্যথার চেয়ে কলসির দামটা কী বেশি হলো?

—তবুও তো ভাই তোমার কিছু পইসা খোয়ানি যাইত। আবার একটা কলস কিন্না আনলা অইলে।

—তাতে কী হয়েছে। তুমি যে তোমার হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছো। হাঁটুর দেখি ছড় উঠে গেছে। রক্তও বেরোচ্ছে!

—এইডা কিচ্ছু হইত না। একটা মইরচাপাতা রগড়াইয়া তার কষটা দিলেই রক্ত পড়া বন্ধ অইয়া যাইব।

—আর তুমি যে ব্যথা পেয়েছো? কষ্ট পেয়েছে?

—ইডা কী অইছে। যে ভাই আমার অসুখের সময় দুইবেলা আমারে দেইখ্যা আইত আর মুখে রুচি আওনের লাইগ্যা আমারে কমলা কিইন্যা দিতে পারে, হেই ভাই-এর লাইগ্যা এই টুকুন কষ্ট করতাম পারতাম না!

চুনী দাশ
ইঁদুরের গর্ত

এক

জটিলেশ্বর প্রসাদ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। একমাত্র ছেলে বিদেশে থাকে। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে। সেখানেই সে এক সহকর্মীর পাণিগ্রহণ করেছে। কখন দেশে ফিরবে বা আদৌ দেশে ফিরবে কিনা—নিশ্চয়তা নেই।

জটিলেশ্বর প্রসাদ এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তবে গিন্নি এখনও চলাফেরায় সক্ষম। সাবলীল। খেতখামার গরুবাছুর দেখার জন্যে মুনিশ আছে।

জটিলেশ্বর প্রসাদের আসল ব্যবসা সুদের-ব্যবসা। সোনা-গয়না বাড়িঘর খেতখামার বন্ধক রেখে তিনি সুদে টাকা ধার দেন। ছেলের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও জটিলেশ্বর প্রসাদ সুদের ব্যবসা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি।

টাকাপয়সা তিনি শহরের ব্যাঙ্কে রাখেন। তার বাড়ি থেকে শহর বেশি দূরে নয়। রিক্সায় বা অটোতে যাতায়াত সহজ। বার্ধক্যে পীড়িত হবার দরুণ জটিলেশ্বর প্রসাদ আজকাল আর শহরে বড় একটা যেতে পারেন না। কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে দূরসম্পর্কের এক ভাইপোর'পরেই তিনি নির্ভরশীল। ছেলেটি খুবই বিশ্বস্ত এবং অমায়িক। পড়শিও। সে-ই এখন জটিলেশ্বর প্রসাদের সমস্ত টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া বা তোলার কাজ করে থাকে। সইসাবুদ দিয়েই তিনি খালাস।

কিন্তু ইদানিং এই পড়শি ভাইপোর বিভিন্ন কার্যকলাপে সেই বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। যা এখন তাকে এবং তার সহধর্মিণীকে রাতদিন ভাবিয়ে তুলেছে। যার ফলশ্রুতিতে দু'জনেরই ব্লাডসুগার, প্রেসার ও হার্টের গোলমাল দেখা দিয়েছে।

জটিলেশ্বর প্রসাদ যে গৃহে বসবাস করেন তা অতি সাধারণ। গ্রাম্য-ঘরদোর। মেটোভিটি। টিনের ছাউনি। যে কক্ষে ওরা থাকেন সে কক্ষটির এক কোণে বাঁশের গড়া মাচার'পরে চাল রাখার ডোল। মরশুমে জটিলেশ্বর প্রসাদ সংবৎসরের চাল এই ডোলে মজুত করে রাখেন। এটি তার অনেক দিনের দস্তুর।

একদিন জটিলেশ্বর প্রসাদ খেয়েদেয়ে আরাম করছেন, অমন সময় চালের ডোলের মাচার নিচে তার চোখ যায়। তিনি দেখেন, সেখানে স্তূপীকৃত ইঁদুরের মাটি, যার মধ্যিখানে একটা বেশ বড়সড় গর্ত। সেই গর্তের মুখে একটা ইঁদুর উঁকি দিয়ে আছে আর গোঁফ নাড়ছে।

সেই গর্ত চোখে পড়তেই জটিলেশ্বর প্রসাদের মাথায় একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল। অমনি তিনি গিন্নিকে কাছে ডেকে কানে কানে তা বিবৃত করলেন। বুদ্ধিটা গিন্নিরও মনঃপূত হল। তাই পরের দিন চানটান করে খেয়েদেয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা জপতে জপতে স্বামী স্ত্রী দু'জনই শহরে গেলেন। গিয়ে এক অতি পরিচিত স্যাকরার দোকানে দামদর ঠিকঠাক করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ছোট আকারের বেশ ক'টা সোনার-বার কিনে বাড়ি ফিরলেন। এবং তা রাতের অন্ধকারে টর্চের আলোয়

কর্তাগিন্নি মিলে চুপি চুপি সযতনে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই থেকে জটিলেশ্বর প্রসাদ আর ভাইপোর শরণাপন্ন হন না। মাঝে মধ্যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার বদলে কর্তাগিন্নি নিজেরাই শহরে গিয়ে সোনার-বার কিনে আনেন এবং তা এই ইঁদুরের গর্তে চুপিসারে লুকিয়ে রাখেন।

পড়শি সেই অমায়িক ভাইপো বেশ ক'বারই নানা কারবারের অছিলায় লাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে জেঠুর মোটা অঙ্কের টাকায় দাঁও মারতে সক্ষম হয়েছে। আবারও একটা জুতসই লাভজনক ব্যবসার আযাঢ়ে-গপ্‌পো ফেঁদে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের ফন্দি এঁটে ভাইপো জেঠুর কাছে এসে হাত পাতলে, জেঠু জটিলেশ্বর প্রসাদ অত্যন্ত শান্তভাবে স্নেহশীল কণ্ঠে বললেন, তোর দাদা মুম্বেতে একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্যে টাকা চাওয়ায়—ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। এখন থেকে মাসে মাসেও টাকা পাঠাতে হবে।

জেঠুর কথা শুনে ভাইপো যেন বিদ্যুতের ছোবল খেল! কিন্তু তা আচারে-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র প্রকাশ হতে না দিয়ে বিক্ষুব্ধ-মনে বিষণ্ণ-চিত্তে সেইদিনই শহরে গিয়ে জেঠুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে খোঁজ নিয়ে জানল, অ্যাকাউন্টে সত্যি সত্যি টাকা নেই!

এদিকে হয়েছে কী, ইঁদুরের লোভে সেই গর্তে এসে ঢুকেছে এক কেউটে সাপ। তাই না দেখে ভয়ে বিহ্বল গিন্নি 'সাপ-সাপ' বলে চিৎকার জুড়তেই তা জটিলেশ্বর প্রসাদের কানে গেল। তিনি পড়িমরি করে ছুটে এসে গিন্নিকে শুধালেন, কোথায় সাপ?

গিন্নি আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, ওই তো ইঁদুরের গর্তে ঢুকছে!

তখনও সাপের লেজটা দেখা যাচ্ছিল। তা দেখে জটিলেশ্বর প্রসাদ গিন্নিকে সাবধান করে আস্তে আস্তে বললেন, চুপ! আর সাপ উচ্চারণ করো না! বিপদ হবে!

'সাপ-সাপ' চিৎকার শুনে ততক্ষণে পড়শিরা লাঠিসোঁটা নিয়ে অনেকেই এসে পড়েছে। তারা এসে জানতে চাইছে, কোথায় সাপ?

পাশের কচুগড়টা দেখিয়ে জটিলেশ্বর প্রসাদ শান্ত গলায় পড়শিদের বললেন, তেমন কিছু না, একটা ধোড়াসাপ ঐ কচুগড়টার মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

সবাই চলে গেলে জটিলেশ্বর প্রসাদ গিন্নিকে ডেকে বললেন, এখনই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! লোকগুলো ইঁদুরের গর্তে ফুটন্ত জল ঢেলে ঢেলে সাপটাকে মারত বা আধমরা করে কোদাল খন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করত। আর সেই সাথে লুকনো সোনার-বারগুলোও বেরিয়ে আসত। অল্পের জন্যে ঠাকুর এ যাত্রা রক্ষে করলেন।

সেই কেউটে এখন ঘরের ভেতর সেই ইঁদুরের গর্তেই আস্তানা গেড়েছে। জটিলেশ্বর প্রসাদ এখন এই বিষধর সাপকে নিয়েই ঘর করেন। আর রাতদিন কাতর ভাবে ঠাকুরকে ডাকেন, এই ইঁদুরের গর্ত দখলমুক্ত করে দিতে সাপকে সুমতি দেবার জন্যে।

দুই

নাম-না-জানা এক রাজ্যের এক মন্ত্রী বহু বছর ধরে মন্ত্রীত্বের আসন দখল করে আছেন। মানুষের জন্য একদিন তিনি রাজনীতিতে পদার্পণ করেছিলেন, না নিজের জন্যে, অর্থাৎ অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে কিনা, আজ আর তা তিনি মনেও করতে পারেন না। তার একমাত্র ছেলে অকালকুষ্মাণ্ড। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে—মন্ত্রীত্বের প্রভাব খাটিয়ে—তিন তিনবার মাধ্যমিকের টেস্টে ডাব্বামারা ছেলেকে শেষপর্যন্ত একটা মাধ্যমিক পাশ শংসাপত্র জোগাড় করে দিতে পেরেছেন বটে, কিন্তু এই বিদ্যের দৌলতে ফাইভস্টার হোটেলের স্ট্যাণ্ডার্ডে অভ্যস্ত ছেলেকে অমন কোন চাকরি পাইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, যার কল্যাণে সে সুখভোগের মানদণ্ড বজায় রেখে আজীবন চলতে সক্ষম হবে। ছেলের আবার তিন ম-তেই সমান আসক্তি। সাঙ্গোপাঙ্গগুলোও জুটিয়েছে তথৈবচ। এ হেন সুপুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মন্ত্রীবাহাদুর— চাকরি, প্রমোশন, ট্রেন্সফার, সরকারি ঋণ ইত্যাদি পাইয়ে-দেওয়ার যাবতীয় ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য সেই উৎকোচ সাগর থেকে নদনদী খালনালা বাহিত হয়ে বাড়ির ময়লাজল নিষ্কাশনের ড্রেইনের মাধ্যমে তাঁর স্বহস্তে এসে পৌঁছয়। যা কস্মিকালেও কারও বোঝার উপায় নেই যে, সাগরের পানি শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে হস্তান্তরিত হয়ে বিলীন হয়। তাছাড়া সময় সময় উনি মওকা বুঝে অর্থ সংগ্রহের জন্যে কৌশলে নানা ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেও চেলাচামুণ্ডাদের উৎসাহিত করে থাকেন। সেই উৎসব-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্যে চাঁদা তোলেন। নিমক প্রত্যাশীদের কাছ থেকেও মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করেন। দু'লাখ টাকা খরচের অনুষ্ঠানের জন্যে পঞ্চাশ লাখ টাকা সংগ্রহ করার চমক প্রচারিত হয়। কারও তো আর হিসেব নেবার মাথাব্যথা নেই, তাই উদ্বৃত্ত অর্থ মন্ত্রীবাহাদুরের তহবিলে জমা হতে থাকে। গোপনে। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়-মাধ্যমে তিনি কুষ্মাণ্ড ছেলের ভবিষ্যৎ-আর্থিক-নিরাপত্তা বিধানে সদা ব্যতিব্যস্ত। তদুপরি ছেলেকে ঘরে বাঁধার জন্যে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকেও বিছেহারের মতন ষাঁড়ের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মের ষাঁড় কি গোয়ালঘরে বেঁধে রাখা যায়?

যা হোক, ছেলেবৌ এখন অন্তঃস্বত্ত্বা। সনোগ্রাফির মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ যদিও দণ্ডনীয় অপরাধ, তবু মন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধর একটি পুংলিঙ্গই বটে। অর্থাৎ তিনি একটি নাতির দাদু হতে চলেছেন। ইদানিং তাই তাঁর অর্থ সংগ্রহের লালসা আগুনের লেলিহান জিহ্বার মতন বেড়ে চলেছে।

সেই পর্বত-প্রমাণ অর্থ তিনি বহু আগ থেকেই বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বেনামে জমিয়ে যাচ্ছেন। যাতে কোন কাকপক্ষীও টের না পায়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটি পঞ্চমমান উত্তীর্ণ ছেলেকে নিজের ছেলের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিপালন করে আসছেন। যে বর্তমানে ছেলেমেয়ের পিতা হয়ে মাঝ বয়সে বিচরণ করছে। তিনি ইচ্ছে করলেই সেই ছেলেকে অষ্টমমান পাশ শংসাপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে একটা সরকারি চাকরির পাকা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই করেননি। ময়নার গান বা ময়নাকে শেখানো বুলি শুনতে হলে ময়নাকে খাঁচাবন্দি করেই রাখতে হয় এবং ওকে নানা লোভনীয় খাবার দিয়ে পুষতে হয়! মন্ত্রী তাই ছেলেটিকে তেমন ভাবেই পুষে চলেছেন। খাঁচা ভেঙে যাতে না পালাতে পারে, লোহা দিয়ে খাঁচা গড়িয়ে নিয়ে সে ব্যবস্থাও তিনি পাকা করে

রেখেছেন। কারণ, সে-ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী ব্যক্তি যে মন্ত্রীর গুপ্তঅর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা দেয় ও তুলে আনে, যা নিজের কুষ্মাণ্ড ছেলেকেও জানতে দিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কোন্ ব্যাঙ্কে কত টাকা তা ব্যাঙ্কের পাশবইয়েই উল্লেখ থাকে। তখন একাধিক ব্যাঙ্কে একাধিক বেনামি অ্যাকাউন্ট অতি অনায়াসেই খোলা যেত। কারণ, তখন অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনো ফটো লাগত না। মন্ত্রীবাহাদুর শুধু—যে যে ব্যাঙ্কে—যে যে নামে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন—সেই সেই নামের নমুনা সইগুলো গোপনকক্ষে অতি গোপনস্থানে সযত্নে তুলে রেখেছেন। টাকা তোলার সময় সেই সমস্ত সই দেখে দেখে—পুনঃ পুনঃ আলাদা কাগজে লিখে লিখে—তারপর চেকে-এ সই করেন, যাতে সই-এ হেরফের না হয়।

কিছুদিন হল রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। ফলও এরমধ্যে ঘোষিত হয়ে গেছে। তাঁর দলের ভরাডুবি হয়েছে। তিনি নিজেও গো-হারা হেরেছেন। এখন পত্রপত্রিকায় তাঁর দলের নানা অপকর্মের বিচিত্র কাহিনি ফলাও করে প্রচারিত হতেও শুরু করেছে। তাঁর নিজের কীর্তিকলাপও এখন চারদিকে ছড়াচ্ছে। লেট্রিনের ট্যাঙ্কের ঢাকনায় যেন ফাটল ধরেছে! দুর্গন্ধ আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না!

কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর নাদুসনুদুস চেহারা ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম অন্তর্হিত হয়েছে। ব্লাডসুগার, হাইপ্রেসার, বদহজম, হার্টের গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সময় বুঝে বার্ধক্যজনিত উপসর্গগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিছু লিখতে গেলে পারেন না। এঁকেবেঁকে যায়। হাত কাঁপে। আঙুল কাঁপে। এ অবস্থা বহিঃরাজ্যে গিয়ে সুচিকিৎসা না করালেই নয়। এখন তো আর সরকারি সুযোগ সুবিধে নেই! অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থে ঠ্যাঙের'পর ঠ্যাং তুলে রাজসুখ ভোগ করার উপায় নেই! তাই সইসাবুদ করে টাকা তোলার জন্য ছেলেটিকে একটা ব্যাঙ্কে পাঠালেন। ছেলেটি ফিরে এসে জানাল, সই না মেলার জন্যে ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দিয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী ছেলেটিকে আবার অন্য একটা ব্যাঙ্কে পাঠালেন। সেই ব্যাঙ্ক থেকেও ফিরে এসে ছেলেটি জানাল, সই মেলেনি বলে ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দিয়েছে।

এইভাবে ছেলেটিকে একে একে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই পাঠানো হল, যে সব ব্যাঙ্কে তিনি বেনামিতে টাকা জমিয়েছিলেন। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক থেকেই সই না মেলার জন্যে চেক ফেরৎ এল!

প্রাক্তন মন্ত্রীবাহাদুর এতে ভীষণ ভেঙে পড়লেন। এ ব্যাপারে তো তিনি কারও সাহায্যও নিতে পারছেন না, কাউকে বলতেও পারছেন না! মনের জ্বালাযন্ত্রণায় তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে চাইলেন; কিন্তু তাও যে তিনি পারছেন না!

এইভাবে কিছুদিন তিনি স্থবিরের মতন কাটিয়ে শেষে অগতির গতি ঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন। এবং যোগাসন-প্রাণায়ামে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন, যাতে হাতের কম্পন বন্ধ হয়, আঙুল দিয়ে কলম ধরতে পারেন, আর বেনামি নামগুলো ঠিক মতন সই করতে পারেন।

চেনম্যান

নির্মলবাবু একজন স্কুল শিক্ষক। ওর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটি চেন্নাই-এ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। আর মেয়েটি দিল্লির একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। সংসার চালিয়ে ওদের পড়াশুনোর ব্যয়ভার বহন—নির্মলবাবুর কষ্টসাধ্য। স্কুলের পরই তাই তিনি ট্যুইশান করেন। তবু মাঝে মধ্যে জরুরি প্রয়োজনে বন্ধু রামধনবাবুর কাছে টাকার জন্যে ওকে সাময়িক হাত পাততেই হয়। ধার-দেনা যদিও নির্মলবাবুর বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ।

সেদিন ছিল স্কুল ছুটি। মেয়ের ফোন পেয়ে দু'হাজার টাকার জন্যে নির্মলবাবুকে বন্ধুবর রামধনবাবুর বাড়ি যেতেই হল। সকালে। বন্ধুকে দেখে হৃষ্টচিত্তে রামধনবাবু বলতে লাগলেন, আরে নিমু যে, আয় আয়! আজকাল তো আর তোকে দেখতেই পাই না! আসা-যাওয়া একদম বন্ধ করে দিয়েছিস!

সেই সঙ্গে গিন্নিকেও ডেকে বললেন, দেখ এসে, কে এসেছে?

নির্মলবাবু গিয়ে বন্ধুর পাশে বসলেন। তারপর গল্পগুজবে দুই বন্ধু ডুবে গেলেন। জলখাবার এল। দুই প্রস্ত চাও শেষ হল। গালগল্প চলতেই থাকল।

নির্মলবাবু ও রামধনবাবু দু'জন বাল্যবন্ধু। পাঠশালার সহপাঠী। নির্মলবাবু স্কুলে বরাবরই ফার্স্ট হতেন। আর রামধনবাবু টেনেটুনে কোনরকম খেলোয়াড় হিসেবে বিশেষ বিবেচনায় প্রমোশন পেতেন। নির্মলবাবু যখন অনার্স সহ বি কম পাশ করে সেই স্কুলেই শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন, তখনও রামধনবাবু ধৈর্যের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন। যা হোক, শেষপর্যন্ত নির্মলবাবুর ঐকান্তিক প্রাইভেট-কোচিং-এর রামঠেলায় রামধনবাবু মাধ্যমিক শংসাপত্রের অধিকারী হলেন। তারপর রামধনবাবু আর সরস্বতী দেবীর আশিসের আশায় দিনপাত না করে লক্ষ্মীঠাকুরুনের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। জায়গা-জমির ব্যবসা ফেঁদে রামধনবাবু এখন কোটিপতি এবং সে অঞ্চলে একজন প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি।

গালগল্পের ফাঁকে আজও আবার রামধনবাবু নির্মলবাবুকে অনুনয় করে বললেন, তোকে কত বললাম, আমাকে সাথ দিতে, আমাকে সাহায্য করতে, আমার সঙ্গে জায়গা-জমির ব্যবসায় লেগে যেতে। কিন্তু তোর দিক থেকে আজ অবধি কোন সাড়াই পেলাম না! আজও আবার বলছি, ব্যবসার অংশ—তোর অর্ধেক আমার অর্ধেক। লভ্যাংশের ফিফটি ফিফটি। তোর পঞ্চাশ আমার পঞ্চাশ। লোকসান হলে—সব আমার। একবার কাজে লেগে দেখ, টাকাপয়সার আর অভাবই থাকবে না। চারদিকে কেবল টাকা আর টাকা—শুধু টাকারই খেলা! তোর মতন অমন একজন বিশ্বস্ত মেধাবী বন্ধুকে পার্টনার হিসেবে পেলে—আমাকে আর আটকায় কোন্ বান্দা!

নির্মলবাবু জবাবে বললেন, জায়গা-জমির ব্যবসা কি চাট্টিখানি কথা! আমার বাড়ির পরচার একটা ভুল সংশোধন করতেই কোষ্ঠরোগীর মাংসের টুকরোর মতন পাঁচ-পাঁচটা বছর আমার জীবন থেকে খসে পড়ল! তহসিল অফিস, ডি সি এম অফিস, এস ডি এম অফিস, ডি এম অফিসে—নাইন্টি ফাইভ রুল মোতাবেক সেই ভুল সংশোধন করার জন্যে ঘুরতে ঘুরতে আমার

জানের নাইন্টি ফাইভ পারসেন্টের দফারফা! বাপ রে বাপ! জায়গা-জমির ব্যবসা পাগল ছাড়া কেউ করে?

নির্মলবাবুর আক্ষেপ শুনে রামধনবাবু হেসে হেসে বললেন, এসব তোর কিছুই করতে হবে না। আমাকেও করতে হয় না। টাকাই সব করবে। টাকাই টাকার টোপ। বড়শিতে গাঁথা মাছের টোপের মতন। সেই টোপই অথৈ জলের গভীর থেকে টাকা গেঁথে আনবে।

তা কী করে সম্ভব? কৌতূহলী হয়ে নির্মলবাবু জিগ্যেস করলেন।

তাহলে বলি শোন। রামধনবাবু বন্ধুকে বলতে শুরু করলেন ঃ

যে তহসিলের আওতায় জায়গা-জমি সেই তহসিলের একজন চেনম্যানের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় এবং তা পরে আস্তে আস্তে দৃঢ় করতে হয়। জায়গা-জমির পরিমাণ ও অবস্থা অনুসারে ওর সঙ্গে লেনদেনের রফা পাকা করতে হয়। সেই চেনম্যানই সেই তহসিলের তহসিলদার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলে রফা করবেন। তহসিলদারের সঙ্গে তোরও সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেবেন। তহসিলদারের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে পাক্কা কথাবার্তা হয়ে গেলে, সেই তহসিলদার, ডি সি এম অফিসের ইন্সপেক্টার, বড়বাবু ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মীর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেবেন। লেনদেনের ব্যাপারটাও অনুঘটকের মতন পাকাপোক্ত করে দেবেন। সম্ভাব্যস্থলে ডি সি এম-এর সঙ্গেও সরাসরি কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন। সেই ইন্সপেক্টার ও বড়বাবু এস ডি এম, ডি এম অফিসের জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিভাগে কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে লাইন করে দেবেন। সম্ভাব্যস্থলে যে অফিসার ডি এম-এর পক্ষে শুনানির মাধ্যমে বিচার বিবেচনা করে ডি এম-এর আদেশনামার অনুলিপি লিপিবদ্ধ করেন, তার সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবেন। কার্যসিদ্ধি হলে লেনদেনের বিলিবণ্টনও ওদের মধ্যেই কেউ না কেউ দায়িত্বের সঙ্গে সমাধা করে থাকেন। এটা ওদেরও একটা লোভনীয় লাভজনক গোপন ব্যবসা। শেকলে গাঁথা আংটার মতন একেব সঙ্গে অন্যে বন্ধনযুক্ত। চেনম্যান শেকল টেনে জায়গা জমি পরিমাণ করে থাকেন, আবার ভূমিসংক্রন্ত যাবতীয় ভেজালবাট্টার নিষ্পত্তি চেন টেনে টেনেই লেনদেনের মাধ্যমে তহসিল অফিস টু ডি এম অফিস পর্যন্ত সেই চেনম্যানই সম্পন্নও করে থাকেন।

তারপর ভেজালপূর্ণ জায়গা-জমি জলের দরে কিনে ওদেরই চেনের কারসাজির দৌলতে পরিশুদ্ধ কাগজপত্র বের করে—আকাশছোঁয়া মূল্যে বিক্রি করার সুযোগও ওরাই সৃষ্টি করে দেন। কেউ কেউ আবার নানা বিপদে-আপদে পড়েও অনেক কম দামে জায়গা-জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়। এসবের খোঁজখবর সবই ওদের নখদর্পণে। তদুপরি, নির্ভেজাল জায়গা-জমিতে ভেজাল মিশিয়ে দিতেও ওরা সিদ্ধহস্ত। প্রকৃত মালিকেব দখল থেকে জায়গা-জমি ছিনিয়ে আনতেও ওরা ওস্তাদ। প্রয়োজনে ওদের পছন্দের উকিল নিয়োজিত করে প্রকৃত মালিকের বিপক্ষে 'রায়' বের করে আনতেও ওরা পারদর্শী। ওরাই সমস্ত ঝুট-ঝামেলা-হুজ্জতি পোহাবেন। দরকারে মস্তানের ব্যবস্থাও করবেন। মস্তানরা প্রায়শই প্রভাবশালী নেতা মন্ত্রীর সঙ্গে চেনযুক্ত থাকে। যার যে কাজ ওরা চেনের আংটার মতন পর পর সমাধান করে করে এগিয়ে যান এবং কার্য সম্পন্ন করে

থাকেন। অবশ্য সবই অর্থের বিনিময়ে। টাকাই টাকা আনে। টাকাই টাকার টোপ। বড়শিতে গাঁথা মাছের টোপের মতন। তাছাড়া আমি তো রয়েছিই। তোকে এসবের কিছুই করতে হবে না, ভাবতে হবে না। তহসিল অফিস থেকে ডি এম অফিস পর্যন্ত শক্ত মজবুত চেন তো আমার গড়াই আছে। যার ফলে আমি জায়গা-জমির ব্যবসা ফেঁদে—দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে—গোঁফে তা দিয়ে—সমাজে একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে দিন গুজরান করছি।

আবারও বলছি, একটু ভেবে দেখ, আমার সঙ্গে জায়গা-জমির ব্যবসার সঙ্গী হ। লভ্যাংশের ফিফটি ফিফটি। তোর পঞ্চাশ আমার পঞ্চাশ। লোকসানের অংশ সব আমার। জায়গা-জমির কারবারে লোকসান হয় না হে বন্ধু! অন্তত আমার তো আজ পর্যন্তও হয়নি। লাভের তুলনায় চেনম্যানদের যৎসামান্যই দক্ষিণা দিতে হয়। শৈবালের ডগা থেকে রোদ্দুরে বাষ্প হয়ে উবে যাওয়া মাত্র কয়েক ফোঁটা শিশির বই—বেশি কিছু নয়। সরোবরের সমস্ত জল তো পড়েই থাকে।

নির্মলবাবু এতক্ষণ বন্ধুবর রামধনবাবুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে মনে মনে ভাবছিলেন, শিক্ষক আছি, দিব্যি আছি, ভালো আছি, বেশ আছি, বড়ো শান্তিতে আছি। সাধ্যমত ছাত্রছাত্রীদের সৎভাবে বিদ্যা বিতরণ করি, সৎপথের সন্ধান দিই, সৎ হতে উপদেশ দিই। সুনাগরিক হতে, মানুষ হতে, সৎচিন্তা করতে উদ্বেলিত করি। ভ্রষ্টাচার নষ্টাচার অন্যায় অবিচার অত্যাচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সঞ্জীবিত করি। আমার পক্ষে অর্থের জন্যে চেনম্যানের শেকলের আংটায় বন্দি হওয়া যে মৃত্যুতুল্য!

কিন্তু মুখে নির্মলবাবু এব্যাপারে টু-শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। যে জন্যে আসা—সেই টাকাও আর চাইলেন না। মুখে হাসি টেনে বললেন, এবার উঠি রে রামু, আজ অনেকদিন পর অনেকক্ষণ দুই বন্ধুতে আড্ডামারা গেল। এই বলে বিদেয় নিয়ে নির্মলবাবু বাড়ি ফিরে গেলেন।

বাড়ি এসে নির্মলবাবু গিন্নিকে সব কথা খুলে বললেন। রামধনবাবুর কাছে যে ধার চাইতে আজ ওর বিবেকে সায় দিল না, সেকথাও অনুতাপের সঙ্গে গিন্নিকে জানালেন।

সব শুনে গিন্নি নির্মলবাবুকে আশ্বস্ত করে বললেন, এ জন্যে ভাবছ? এখনই আমি তোমার টাকার জোগাড় করে দিচ্ছি।

এই বলে তিনি উঠে গিয়ে আলমারি খুলে ওর কিছু স্বর্ণালংকার নির্মলবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ওগুলো ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে এসো।

মা'র গল্প

এক

ক'দিন ধরেই মা তাগাদা দিচ্ছেন, তোর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আর তো মাত্র মাসখানেক বাকি, ঠাকুরমশাইকে একটু খবর দে। বাবা গত হয়েছেন, তখন প্রায় এক বছর হতে চলল।

পরের রোববারই ঠাকুরমশাই মানে পুরোহিত রমণীমোহন চক্রবর্তীকে খবর দিতে গেলাম। যোগেন্দ্রনগর। যোগেন্দ্রনগর আমাদের বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটারের মতন। গিয়ে বললাম, ঠাকুরভাই, বাবার বার্ষিক শ্রাদ্ধের তো আর বেশি দেরি নেই, আপনি এরমধ্যে একদিন সময় করে আমাদের বাড়ি আসুন। দিনক্ষণ ঠিক করে ও কী কী আয়োজনপত্র করার দরকার, জানিয়ে দিয়ে যান। শ্রাদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের একটা ফর্দও লিখে নিয়ে যাবেন, যাতে আমি সেসব এরমধ্যে জোগাড় করে রাখতে পারি।

তিন চারদিন পরই পুরোহিতমশাই আমাদের বাড়ি এলেন। তখন মাত্র ভোরের রোদ্দুর চারদিকে ছড়িয়েছে। প্রাতঃভ্রমণ সেরে মানুষেরা ঘরে ফিরছে।

পুরোহিতমশাইকে আমি একটা চেয়ার এগিয়ে বসতে দিলাম। মাও একটা মোড়া টেনে পুরোহিতমশাইয়ের কাছে এসে বসলেন। পুরোহিতমশাই বাবার বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিনক্ষণ জানালেন। আমার হাতে শ্রাদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের একটা ফর্দও তুলে দিলেন। সেই ফর্দটাতে চোখ বুলিয়েই চিন্তায় পড়ে গেলাম! আমার শিক্ষকতার এক মাসের সামান্য বেতনেও যে তা সংকুলান হবার নয়! ধারদেনা করে কার্যসম্পাদন করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু কেমন করে যে পরিবারপরিজনদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে সে ঋণের বোঝা লাঘব করব—ভেবে ভেবে আর কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না!

আচ্ছা ঠাকুরভাই, এই বার্ষিক শ্রাদ্ধ কি প্রতি বছরই করতে হয়? পুরোহিতমশাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ, প্রতি বছরই মৃত পিতামাতার আত্মার পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টির জন্যে ছেলের এই বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা বিধেয়। তাছাড়া মৃতের আত্মা অভুক্ত থাকে ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ গয়া, কাশী বা হরিদ্বার গিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে গঙ্গায় পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে আর বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হয় না। তখন মৃতের আত্মাকে সেই বাড়ির চতুঃপার্শ্বের গণ্ডির মধ্যে আর বন্দি থাকতে হয় না। আত্মা মুক্তিলাভ করে ও স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে এই কথাই বলে। পুরোহিত রমণীমোহন চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করে বললেন।

যাদের ছেলে নেই, তাদের আত্মার কী গতি হবে? আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম।

নিকটতম আত্মীয়স্বজনও এসব শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অধিকারী, তিনি বললেন।

গয়া, কাশী বা হরিদ্বার এই তিনস্থানের প্রত্যেকটি স্থানে গিয়েই কি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে পিণ্ডদান

ও তর্পণক্রিয়া করার শাস্ত্রীয় বিধান? আমি সবিনয়ে জিগ্যেস করলাম।

পুরোহিতমশাই জবাবে বললেন, গয়া অথবা কাশী অথবা হরিদ্বার এই তিন পবিত্র স্থানের যে কোন একটি স্থানে গিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করে পিণ্ডদান ও তর্পণয়াদি ক্রিয়া সম্পাদন করলেই হবে। তাতেই মৃতের আত্মার মুক্তিলাভ ঘটবে, আত্মা সদ্গতি প্রাপ্ত হবে, স্বর্গলাভ করবে। কেউ কেউ অবশ্য এই তিন পবিত্রস্থানের প্রত্যেক স্থানে গিয়েই এসব ক্রিয়াকাণ্ড করে আত্ম‍ৃ ' ‍্ত লাভ করে।

এবারই যদি গয়া বা কাশী বা হরিদ্বার যেতে পারি, তবে কি এই বার্ষিক শ্রাদ্ধের নির্দিষ্ট দিনক্ষণের মধ্যেই সেখানে গিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হবে? আমি জানতে চাইলাম।

না, তখন তা এই নির্দিষ্ট দিনক্ষণের মধ্যে না করলেও চলবে। তবে, পরের বৎসরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনক্ষণের পূর্বে অবশ্যই এই তিন পবিত্র স্থানের অন্তত একটি স্থানে গিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করতে হবে। শাস্ত্রে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তিনি বললেন।

মা পুরোহিতমশাইয়ের জলযোগের আয়োজন করলেন। পুরোহিতমশাই এই জলযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন করে বিদায় নিতে প্রস্তুত হলে আমি সবিনয়ে বললাম, আপনার প্রদত্ত ফর্দ অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করে যথাসময়ে আমি আপনাকে খবর দিয়ে আসব।

পুরোহিতমশাই হৃষ্টচিত্তে গমন করলেন।

পুরোহিতমশাই আমাদের বাড়ির চৌহদ্দি পার হতেই মাকে বললাম, মা, বাবার শেষক্রিয়া সম্পন্ন করতে গয়া, কাশী বা হরিদ্বার এই তিনস্থানের প্রত্যেক স্থানেই কি যাওয়া উত্তম মনে কর?

ঠাকুরমশাই যখন বলেছেন, গয়া, কাশী, হরিদ্বারের মধ্যে যে কোন একটি স্থানে গেলেই হয়, তবে একটি স্থানে যাওয়াই তো ভালো। আমার এই বয়সে এই তিনটি স্থানেই গিয়ে ক্রিয়াকর্ম করার মতন ধকল আমি কি সইতে পারব বাবা?

এই স্থানগুলোর মধ্যে কোন্ স্থানটি তুমি অতি উত্তম মনে কর? আমি মা'র কাছে জানতে চাইলাম।

হরিদ্বারের সন্নিকটেই তো গঙ্গার উৎপত্তিস্থল। তোর বাবাও হরিদ্বারকে অতি উত্তম ও পবিত্র ধর্মস্থান মনে করতেন। যদি পারিস বাবা, হরিদ্বারই চল, মা বললেন।

মা'র বাক্য শ্রবণ করে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। গয়া-কাশীর পাণ্ডাদের যা দৌরাত্ম্য আর উৎপাতের কথা শুনেছি, সেখানে যেতে বুক ধড়ফড় করে, পা কাঁপে। বিশেষ করে গয়ার পাণ্ডাদের উৎপীড়ন নাকি বর্ণনাতীত।

মা'র স্নেহকোমল মনকে আকৃষ্ট করার জন্যে মা'র আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, বাবার আত্মাকে আর বাড়ির গণ্ডির মধ্যে বন্দি করে রেখে কষ্ট না দিয়ে—চল মা, এবারই কষ্টেসৃষ্টে করে পয়সাকড়ি জোগাড় করে হরিদ্বার যাই এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মাধ্যমে পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়াদি সম্পন্ন করে—বাবার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও স্বর্গলাভের পথ সুগম করি।

এই বিপুল খরচের বোঝা তুই কি সামলাতে পারবি বাবা? মা সস্নেহে বললেন।

আমি মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, পুরোহিতমশাই বাবার বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিষ্পন্ন করার জন্যে যে ফর্দ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তার খরচের সঙ্গে আর সামান্য কিছু টাকা ধারদেনা করে জোগাড় করলেই—মা ও ছেলে হরিদ্বার গিয়ে বাবার শেষক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে

অনায়াসে আসতে পারব। তাতে বাবার বিদেহী আত্মারও বন্দিদশা ঘুচবে, আর আমিও বছর বছর এই বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আর্থিক চাপ থেকে রেহাই পাব।

তাই, মাকে বললাম, চেষ্টা করে দেখি মা, এবারই হরিদ্বার যাবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। বাবার আত্মাকে বাড়ির গণ্ডির বন্দিদশা থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত করতে পারব, ততই তো আমরা বাবার আশীর্বাদে ধন্য হব, পুণ্যবান হব।

এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরোহিতমশাইকে খবর দিয়ে এলাম যে, মাকে নিয়ে আমি এবারই হরিদ্বার যাবার চেষ্টা করছি। আর এদিকে তলে তলে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে পরের সপ্তাহেই মাকে নিয়ে হরিদ্বারের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লাম।

দুই

হরিদ্বার রওনা হবার আগে মা একদিন আমাকে বললেন, আমরা তো কলকাতা হয়েই যাচ্ছি, কলকাতা একদিন থেকে তোর বাবার অস্থি গঙ্গার যে ঘাটে বিসর্জন করেছিলি সেই ঘাটে চান করে তাঁর আত্মার চিরশান্তি ও স্বর্গলাভের জন্যে একটু প্রার্থনা করার আমার ইচ্ছে। না না, কোন আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে না, কোন পাণ্ডা-পুরোহিতের সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই! শুধু গঙ্গায় ডুব দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে একটু প্রার্থনা করব। সম্ভব হবে কি বাবা?

নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। কোন অসুবিধেই হবে না, মাকে আশ্বস্ত করে বললাম।

কলকাতা গিয়ে পরেব দিন গঙ্গার সেই ঘাটে মাকে নিয়ে গেলাম। গঙ্গায় ডুব দিয়ে চান সেরে মা সেখানেই বুকজলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করলেন।

তারপর হরিদ্বারের উদ্দেশে রওনা হলাম। এবং যথাসময়ে হরিদ্বার পৌঁছে একটি ধর্মনিবাসে আশ্রয় নিলাম। সেই ধর্মনিবাসে পাণ্ডাদের আনাগোনা লক্ষ করতে লাগলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের আসার হেতু জানতে চাইলেন। কিন্তু আমি কোথাও মুখ খুললাম না। পরের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে রওনা হলাম, যে ঘাটে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা হয়।

ছোট বড় অসংখ্য নুড়ি পাথরেব ওপর বিস্তৃত গঙ্গার ঝিরিঝিরি স্ফটিক জলধারা ঢালু দিকে বয়ে চলেছে। ছড়ানো সেই জলধাবা ক্রমশ সরু হয়ে নদীর আকাব নিতে শুরু করেছে। অবশেষে নদীর রূপ নিয়ে বেগবতী হয়ে হরিদ্বারের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ঘাটের স্থানটি বেশ চওড়া। দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের জন্যে শানবাঁধানো। ঘাটের বেশ কিছু অংশবিশেষ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা।

ক্রিয়াকর্ম করানোর জন্যে আমি ও মা চারদিক তাকাতে তাকাতে যখন হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছিলাম, বেশ ক'জন পাণ্ডা আমাদের জিগ্যেস করলেন, বাবু, কোন ক্রিয়াকর্ম করাবেন কি? যৎসামান্য খরচে সব কর্ম সম্পন্ন করে দেব। সব পাণ্ডার মুখে একই বুলি উচ্চারিত হচ্ছিল, যৎসামান্য খরচে সব কর্ম সম্পন্ন করে দেব।

এঁদের মধ্যে পছন্দমতন একজন বৃদ্ধ পাণ্ডাকে সৎ ও নিষ্ঠাবান বিবেচনা করে আমাদের মনোবাঞ্ছার কথা নিবেদন করলাম। তিনি খুশি হয়ে আমাদের বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে দু'টি

পিঁড়ের মতন পাথরে বসালেন। নিজেও তেমনি একটা পিঁড়েতে উপবেশন করলেন। আমাদের হাতছোঁয়া দূরত্বে গঙ্গার স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছিল।

এবার তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, বাবু, কত টাকার মধ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করার মনস্কামনা আছে, খুলে বলুন?

এই কোন রকম নমো নমো করে শুদ্ধ হওয়া আর কি, আমি বললাম।

তিনি বার কয়েক আমাকে ও মাকে আপাদমস্তক অবলোকন করলেন। বোধ করি আমাদের চেহারা দেখে আমরা কী পরিমাণ টাকা ব্যয় করার উপযুক্ত সে অঙ্কের হিসেবটা পরিমাপ করে নিলেন। তারপর মধুর সুরে বললেন, এক হাজার এক টাকার মধ্যেই সব সামলে দিই?

আমি সবিনয়ে বললাম, পুরোহিতমশাই, আরও অ-নেক কমের মধ্যে কিন্তু সব কিছু করে দিতে হবে। এটি তো বাবার বার্ষিকশ্রাদ্ধ। মূল শ্রাদ্ধ তো গত বছরই বাড়িতে সম্পন্ন হয়েছে। অমনিতেই আমরা অ-নেক দূর— সেই সুদূর ত্রিপুরা থেকে এসেছি। আসতে-যেতেই আমাদের বহু টাকা বেরিয়ে যায়। তাছাড়া আমার ক্ষমতাও সীমিত। আপনার পক্ষে আরও অনেক কম খরচের মধ্যে যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করে দেওয়া একান্তই সম্ভব না হয়, তবে আমাকে অন্যত্র দেখতে হবে। আমি নিরুপায়।

যা হোক, দর কষাকষি করে শেষপর্যন্ত একশো এক টাকার মধ্যে সব ক্রিয়াকর্ম সামলে দেবেন বলে পুরোহিতমশাই অঙ্গীকার করলে আমি সম্মত হলাম।

তখন তিনি একটি দশ-বারো বছরের ছেলেকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। ছেলেটি কাছে আসতেই অনুষ্ঠানের জিনিসপত্র আনতে তাকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছেলেটি নানা জিনিসপত্রে পূর্ণ ফুল বেলপাতা দুর্বা তুলসিপাতা সহ একটা ঝুড়ি পুরোহিতমশাইয়ের হাতের কাছে এনে রাখল।

পুরোহিতমশাই একটা প্রশস্ত পাথর গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়েমুছে ফুল বেলপাতা দুর্বা তুলসিপাতা দিয়ে সাজিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে হতে আমাকে এবং মাকে গঙ্গায় চান করে সিক্ত পরিধানে বসতে বললেন। তারপর মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে পুরোহিতমশাই আমাদের দিয়ে নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করালেন। এরমধ্যে মন্ত্রপাঠ করতে করতে একটা নারকেল আমার হাতে দিয়ে ওর ওপর ফুল বেলপাতা দুর্বা তুলসিপাতা দিতে দিতে আমাকে তাঁর সাথে সাথে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। নারকেলটা হাতে নিয়েই বুঝলাম, এটা একটা মরা নারকেল! তাই তাঁর সাথে মন্ত্র উচ্চারণ না করে আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলাম, এটা কী নারকেল আমার হাতে দিলেন পুরোহিতমশাই? এটা তো দেখি মরা-নারকেল! নারকেলের ছড়ার মধ্যে গাছে যে জলশূন্য মরা-নারকেল থাকে, এটা তো দেখি সেই নারকেল! একটা ভালো নারকেল ছেলেটিকে দিয়ে আনান।

জলওয়ালা শাঁসওয়ালা নারকেল আনালে দশ টাকা লাগবে। এটার জন্য আমি পাঁচ টাকা নিচ্ছি মাত্র। পুরোহিতমশাইয়ের ভাষণ।

আমি দশটাকা দিতেই রাজি, মানে একশো এক টাকার সঙ্গে আমি আরও পাঁচটাকা অতিরিক্ত দেব। তবু একটা ভালো নারকেল আনান।

বাবু, তাহলে তো ছেলেটাকে শহরে পাঠাতে হবে। অনেক সময় লাগবে। ভেজা কাপড়ে কি এতক্ষণ বসে থাকবেন? তিনি নরমসুরে বললেন।

হ্যাঁ, বসে থাকব, আমি স্পষ্ট জানালাম।

বাবু, তাহলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ হয়ে যেতে পারে। বিদেশবিঁভুই এসেছেন। তখন একটা অনর্থক ঝামেলায় পড়বেন। অনুমতি করুন তো, এ নারকেল দিয়েই আমি ক্রিয়াকাণ্ড সেরে ফেলি, মনে কোন কষ্ট নেবেন না বাবু। দ্রব্যে কী এসে যায়, দ্রব্য তো উপলক্ষ্য মাত্র। মন্ত্রই মূল। আমি মন্ত্রের মাধ্যমে সব পুষিয়ে নেব। এতটুকু ফাঁক রাখব না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন বাবু। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

বুঝলাম, ভালো নারকেল আর তিনি আনাতে রাজি নন। অগত্যা এ নারকেল হাতে নিয়েই তাঁর সাথে সাথে মন্ত্র আওড়াতে লাগলাম। তন্ত্রমন্ত্র শেষ হলে তিনি নারকেলটি গঙ্গার মধ্যে বাবার বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেন। আমি গঙ্গার মাঝখানে প্রবল স্রোতের মধ্যে তা ছুঁড়ে ফেললাম। তাই দেখে তিনি 'হায় হায়' করে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কী করলেন বাবু, এখন নারকেলটা আনব কেমন করে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কী! এ নাবকেল আবার আনবেন কেন? এ তো আমি আমার বাবার বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে গঙ্গার পবিত্র সলিলে বিসর্জন দিলাম। আপনি তা নিয়ে এলে নারকেল স্বর্গে পৌছবে কেমন করে? তাছাড়া এ বাবদ তো আপনাকে মূল্যই দেওয়া হবে।

বাবু, এই একটি মাত্র নারকেল দিয়েই আমি অন্তত এমন পাঁচশো ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করেছি, নারকেলের জন্যে চিন্তান্বিত হয়ে পুরোহিতমশাই বিষণ্ণ মলিন কণ্ঠে বললেন।

ততক্ষণে অবশ্য ছেলেটি সাঁতরে গিয়ে নারকেলটা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তা দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এবং আবার মন্ত্রপাঠে মনোযোগ দিলেন। তারপর আরও বেশ কিছুক্ষণ জপতপ করলেন, আর মন্ত্র জপতে জপতেই একসময় আমাকে বললেন, গঙ্গামাকে স্পর্শ করে বলুন, ব্রাহ্মণ দক্ষিণা কত দেবেন।

সব কিছু সম্পন্ন করে দেবার জন্যেই তো আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। আবার ব্রাহ্মণ-দক্ষিণার কথা আলাদা করে বলছেন কেন? আমি অবাক সুরে জিগ্যেস করলাম।

পুরোহিতমশাই মলিন-হাসি হেসে আস্তে আস্তে বললেন, বাবু, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা তো আলাদা। বাবার কাজকর্ম সেরে ব্রাহ্মণ বিদেয় করবেন না?

আর কথা বাড়ালাম না। গঙ্গা তো হাতের ছোঁয়ার মধ্যেই বয়ে যাচ্ছিল। গঙ্গাকে স্পর্শ করে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা কত দেব মনে মনে বললাম।

পুরোহিতমশাই আমাকে আবার বললেন, কই, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা কত দেবেন, বলুন?

বলেছি, আমি জানালাম।

না না, জোরে জোরে বলুন। তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে আমাকে আদেশ করলেন।

তাতে আমি খুবই বিরক্ত হয়ে আগে মনে মনে যা বলেছিলাম তার থেকে অ-নেক কমিয়ে

গঙ্গা স্পর্শ করে জোরে জোরে বললাম, একটাকা পঁচিশপয়সা।

আমার কথা শুনে পুরোহিতমশাই আঁতকে উঠে রাগতস্বরে বললেন, বলেন কী বাবু? কোথায় কম করেও হাজার টাকা বলবেন, সেখানে আপনি বললেন মাত্র একটাকা পঁচিশপয়সা! এটা কী একটা ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা হল? এতে কী আজকাল ব্রাহ্মণ বিদেয় হয় নাকি?

আমি অনুশোচনার ভান করে বললাম, কিন্তু এখন যে আমি নিরুপায়! গঙ্গামাকে স্পর্শ করে তো বলে ফেলেছি? কথার হেরফের হলে যে আমি মহাপাতক হব!

মা এ অবস্থার সমাধান করে দিলেন। আমার কানে কানে চুপি চুপি বললেন, আমি মা হয়ে বলছি, তোর কোন পাপ হবে না, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা আরও একটু বাড়িয়ে বল।

এবার মা-গঙ্গাকে স্পর্শ না করেই বললাম, মা'র আদেশ শিরোধার্য। তাই বলছি, ব্রাহ্মণ-বিদেয় পঁচিশ টাকা দেব।

এই কথা বলার পর পুরোহিতমশাইয়ের চোখ মুখের হাবভাব দেখে বুঝলাম, তাঁর অসন্তুষ্টি কিছুটা হলেও কমেছে।

তারপর, আবার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পুরোহিতমশাই আমাকে বললেন, এবার গঙ্গামাকে স্পর্শ করে জোরে জোরে বলুন, কতজন ব্রাহ্মণভোজন করাতে বাসনা।

এ কথা শুনতেই আমি আবার তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে বললাম, ব্রাহ্মণভোজন আবার আলাদা নাকি! চুক্তি করার সময় তো সেই একশো এক টাকার মধ্যেই সবকিছু সামলে নেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন?

এবার তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে বললেন, বাবু, বাবার কাজ করাতে এতদূর এসে ব্রাহ্মণদের একটু ভোজন করাবেন না! উপোসে রাখবেন! এতে যে আপনার বাবার বিদেহী আত্মাও কষ্ট পাবে!

ঠিক আছে। তবে, কোথায়, কীভাবে, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হবে? আমি পুরোহিতমশাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম।

উত্তরে তিনি বললেন, আপনাদের কোথাও যেতে হবে না। জনপ্রতি দশটাকা দিলেই আমরা ব্যবস্থা করে নেব।

পুরোহিতমশাইয়ের মুখে হিসেব জেনে গঙ্গামাকে ছুঁয়ে তারপর জোরে জোরে বললাম, দুইজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাব।

তা শুনে এবার তিনি সক্রোধে বলে উঠলেন, এ কী বলছেন? একশো একজনের কমে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে কোন পুণ্যার্থীকে ব্রাহ্মণভোজন করাতে আজও শুনিনি! আমি তো অন্তত এ যাবৎ এমন কৃপণ লোকের পাল্লায় পড়ে ওর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিষ্পন্ন করিনি! আরে বাবু, ব্রাহ্মণভোজন মানেই তো মৃতপিতার জন্যে স্বর্গে অন্নসঞ্চয়! আত্মজ হয়ে আপনি কি পিতাকে স্বর্গে অনাহারে অর্ধাহারে কষ্ট দিতে চান? অথচ এই পিতা একদিন আপনাকে লালনপালন করে বড়ো করে স্বাবলম্বী করে সমস্ত ধন-সম্পদে নিঃশর্তে ভোগের অধিকারী করে রেখে গেছেন! রামো রামো! এমন কথা উচ্চারণ করতে কি আপনার মুখে একটুও বাঁধলো না?

তাঁর এই দীর্ঘ ভাষণ শুনে আমি অত্যন্ত কাতরভাবে বিনীতকণ্ঠে অভিনয় করে বললাম, কিন্তু

আমি যে মা-গঙ্গাকে স্পর্শ করে বাক্যটি উচ্চারণ করে ফেলেছি! তাছাড়া আমি চুক্তি করার সময়ই তো আপনাকে বলেছিলাম যে, আমার আর্থিক ক্ষমতা সীমিত।

এবারও মা-ই সামাল দিলেন। গঙ্গামাকে স্পর্শ করে বললেও তোর কোন পাপ হবে না, আমি মা হয়ে বলছি। ব্রাহ্মণভোজনেব সংখ্যা আরও একটু বাড়িয়ে বল বাবা।

তখন আমি সদর্পে আবার বললাম, মা'র আদেশ শিরোধার্য। গঙ্গামাকে স্পর্শ না করেই তাই জোরে জোরে উচ্চারণ করে বললাম, দশজনকে ব্রাহ্মণভোজন করাব।

এ কথা শুনে মনে হল —পুরোহিতমশাই সন্তুষ্টই হয়েছেন। মা এবং আমি সিক্তবসন ছেড়ে শুষ্কবসন পরিধান করলাম। এবং আগের চুক্তির একশো এক টাকা, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা পঁচিশ টাকা ও দশজনের ব্রাহ্মণভোজন বাবদ একশো টাকা, মোট দুইশো ছাব্বিশ টাকা পুরোহিত মশাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করে ধর্মনিবাসে ফিরে এলাম।

তিন

পরের দিনই হরিদ্বার ত্যাগ করতে মনস্থ করে মা বললেন, আচ্ছা বাবা, আমাদের যাবার পথে কি কাশীধাম পড়বে?

কেন মা? আমি মাকে জিগ্যেস করলাম।

মা বললেন, একসময় আমাদের গ্রামের পুণ্যার্থীরা ক'বছর পর পরই দলবেঁধে তীর্থভ্রমণে বেরোতেন। তাঁদের সঙ্গে তোর বাবাও দু'বার তীর্থভ্রমণে এসে কাশীধামে আসেন। বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভ করেন। আমাকেও দু'বারই সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার আব আসা হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছে ছিল পরের বার আসব। কিন্তু আ ব আসা হল না। তোর বাবাও চলে গেলেন! তাই ভাবছিলাম, পথে যদি কাশীধাম পড়ে তোর বাবাব সেই ইচ্ছেটি পূর্ণ করে যাব, আর আমারও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভ হবে।

তাই পবের দিন হরিদ্বার থেকে কাশী রওনা হলাম। কাশী এসে বামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই গঙ্গাব ঘাটে চান করতে গেলাম। গঙ্গাচান শেষ করে পরিশুদ্ধ হয়ে পবিত্র মনে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হলাম। ততক্ষণে রোদের তাপ অনেক বেড়ে গিয়েছে।

পথে ছোট্ট একটা পাতিলে পেঁড়ার ভোগ কিনে নিলাম। এবং কিছু টাকা বাট্টা দিয়ে ভাঙিয়ে খুচরো করে নিলাম। বাবা নাকি মাকে বলেছিলেন, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে যাবার সময় বেশ কিছু ভাঙতি পয়সা সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। তাহলে, পথের দু'পাশের ভিক্ষুকদের দেওয়া যায় এবং বিভিন্ন দেবদেবীব শ্রীচরণে সাধ্যমত প্রণামিও নিবেদন করা যায়।

গলিপথ ধরে মন্দিরে যেতে হয়। বেশ খানিকটা দূর থেকে সেই গলিপথের দু'ধারেই ভিক্ষুকের সারি। সবাই হাতজোড় করে ভিক্ষের আশায সময় গুনছে। ভিক্ষুকের সারির পর আবার পথের দু'পাশে বিভিন্ন দেবদেবীর আসনপাতা মূর্তির সারির শুরু। প্রত্যেক দেবদেবীর আসনই ফুল

বেলপাতা সিঁদুর দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো। প্রত্যেক দেবদেবীর পদপ্রান্তেই গেরুয়াবসন পরিহিত উদোম গায়ে পৈতা গলায় পাণ্ডাপুরোহিত আসীন। পুণ্যার্থীদের পুণ্যহস্তের দিকে প্রত্যেক পুরোহিতেরই সম্প্রসারিত সঞ্চালিত সজাগ দৃষ্টি। কারো কারো হস্তে আবার পুরোহিতগণ মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে আশীর্বাদি ফুল বেলপাতাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তুলে দিচ্ছেন।

মা যেতে যেতে প্রত্যেক ভিক্ষুকের থালায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সাধ্যমত পয়সা দিলেন। পুরোহিতদের অতি সন্নিকটে রক্ষিত প্রত্যেক দেবদেবীর আসনের থালায়ও মা ভক্তিভরে প্রণামি প্রদান করতে করতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরদ্বারে পৌঁছোলেন।

সেদিন খুউব গরম ছিল। তদুপরি পুণ্যার্থীদের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছিল বলে আবও বেশি গরম লাগছিল। তার'পর দু'পাশের সুউচ্চ অট্টালিকার মধ্যিখানের হাওয়াশূন্য ভ্যাপসা গরমে শরীর জ্বলছিল। জামাকাপড় ঘামে ভিজতে ভিজতে যেন নেয়ে উঠছিলাম। মা'র আরও কাহিল অবস্থা! আমাদের দু'জনেরই গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আমি আগে আগে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছিলাম। মা পেছন পেছন আমাকে অনুসরণ করছিলেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ভিড়ের চরম অবস্থা। সেই অবস্থায়—অগণিত মানুষের চরম ঠেলায় ঠেলায় আমরা জড়বৎ সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেকটা নিচে নেমে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে কোনরকম দণ্ডায়মান হতে সক্ষম হলাম।

পূজারিঠাকুরের উদোম গা। গা বেয়ে দরদর করে ঘাম নির্গত হচ্ছিল। মুখমণ্ডলের ঘাম-- নাক ও থুতনি বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল। তাঁর হাতের কাছেই ছিল বাবা বিশ্বনাথের চরণামৃতের পাত্র। সেই পাত্রে মা ও আমার চোখের সামনেই পূজারিঠাকুরের থুতনি বেয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম এবং নাক বেয়ে ঘামমিশ্রিত নাকের শ্লেষ্মা টপ টপ করে করে পড়ল। তা দেখে মা আমাকে চুপিসারে বললেন, চরণামৃত মুখে দিস না, মাথায় ছোঁয়া। মাও তাই করলেন।

আমরা বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভ করলাম। প্রণামও সারলাম। তারপর আমাদের দেওয়া ভোগ প্রসাদী করে পুরোহিতমশাই মা'র হাতে প্রত্যার্পণ করতেই আবার সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে ঘর্মসিক্ত কলেবরে—গরমে অর্ধসেদ্ধ মাকে আধমরা করে—কোনবকম প্রাণ নিয়ে সেই পুণ্যস্থান ত্যাগ করে আসতে পেরে ধন্য হলাম।

তারপর, কলকাতা এলাম। মা'র ইচ্ছে অনুসারে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরেও গেলাম। মা পুজো দিলেন। আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে মাকে নিয়ে গেলাম। যেমন চিড়িয়াখানা, যাদুখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, বেলুড়মঠ ইত্যাদি। তারপর একদিন আগরতলার উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

চার

ফেরার পথে মা আমাকে কাছে টেনে আস্তে আস্তে বললেন, বাবা, তোকে আজ একটা কথা বলি, মনে রাখিস। মনে রাখবি তো?

হ্যাঁ মা, বল, অবশ্যই মনে রাখব, আমি মাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম।

মা বললেন, আমার মৃত্যুর পর তোকে আর এসব ঝামেলা কিছুই পোহাতে হবে না। না তোকে তিরিশ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে অশৌচ পালন করতে হবে, না শ্রাদ্ধশান্তি, না বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করতে

হবে। নিজে অন্তর থেকে আজ তোকে আমি একথা বলে যাচ্ছি। শুধু শ্মশানে আমাকে দাহ করার পর আমার কপালের এক টুকরো অস্থি রেখে দিস। এবং কখনও কলকাতা গেলে—কলকাতার গঙ্গার যে ঘাটে তোর বাবার অস্থি বিসর্জন করেছিস—সেই ঘাটে তা বিসর্জন করে দিস। তাহলে আমি নিশ্চিত জানব যে, জনম জনম আমি তোর বাবাব সঙ্গেই একসাথে আছি। না না, আমার শবদেহ চিতায় তুলবার সময় পুরোহিত দিয়ে মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়ে পরিশুদ্ধ করার কোন দরকার নেই! শ্মশান-পুরোহিতকে আমার শবদেহ স্পর্শই করতে দিবি না! মনে রাখিস। ভুলিসনে যেন!

তবে হ্যাঁ, শ্রাদ্ধশান্তি না করালে সমাজে হয়ত তোকে একঘরে করে রাখতে পারে। সেস্থলে তুই স্বামী স্বরূপানন্দের ধর্মমতে দশদিনের দিন শুদ্ধ হয়ে—এগারো দিনের দিন স্বামী স্বরূপানন্দের কয়েকজন শিষ্যের সাহায্যে শুদ্ধ হয়ে নিস। আজকাল এভাবেই অনেকে শুদ্ধ হচ্ছে এবং সমাজও তা গ্রহণ করছে। অবশ্য, একদিন এসবও আর করার দরকার হবে না।

আমি যে স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য নই মা, তাঁব শিষ্যরা কি আমার আবেদনে সাড়া দেবেন? মাকে বললাম।

হ্যাঁ দেবেন, তাঁরা খুশি হয়েই সাড়া দেবেন। স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্যরা একাজকে তাঁদের ধর্মের ও ধর্মমত প্রচারের একটি অবশ্যকর্তব্য এবং পবিত্রদায়িত্ব মনে করেন। আমি অনেক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁদের এই কর্মতৎপরতা দেখে মানসিক শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়েছি, মা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন।

কিন্তু আমার যে মা শ্মশানবন্ধু, পড়শি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ভোজসভায় ভোজন করাবার বড় সাধ, মাকে বললাম।

তা শুনে মা বললেন, সমাজের চিরাচরিত নিয়ম-বহির্ভূত উপায়ে নিষ্পান্ন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ভোজসভায় যদি নিমন্ত্রিতেরা কেউই অংশ গ্রহণ করতে না আসেন, তখন তো এত এত খাবার সব নষ্ট হবে?

জবাবে আমি মাকে আশ্বস্ত করে বললাম, নষ্ট হবে কেন মা? আমি তো মা'র বিদেহী আত্মাব পবিতৃপ্তি ও পরিতুষ্টির জন্যে, স্বর্গে খাদ্য সঞ্চয়ের মানসে, যাতে স্বর্গে মা'র আত্মার খাদ্যের অভাব কখনও না ঘটে, সেই মনোবাসনায় ভোজন বিলাসিদের ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত ও পবিতুষ্ট করতে চাইছি। কেউ যদি সেই ভোজসভায় অংশগ্রহণ না-ই করেন, তবে আমি তা হাওড়া নদীর জলে অম্লানবদনে ঢেলে দেব। পাহাড়ি স্রোতস্বিনী এই হাওড়া নদীর জল তো বাংলাদেশেও গিয়ে পড়েছে। সেই নদীর রঙ বেরঙের মাছেরা খাবে, জলজ প্রাণীরা খাবে, পরিতৃপ্ত হবে, খুশি হবে! নদীর পারেও কিছু খাবার ঢেলে দেব। তাহলে কুকুর বেড়াল কাক চিলেরাও মজা করে খাবে, আহ্লাদিত হবে। কাজেই নষ্ট হবে কেন বলছ মা, মানুষকে ভোজন করানোর মূল শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্যই তো সাধিত হবে!

আমাব কথা শুনে মা হেসে দিলেন। বললেন, তবে তাই করিস। আর তাছাড়া নেমন্তন্ন করবি, অথচ পাকসাক করাবি না, এটা কেমন করে হয়! যদি নিমন্ত্রিতেরা সবাই আসেন, তখন উপায়?

আমিও হেসে বললাম, কাজেই নেমন্তন্নও করব, রান্নাবান্নাও কবাব।

তবে সব নিরামিষ আয়োজন কর্ববি। ভুলেও মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করবি না কিন্তু, মা নির্দেশের সুরে বললেন।

ঠিক আছে মা, মাতৃ আদেশ শিরোধার্য।

পাঁচ

১৯৭৭ সালের নভেম্বরে বাবা মারা যান। মা গত হন ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। আজ ২০০৯ সালের অক্টোবর। আমি মা'র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরেছিলাম।

নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সবাই এসেছিলেন।

আমার নিকটতম চারঘর ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী। পাড়ার বর্ষিয়ান পরম শ্রদ্ধেয় সজ্জন ফটিকদাকে (প্রয়াত ফটিকচক্রবর্তী) নেমতন্ন করতে গিয়ে সবিনয়ে বললাম, দাদা, যাবেন তো?

সঙ্গে সঙ্গে ফটিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাব আমাকে বললেন, নিশ্চয়ই যাব, সপরিবারে যাব। তোমার একাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। দরকারে আমি তোমার পাশে থেকে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করতেও প্রস্তুত।

ব্যানার্জিদা (শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়), বিমলবাবু (শ্রীবিমল ভট্টাচার্য) এবং যতীনদা (প্রয়াত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী) তাঁরা সবাই সত্যি সত্যি সেই ভোজসভায় সপরিবারে অংশগ্রহণ করে আমাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেছেন।

তবে হাতে গোনা আমার কয়েকজন নিকটতম আত্মীয় ধর্মভ্রষ্ট হবার ভয়ে ভোজসভায় অংশ করা তো দূরের কথা, সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেই আসেননি! যদিও ওদের সন্তানসন্ততিগণ এখন —এই এক যুগ ব্যবধানের মধ্যেই আমাদের সামাজিক বিধিমতে তিরিশ দিন অশৌচ ধারণের পরিবর্তে কেউ কেউ তের দিন, কেউ কেউ পনেরো দিন, অশৌচ ধারণ করে ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে বাবা মার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম সানন্দে সম্পন্ন করতে শুরু করে দিয়েছেন।

ছয়

সে রাত অন্ধকার ঝড়োরাত ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা'র কথা ভাবতে ভাবতে রাত যে কত হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। ঝড়বৃষ্টি থেমেছে কিনা দেখার জন্যে পুবের জানালা খুললাম। দেখলাম, ঝড় আর নেই। পুব দিগন্তের ফর্সা মিষ্টি আলো ভোরের পূর্বাভাস জানান দিচ্ছে।

১৮৩০ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত দেড়শো বছরের বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ধারাবাহিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাসম্ভারে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলোর ফুলকি নামক একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করে। সেই সংকলনে চুনী দাশের ছড়া সংকলিত হয়।

●

সন্দেশে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনারাজিতে অলংকৃত সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনায় ১৩৮৮ সালে সেরা সন্দেশ প্রকাশিত হয়। তাতে চুনী দাশের ছড়াও স্থান পায়।

●

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ছোটদের ত্রৈমাসিক ছড়া প্রধান পত্রিকা টুক্‌লু-তে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের ছড়াকার ও কবিদের চার শতাধিক ছড়া ও কবিতার মধ্যে ১৯৯৭ সালে চুনী দাশের ছড়া সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়।

●

২০০৫ সালে আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও পান্নালাল রায় সম্পাদিত ত্রিপুরার সেরা শিশুসাহিত্য নামক গ্রন্থেও চুনী দাশের ছড়া প্রকাশিত হয়।

●

২০০৭ সালে কাব্য ও শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ত্রিপুরা সরকার চুনী দাশকেঅদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে।

●

১৯৬০ থেকে চুনী দাশের ছড়া, কবিতা ও গল্প —চুনী দাশ ও প্রবীর দাশ এই দুই নামে নিম্নে উল্লেখিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ সন্দেশ, রামধনু , পাঠশালা, শিশুসাথী, মৌচাক, শ্রীচরণেষু, কিশোর ভারতী, শুকতারা, শিক্ষক, টুক্‌লু, কেকা, সঞ্চিতা, তেপান্তর, সুসাথী, ছোট নদী, অদল-বদল, ছোটদের কচিপাতা, যুগান্তর (পাত্‌তাড়ি), দৈনিক বসুমতী (ছোটদের পাতা), মাসিক বসুমতী (কিশোর জগৎ) প্রভৃতি।

ত্রিপুরা ঃ কাকলি, উদিতি।